ভাবমুখে

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

শারদীয়া সংখ্যা : আশ্বিন : সপ্তত্রিংশ বর্ষ : তেরশ' নব্বই : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

With Best
Compliments Of

DERBY INDUSTRIAL PROJECTS PRIVATE LTD.

16 HARE STREET, CALCUTTA-1

Manufacturers Of Highest Grade Industrial Explosives.

Factory :

MATKAMBEDA,

Dist. KEONJHAR,

ORISSA.

আশ্বিন
শারদীয়া সংখ্যা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ
তেরশ' নব্বই

আগমনী	১৫১	শ্রীশ্রীঠাকুর
ঈশ্বর আছেন তাঁর সৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ	১৫২	স্বামী সত্যানন্দদেব
আমরে পূজি মাকে	১৫৫	শ্রীশ্রীঠাকুর
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	১৫৭	শ্রীঅর্চনাপুরী
যার চৈতন্যে সব চৈতন্যময়	১৬১	স্বামী বোধানন্দ
লোকমান্য চাইনে গো মা	১৬৩	সাধনাপুরী
সচ্চিদানন্দ	১৬৯	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
বেদান্ত পূর্বদিগন্তে	১৭০	স্বামী নীলানন্দ
শারদ প্রাতে	১৭৪	যোগদাপুরী
পূজামন্ত্র	১৭৪	শরণাপুরী
কণিকাগুচ্ছ	১৭৬	ফণিভূষণ বিশ্বাস
যোগমায়া	১৭৭	শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার
ধর্মেভ্যো নমঃ	১৭৮	শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত
The Aims and Ideal···Politics	১৮১	মহামায়াপুরী
অমৃতস্য পুত্রাঃ	১৮২	শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

P 30 380

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের পুস্তকাবলীর কয়েকটী

যুগে যুগে যার আসা—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব জীবনালেখ্য) টা ১২·০০

যুগাচার্য— (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জীবনবেদ অবলম্বনে জীবনী গ্রন্থ) টা

বেদছন্দা— (শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অমৃতবাণী সঙ্কলন—৫ খণ্ড একত্রে) টা ৭·০০

কথামৃত-কথা— (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু বাণীর আধুনিক যুগসম্মত ব্যাখ্যা) টা ৮·০০

জপ-ধ্যান— (জপ ও ধ্যানমার্গে অধ্যাত্মসাধনার সহজ নির্দ্দেশ) টা ৬·০০

Complete Works— (In Eighth Volumes) Rs. 150·00

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, শি. কে. সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৫৬ ফোন ৫২-৭১০৩

শারদোৎসবে জানাই
সশ্রদ্ধ নমস্কার

হাওড়া মোটর কোম্পানী
– লিমিটেড –
কলিকাতা

DRINK
ORPHAN'S TEA
For
HEALTH & ECONOMY
ORPHAN TEA SYNDICATE
133 Cornwallis St., Shyambazar
Phone : 55-3704

ফোন : ৩৪-৭২৫৮
এন্, কে, স্পোর্টস্
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯
যাবতীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers PHOTO
CORNWALLIS ST, CAL-6
PHONE : 54 - 5711

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪ - ৩৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

সমন্বয়ী দর্শন	১৮৩	শ্রীঅর্চনাপুরী
আর কিছু চাইনেকো আমি	২০০	শান্তশীল দাশ
উত্তরণ	২০১	নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বকাপে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের মূল কথা—	২০২	বড় মন্তু
উভয় লিঙ্গ 'নির্বাণ'	২০৫	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
পূজা—	২১১	শ্রীশান্তিময় মণ্ডল
মনের বিচিত্র ক্ষমতা	২১২	শ্রীরাখালকৃষ্ণ আচার্য
দীনের ভক্তি দান	২১৩	শ্রীশান্তনু কুমার চৌধুরী
বর্তমান যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য	২১৪	শ্রীমৎ সর্বেশানন্দ শাস্ত্রী বেদান্ত আচার্য
ঝাড়ুনার	২১৬	তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
মনের গহনে	২১৭	অধ্যাপক গৌরহরণ কপাট
অর্ঘ্য	২১৯	সুধেন্দু মল্লিক
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত প্রসঙ্গ	২২০	শ্রীঅনিল গুপ্ত
তুমি শেষ সর্বাহ্নে	২২২	নিবারণ চক্রবর্তী

'ভাবমুখের নিয়মাবলী'

ভাবমুখে সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র

বর্ষারম্ভ বৈশাখ মাস। বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমেই অগ্রিম দিতে হইবে।

বার্ষিক মূল্য সডাক টাঃ ১৪'০০। ষাণ্মাসিক টাঃ ৭'০০। (বাংলা ১৩৯০ সাল হইতে)

রচনা : ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জানিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানান আবশ্যক।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মণিঅর্ডার ফর্মের সর্বনিম্ন মূলদেশে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "স্বামী পরমানন্দ, ভাবমুখে সচিব, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬" (ফোন : ৫২-৭১৩৩) এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র মিলবস্ত্র সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing. Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD. (Belgharia)

CALCUTTA-700056. *Phone* : 58-1575

মডার্ণ ডেকরেটর্স

শুভবিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫এ, ডব্লু, সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৬

ফোন : ৫৫-২১৪৯, ৫৫-৬৫৬৫

Gram : *DISWASHING*

PHONE : *Office* : 24-1236, *Works* : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants, Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.

4, HARTFORD LANE. CALCUTTA-700016.

Works : 161, Upper Chitpur Road. Calcutta-700005

ঈশ্বর, জীব এবং সংসার সম্পর্কে ভগবান —আদি শঙ্করাচার্যের চিন্তাধারা (৩)		শ্রীপুষ্পিত মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদলিপি		গৌরী ধর্মপাল
অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য —উড্ডয়নের দীক্ষা	২২৭	শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌ
গান	২৩০	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আচার্য। জগদীশ চন্দ্র বসু—বিজ্ঞানী ও স্বপ্নদর্শী	২৩১	কুমারী জয়ন্তী চাটোপাধ্যায়
অমৃতের সন্ধানে	২৩৬	ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু (সরস্বতী,বিদ্যাবারিধি, প্রজ্ঞাভারতী)
দিব্যমুপৈতি দিবাম্	২৩৬	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী
স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বদেশ প্রেম	২৩৭	অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন
পথের সন্ধানে	২৪০	শ্রীপরেশ নাথ ভট্টাচার্য
মদ্‌বিভূতয়ঃ	২৪৭	ডক্টর রমা চৌধুরী, এম্‌-এ.
গানের কসরৎ	২৪৮	শ্রীকামাখ্যা নাথ ভট্টাচার্য
শারদ-প্রাতে	২৫০	অরুণ শীল
গুরু-শিষ্যের কলকাতা	২৫১	ডঃ করা বসু
সবার মাঝে সবার কাজে	২৫৪	স্বপনবুড়ো
আমাদের ধর্মভাবনা	২৫৫	শ্রীশান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়
প্রাণের ঠাকুর	২৫৭	শ্রীশম্ভিপদ ভট্টাচার্য
শরণাগতোহং শত যুগ যুগং	২৫৮	স্বামী অরুণানন্দ
জীবন চেয়েছি আমি	২৬১	সন্তোষ কুমার অধিকারী
বেদনার মধ্যেই শান্তির উজ্জ্বল দীপ	২৬১	কবিকঙ্কণ : হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সংসার সঙ্গীত	২৬২	শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
প্রেমের ঠাকুর	২৬২	শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
Sura yoga		Sree Sree Thakur
An Index of Whens		Sunil Bhattacharya
Led by truth we Rejoice		Niranjan Banerjee
Idea in e..... Divine Science		Baba Thakur
Saints of the South		P. S. Rao
National Integration In India		Sri Jyotsna Nath Mallik
T. S. Eliot···a voyager towards faith		Sri Parthasarathi Mukherjee
My God		Lakshman Dev Sharma

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভরসা

৺রামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ষ্টাইট রোড, কলিকাতা-১

স্থাপিত ইং ১৮৮৬ সাল

৯৫ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

Phone : 57-4562

With Best Compliments of :

TRINAYANI ELECTRIC Co.

Electricals Engineers & Govt. Licenced Contractor

145, LAKE TOWN, Block—'A'

CALCUTTA-700089

BHOWANIPORE TUTORIAL HOME

Estd.—1941

MAIN OFFICE & SCHOOL DEPT.

59-A, Shyamaprasad Mukherjee Road, (Hazra Rd. Jn.) Calcutta-700026
Phone : 47-4926

COLLEGE DEPARTMENT

84, Shyamaprasad Mukherjee Road, Calcutta-700026
(Opp. Sevasadan, Inside Rani Sankari Lane)
Phone : 47-4419

Effective coaching for Madhyamik (IX & X). H. S. (XI & XII). B.A., B.SC. & B. Com. Pass & Hons. M.A., M.SC. & M.Com. candidates Regular & Private. Also coaching candidates for W.B. C.S. C.A. Entrance, Jt. Entrance (Engineering & Medical) & other comp. Exams. Spoken English classes held. Experienced Teachers and Professors. Individual attention in group coaching. Separate arrangement for girls. Admission going on. Enquire between 4 P.M. and 8-30 P. M. except Sundays.

BRANCHES

BALLYGUNGE : 193, Rashbehari Avenue (Opp. Aleya Cinema) Ph. 42-6768
SEALDAH 33-A, M. G. Road (Opp. Purabi Cinema) Ph. 36-1649
SHYAMBAZAR 1 D, Shyamlal Street (Off. Spt. crossing & Mohanlal Street) Ph. : 55-3861

Phone 26-4573

UNITED METAL MART

58, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-1

A Premier House of All Sorts of Cocks & Valves Gun Metal
& Cast Iron and Pipe Fittings of All Descriptions

ভজন	১	শ্রীশ্রীঠাকুর
ভজন	১	শ্রীঅর্চ্চনা পুরী
ভজন	১	স্বামী মৃগানন্দ
স্মৃতিতীর্থ	২	স্বামী নির্বেদানন্দ
ভক্তবৎসল রাম	৬	ঝুমা পুরী

* আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : কার্ত্তিক, ১৩৯০

৪ঠা কার্ত্তিক,	শুক্রবার	২১শে	অক্টোবর,	— শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মী পূজো—রাত্রে পূর্ণিমার হোম।
১৫ই	মঙ্গলবার	১লা	নভেম্বর,	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
১৮ই	শুক্রবার	৪ঠা		— শ্রীশ্রীশ্যামাপূজো, রাত্রে হোম।
২০শে	রবিবার	৬ই		— ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।
২৮শে	সোমবার	১৪ই		— শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজো।
৩০শে	বুধবার	১৬ই		— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।

* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

With Best Compliments of :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street,

Calcutta-700005

Space
Donated
By

DYTRON INDIA LIMITED
20, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700001

{33-6686
{33-0586

Swadeshi Bastralaya

16, PAGEYAPATTI STREET

CALCUTTA-700007

Quality Cloth Merchants

WITH BEST
COMPLIMENTS OF :

HIMALAYA AGENCY

DEALERS & COMMISSION DEPOT OPERATORS
BHARAT PATROLEUM CORPORATION LTD.

9, EZRA STREET
Calcutta-700001

Phone : 26-9282

With Best Compliments From

Phone : 77-6274

M/s. Friends Enterprise

43, BOSE PARA ROAD,
CALCUTTA-700008

For All Kinds Of Plastic Container.

"দেহের শুদ্ধির দরকার মনের শুদ্ধির দরকার।"
—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

With Best Compliments Of

Hindustan Oil Storage & Distribution Company

23, A. M. Ghosh Road, Budge Budge

Phones : 611 226 & 611 507

A Leading Storage Enterprise In Eastern India For Liquid & Dry Cargo.

Calcutta Offices : 53, Chowringhee Road,
Calcutta-700071

Phones : 44-0915, 43-1587

Telex : 021-3101 Musk In Telegram : "TEADURG", Calcutta

With Best Compliments Of

ASIATIC PLASTIQUES

Manufacturer of Industrial and Consumer Blow Injection Moulding Plastic Articles.

Factory :
SETH SOORAJMULL JALAN TRUST COMPOUND
220, Naskarpara Road,
GHUSURY, HOWRAH-711007

City Office :
32, EZRA STREET,
3rd Floor, Room No. 351
CALCUTTA-700001
Phone : Office : 26-1903
Gram : "PROCESSORS"

With the best compliments of

Bengal Oil Water Transport Co.

12, N. C. GHOSH ROAD

BUDGE BUDGE

24-Parganas

WITH BEST
COMPLIMENTS FROM

45-1579

M A L B O

Exporters & Manufacturers of Plastics Products

Office :

4A, JAINUDDIN MISTRY LANE,

CALCUTTA-700027

Contact For All Types Of Plastic Container.

"The more we increase the value and extent of our ego the less becomes the value and extent of the grace of Thakur."

—Sree Thakur Satyananda

A Well Wisher

"The religion of religions is our knowledge and realisation and love."

—Swami Abhedananda

With Best Compliments Of

M/s. Ganeshka Kanoi Tea Co. Pvt. Ltd.

"COMMERCE HOUSE"
No. 2, GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA-700013

"Some diversity has to be created in religious path also if one wants his mind to be constantly engaged in religious subjects. But, that diversity must be with objects divine."

—Sree Archana Ma

FOR
TEA
WARE-HOUSING

23-2504
23-2505

Remember :

M/s. KANOI TEA PRIVATE LTD.

24, R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-700001

"Life is a spark of God"

—Sree Sree Thakur Satyananda

With Compliments From

Dhiraj Chandra Sarkar

Builder and Contractor

2/1A, DINANATH MITRA LANE
CALCUTTA-6
Phone : 65-4556

Remember

KAMALA CYCLE MART

FOR

Cycle Cycle Rickshaws, Delivery Van, Invalid Cycle

AND

Accessories

2A, BENTINK STREET.
CALCUTTA-1
Telephone : 23-7885

3, BENTINK STREET,
CALCUTTA-1
Telephone : 23-7128

And stop not till the goal is reached.

—Swami Vivekananda

With Compliments From

Phone : 23-4318

Grover Petro-Chem Private Ltd.

6A, 8th Floor, 'COMMERCE HOUSE'

6A, GANESH CHANDRA AVENUE,

CALCUTTA-700013

For

All kinds of Petroleum Products, Oils, Chemicals.

"To achieve greatness. shelter of a great power has to be taken.

Thus it becomes easy."

—Sree Sree Thakur Satyananda deva

With Compliments Of :

Mehra Coal Company

5 & 6, FANCY LANE

CALCUTTA-1

With Best Compliments Of

23-6106
23-3055

INDIAN TIMBER SUPPLY AGENCY

187, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
CALCUTTA-700007

Gram : '

69-2182
: 69-2221
69-2772

With Compliments From :

DHAR RUBBER MANUFACTURING CO.

HOWRAH-AMTA ROAD
Dassnagar, Howrah

FOR

Automobile & Industrial Rubber Goods.

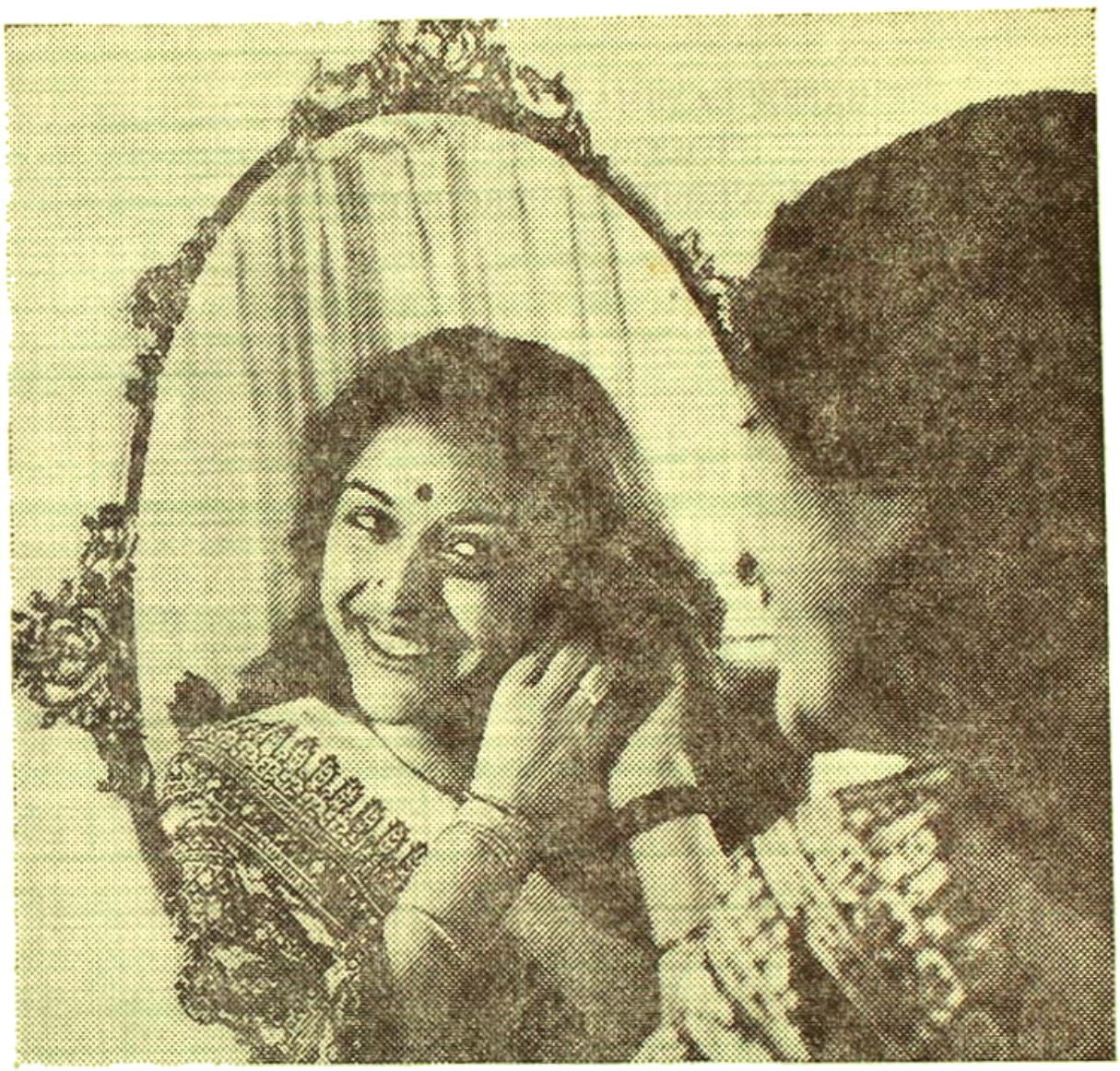

Behind your charming face, the work of unseen hands.

The care and craftsmanship at Triveni Sheet Glass is legendary.

Anyone can buy the best machines and employ the best processes for glass manufacture — like Triveni Sheet Glass. But Triveni believes that people are just as important. Triveni's team of the best glass makers in the country turns the concept of quality into flawless sheets of glass. That meet the stringent requirements of customers, not only in India, but around the world.

Highly skilled technicians and workers ensure that all raw material meets the high Triveni standard. Strict temperature control, round-the-clock, maintains the homogeneity of molten glass. While experienced checkers scrutinise every square metre of glass so that not an air bubble escapes their vigilant eye.

So next time you smile at your mirror, remember the countless hands from Triveni that have perfected it.

Triveni sheet glass is used :
For mirrors — the finest mirrors depend on Triveni's 'selected' glass for undistorted reflections.
In laminated and toughened glass — for automobiles, railway coaches and factories.
For glazing—in doors, windows and furniture, etc.

Triveni Sheet Glass . The house of glass with a foundation of steel.

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

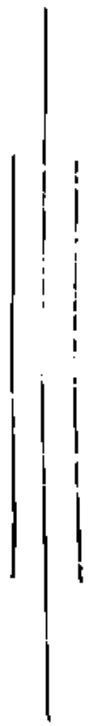

Manufactured by

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS"　　PHONE : 45-0125 (3 Lines)

'Forget not that a Supreme entity is guiding and watching you'.

—Thakur Satyananda Dev

Space Donated By

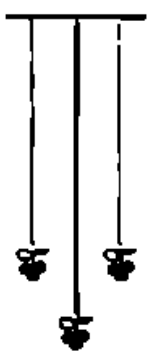

HIND TRADING COMPANY

16, Bonfields Lane,
Calcutta-700001

Dealers in : Hardware, Electricals, Paints and Tea Garden Stores.

Specialist in : Tea Machinery Spares.

Phone 26-4176
27-0155

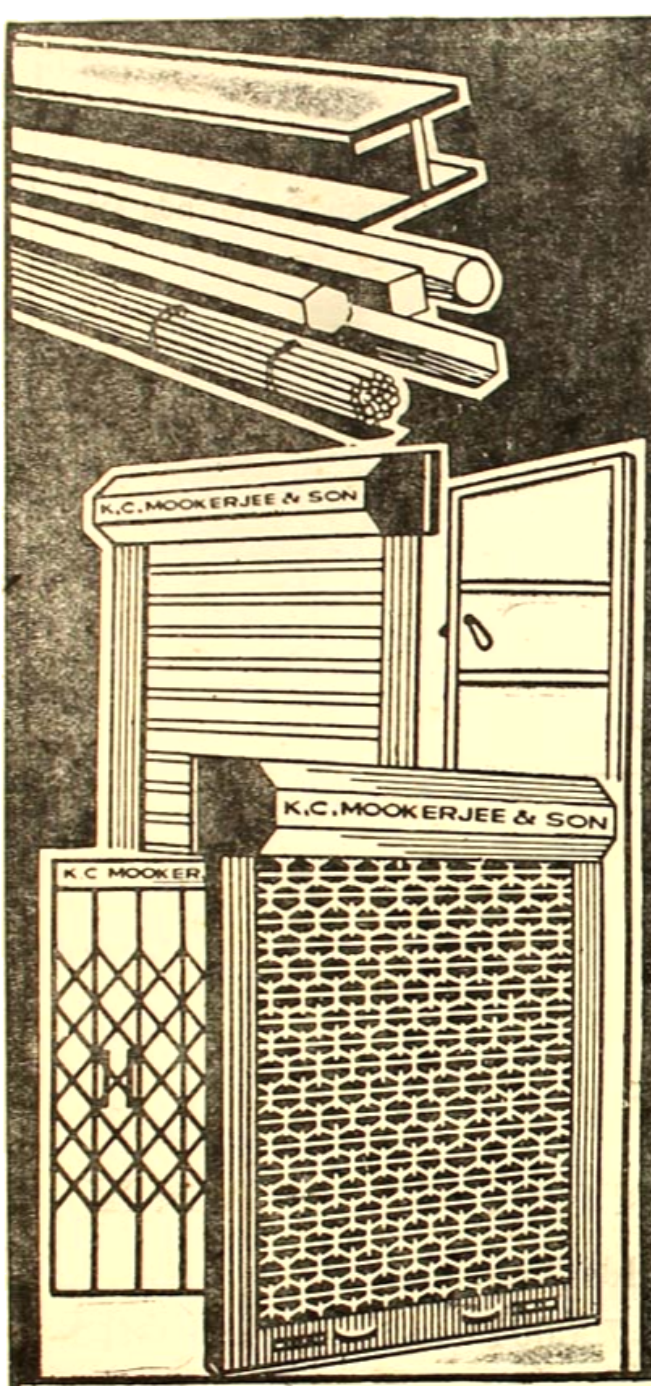

AUTHORISED
TATA IISCO
&
HSL DEALERS

ESTD 1836

KCM

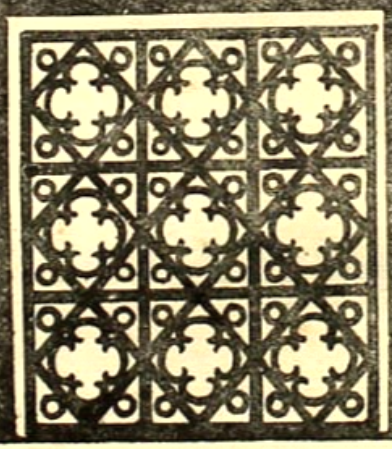

K. C. MOOKERJEE & SON.

27, NIRMAL CHUNDER STREET,
CALCUTTA-700012

PHONE :- 26-7097

Gram :

Office : 23-7583
Works : 58-2732
58 2733
58-2734

With Best Compliments Of

Bihar Malleable Castings Ltd.

A new name in the
STEEL INDUSTRY

16, Hare Street, Calcutta-700001

Undertakers of Precision Castings, Grey Alloy,
Graded & High Duty Iron Cast & Alloy Steel.

With Best Compliments Of

Phone : Works : 55-2285
Office 22-7170
23-9762
23-3628

Star Fitting Works

Dealers in Tea Chest Fittings

Office : 5 & 6, Fancy Lane,
CALCUTTA-700001

Works : 17, Hurro Chandra Mullick Street,
CALCUTTA-700005

"Very few understand that the aim of human life is to realise God"
—Sree Ramakrishna

Space Donated by

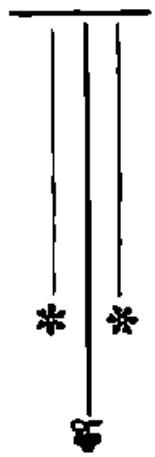

Phone : 35-3779

SREE MUDRAN

40, SHIBNARAYAN DAS LANE,
CALCUTTA-700006

Factory : 45 7523
Resi 45 7499

Hind Metal Industries

Dealers in Tea Chest Components.

I, P. N. Mitra Lane, Tollygunge,
CALCUTTA-700053

Phone : 57-3129

With Lords's Blessings :

SHEET & METAL INDUSTRIES

134, JESSORE ROAD,
CALCUTTA-700028

Manufacturers of :
TEA CHEST FITTINGS, SPRAYERS
AND
TEA GARDEN SUPPLIERS.

With Best Compliments Of

Phone Works : 65-3293

Mazumder Engineering Co. (Private) Ltd.

Manufacturers of Heat Resistant, Acid Resistant, Ni-Hard and all types of Graded Iron Castings according to Indian Standard Specification.

Regd. Office :
11, ULTADANGA ROAD
CALCUTTA-4

Works :
6, 'Q' ROAD, MONSATALA
HOWRAH-5

PALANPURIS
TELEX No, CA-7719, TEEMADE Tel. 22-4820

Estd 1908

Madhablal & Co.

EXPORTERS & IMPORTERS

11, EZRA STREET,
G.P.O. POST BOX NO-2465
CALCUTTA 700001

Blenders and Exporters of Finest Quality Teas and Golden Dust.

N. G. Chakrabarti Alloy Steels (P.) Ltd.

INCORPORATING

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings
SUCH AS
Nickel Chrome Steels
Heat Resisting Steels
Stainless Steels
Austenitic Manganese Steels
Made In
Induction Furnace.

2. Alloy Iron Castings
SUCH AS
Heat Resisting Alloy Iron Castings
High Duty Iron Castings
NIHARO Castings
Graded Iron Castings
OF
All Special Grades & Sizes

3. Direct Arc Electric Melting Furnaces
For Melting all Grades Steels,
Alloy Steels & Alloy Iron etc.

MINI MODEL	MAXI MODEL
SR-1—150 Kgs. Batch	SR-4—1000 Kgs. Batch
SR-2—250 Kgs.	SR-5—3000 Kgs.
SR-3—500 Kgs.	SR-6—5000 Kgs.

●

Quality Guaranteed

Works

K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah, (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

Head Office :

3D, Nandy Street,
Calcutta-700029
Phone : 42-5197
Cable : "ENGEECEE"
Calcutta.

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

সপ্তত্রিংশ বর্ষ	তেরশ' নব্বই	আশ্বিন	শারদীয়া সংখ্যা

আগমনী

শ্রীশ্রীঠাকুর

ও সোনাল মেঘের বা
তুই নি জানিস্ আসবে কবে
আমার সোনার মা ॥

বৃষ্টি ধোওয়া আঙন কোণা
মুক্ত পারা শিউলী ভরা
ঝরিয়ে দিয়ে যা ॥

টলটলে এই গঙ্গা কূলে
মা যে আমার আসবে চুলে
তাই ভরা বুকের না ॥

কোনখানেতে রাখবো মায়ে
নেবুর বাসে সোঁদাল ছায়ে
কমল নিতল পা ॥

—:•:—

"ঈশ্বর আছেন, তাঁর সৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়"।—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সত্যানন্দদেব

ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়; যুগে যুগে অবিশ্বাসীর দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বটে—ভগবৎ অস্তিত্বকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে সত্যিই, কিন্তু কোথায় আজ তারা? অথচ ভগবানে বিশ্বাস চির অবিনশ্বর। এই বিশ্বাস বলতে আমি বোঝাচ্ছি সমষ্টি মনের বিশ্বাস। ব্যষ্টি-মনের সাময়িক বিশ্বাস চলে গেলেও, সারা বিশ্ব জুড়ে সমষ্টি মনে যে ভগবৎ-বিশ্বাস, সেই সৃষ্টির আদি উষা থেকে সে কি বৃথা? 'ঈশ্বর আছেন, তাঁর সৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়' ঠাকুরের এই মহাবাণীর কত যে দ্যোতনা, কত যে অর্থ, সে আমরা যত পড়ি তত বুঝতে পারি। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরই এক জায়গায় বলেছেন—যে বাবুর ঐশ্বর্য্য নাই, সে বাবু 'বাবু' কিসের? তেমনি এই জগৎ সেই ঈশ্বররূপ বিরাট স্রষ্টার ঐশ্বর্য্য। একজন দার্শনিক যেমন বলেছেন, গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে যদি সুন্দর একছড়া মালা দেখতে পাই তাহলেই মনে হবে, কে এ মালা গাঁথলো? নিশ্চয়ই এর স্রষ্টা আছে। তখন নিশ্চয়ই মনে হবে না এ মালা প্রকৃতির কোন কারণে accidentally গাঁথা হয়ে গেছে; তেমনি চন্দ্র-সূর্য্য শোভিত এই সুন্দর জগৎ, যার মধ্যে দিন, রাত্রি, ঋতু পরিবর্তন সমস্ত কিছুই শৃংখলাবদ্ধ ভাবে হচ্ছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর হঠাৎ যেমন প্রচণ্ড শীত আসে না, আবার সারা বিশ্বে একটা সুসামঞ্জস্যের মধ্যে একটা বৈচিত্র্যও দেখা যায় বিশাল জলধি, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, আবার ধূ-ধূ বালিয়াড়ি মরু প্রান্তর, বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র দেশ সবই সেই স্রষ্টার মহিমা প্রকাশ করছে।

এ ছাড়া সমস্ত বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক কার্য্যেরই এক একটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, একই কারণ একটি নির্দিষ্ট কার্য্যই ঘটিয়ে থাকে, তেমনি এই বিরাট সৃষ্টিরূপ কার্য্যের কারণ সেই ঈশ্বরই নিজে। আমরা যদি একটি বীজ পুঁতি তাহলে একটি অঙ্কুরিত চারাগাছই পেয়ে থাকি, সেটি হঠাৎ একটি মানুষ বা পাখী হয়ে যায় না, কেননা বিশ্বের প্রতিটি কার্য্যের পেছনে বা প্রতিটি প্রকাশের পেছনে একটি চৈতন্যশক্তি খেলা করছে। কাজেই জগৎরূপ কার্য্যের পেছনে সেই বিরাট চৈতন্যশক্তিই খেলা করছে, এ তো জগৎ দেখে প্রতিনিয়তই বুঝতে পারছি।

তারপর এই বিশ্বের সমস্ত ব্যষ্টি-মনের পেছনে কাজ ক'রে যাচ্ছে একটি বিরাট সমষ্টি-মন; তিনিই ঈশ্বর। ভাববাদীরা বলেন, আগে ভাব তারপর বস্তু, তেমনি এই জগৎরূপ সৃষ্টির আগে সেই বিরাট চৈতন্যময় মনেও জেগেছিল সৃজনের ইচ্ছারূপ ভাব, তারপর জগৎ-রূপ স্থূলবস্তুর প্রকাশ সম্ভব হল।

আমরা আমাদের প্রত্যেকটি কাজের আগে মনে মনে একটি পরিকল্পনা করি তবে কাজ করি। আমাদের কাজের পেছনে যেমন আমাদের চেতন-মনের প্রকাশ রয়েছে, তেমনি সৃষ্টিরূপ বিরাট কাজের পেছনে রয়েছে ঈশ্বরের সেই বিরাট চৈতন্যময় মনের পরিকল্পনা।

বিরাট চৈতন্যময় মনের পরিকল্পনা ভিন্ন এই জগৎ-সৃষ্টি সম্ভব নয়। ওদেশের বড় বড় দার্শনিকেরাও এ-কথা মেনেছেন।

অবশ্য ডারউইন প্রমুখ Evolutionist-রা ঈশ্বর মানেন না। তাঁরা এই সৃষ্টিতে ছোট্ট প্রাণপঙ্ক বা প্রোটোজোয়া থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারার ক্রমে বাঁদর পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন, আরও বলেছেন বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব। কিন্তু যতই তাঁরা ব্যাখ্যা ক'রে চলুন, এখানেই তাঁরা মেলাতে পারেন নি; বাঁদর বা বাঁদরেতর কোন প্রাণীর মধ্যেই morality নাই এখানেই তাঁদের মতবাদে থেকে গেছে একটা বিরাট missing link. কেউ কেউ বলেন, একদল বাঁদরের উপর cosmic ray পড়ে হঠাৎ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু cosmic ray তো সর্ব্বদাই বর্ষিত হচ্ছে, তবে কেন অন্য সমস্ত বাঁদর মানুষ হচ্ছে না? কাজেই ওঁদের ব্যাখ্যা এইখানেই পরাজয় মানছে। ওই যে missing link থেকে গেছে,

আমরা বলব ওটা ভগবানের special grace. ভগবানের বিশেষ শক্তিতেই মানুষের উদ্ভব, morality যুগে, চৈতন্য-যুগে, বোধিযুক্ত মানুষের উৎভব। যাই হোক, তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই মানুন, কিন্তু তাঁদের survival of fittest মতবাদেই সর্বত্র যোগ্যতমের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। প্রকৃতির নির্বাচনে সর্বত্র বুদ্ধিই জয়যুক্ত একথা তাঁরাও মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাই যদি হয়, তবে এই চৈতন্যময় বুদ্ধির জয়ের ব্যবস্থা একজন চৈতন্যস্বরূপ বুদ্ধিমান শক্তি ছাড়া আর কে করেছে? কিন্তু মতবাদের শেষ নাই, শুধুমাত্র তর্কের দ্বারা সবটুকু বোঝা যায় না—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'! আধুনিক মতে অনেকে বলেন, এই জগতের আবির্ভাব আপনিই বা accidentally হয়েছে। এর কোন সৃষ্টি-কর্তা নাই। কিন্তু এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া যায় এই জগৎ যে রয়েছে, সেটি বুঝছে কে? আমরাই বুঝছি আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানব-চেতনা দিয়ে। একজন মৃতের কাছে জগতের কোন মূল্য নাই, জগৎসংসার কোন অস্তিত্বই নাই। কাজেই এই সমগ্র সৃষ্টি যাঁর কাছে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি যে এক সমষ্টি চৈতন্যময় বিরাট সত্তা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর চৈতন্যে চৈতন্যময় আমরা ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানব এই জগৎকে বোধ করছি, জানছি।

তারপর আমরা দেখি, জগতে অধিকাংশে মানুষের মধ্যে সৎ-অসৎ বোধ আছে। সৎ কাজের ফল শুভ, অসৎ কাজের ফল অশুভ, এই বোধ বা পরিণাম চিন্তা কোথা হতে মানুষের মনে এলো—যদি না জগতের পেছনে সৎ-অসৎ কর্মের ফলদাতা একজন বিচারক না আছেন। এই সৎ-অসতের ফলদাতাই ঈশ্বর। জগতে সবাই একই রকমের নয়। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, এই যে বৈষম্য, এইখানেই এসে যায় জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ। দেখা যায়, মানুষ প্রচণ্ড চেষ্টা করেও একজন ঠিক আর একজনের মত ধনী বা বুদ্ধিমান বা সুখী বা সুস্থ হতে পারে না। এ তো জগতে আমরা নিত্য নিত্য দেখছি। শ্রীঠাকুরের ঐ যে কথা 'ঈশ্বর আছেন তাঁর জগৎ দেখলেই বোঝা যায়'—এ খুব দর্শনসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত কথা। কাজেই শ্রীঠাকুরের বাণী moral argument দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়।

তারপর কান্টপ্রমুখ moral kingdom-এর কথা বলেছেন। অনেক সময় দেখা যায়, ভালো মানুষ হয়তো এ জগতে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কান্ট বলেন, পরকালে তারা নিশ্চয় সুখ ভোগ করে। তা যদি না হত তাহলে মানুষ আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য প্রাণ দিত না। মিথ্যা, অন্যায়, স্বার্থবোধে জগতটা অরাজকতার ভরে উঠত। এই জগতের পারে আছে যে রাজ্য সে রাজ্যই হচ্ছে Kingdom of heaven, সেইখানেই সৎ মানুষেরা পুরস্কৃত হয়।

মাটিন্যু প্রমুখ দার্শনিকগণও বলেন, আমাদের মধ্যে এই যে নৈতিক বোধ, এটির প্রশ্নেনা যদি করতে হয়, তাহলে এর পরিপূর্ণ বিকাশ একটি জায়গায় নিশ্চয় আছে এটাও মানতে হবে। তা না হলে মানুষ কিসের আশায় নীতির পথ ধরে চলে, যদি তার বিশ্বাস না থাকে যে, সে চলেছে সত্যের পথ ধরে এবং এটাই সত্য শিব সুন্দরের পথ। কাজেই এই নীতিবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ যেখানে তিনিই ভগবান; জগতের সব কিছুরই Standard. যেমন জগতের বিভিন্ন সময়ের মাপকাঠি হচ্ছে গ্রীনউইচের সময় Greenwich Mean Time

মানুষের মনে এই যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, এ চিরন্তনী—সেই কোন্ সুদূর অতীতকাল হতে চলে আসছে এই ঈশ্বর-বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসের পেছনে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে মানুষের মনে ঈশ্বরের ধারণা জাগল কি ক'রে? তাই বলা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি না আছে তাহলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজও পর্যন্ত সেই অদেখা বস্তুটিকে নিয়ে চিরন্তন একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলছে কেন? এই ভগবৎ অস্তিত্বে বিশ্বাস এটা শুধু সভ্য জাতির মধ্যেই নাই, অসভ্য বুনো জাতির মধ্যেও বিশেষভাবে আমরা দেখতে পাই। হটেনটট, বুশম্যান, সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি সব দেশের অসভ্য জাতির মধ্যেও কেন আমরা ভগবৎ বিশ্বাস দেখতে পাই? কই 'হ-য-ব-র-ল'-কে নিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ তো মাথা ঘামায় না। আমার মনে হয় ভগবৎ বিশ্বাস মানুষের জন্মগত instinct. এটা সামগ্রিকভাবে মানুষ ভুলে গেলেও দুঃখে, শোকে, রোগে বিপদে আপদে বুক ভরে ভগবানকে না ডেকে মানুষ পারে না।

আরও প্রমাণ হচ্ছে জগতের প্রত্যেকটি কীট-পতঙ্গ থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে দেখা যায় কেউই নিজের পরিস্থিতিতে খুসী নয়, সকলেই চায় আরও উন্নতি, আরও সুখ। এখন এই যে, upthrust গতি-ভঙ্গী, ঊর্দ্ধগতির প্রচেষ্টা বা আকুলতা, এর থেকেই তো মনে হয়, ঊর্দ্ধলোকে একটি সত্তা আছেন, যাঁর আকর্ষণে চন্দ্রের আকর্ষণে সাগর-বুকে জোয়ার জাগার মত সকলের মনে জাগছে ঊর্দ্ধগমনের অভীপ্সা। অণু পরমাণুও ছুটে চলেছে ঊর্দ্ধগতিতে। সকলের মনে ঊর্দ্ধগতি প্রচেষ্টা বা প্রেরণা জাগাচ্ছেন কে? তিনি ছাড়া? আমাদের শান্ত সসীম মনে অনন্ত অসীমের ধারণা এলো কি করে? যদি অসীম অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বর না থাকবেন।

তবে ভগবৎ বস্তু হচ্ছে metaphysical-রাজ্যের কথা, physical রাজ্যের বস্তু বা তত্ত্ব দিয়ে তাঁকে প্রমাণ করা যায় না। এটা অনুভূতির বিষয়। মস্তবড় দার্শনিক রাসেলও বলেছেন—দর্শনশাস্ত্র, ভগবৎ-তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রমাণ করতেও পারে না, আবার নস্যাৎ করতেও পারে না বা অস্বীকারও করতে পারে না। শ্রীরামানুজও বলেছেন, ঈশ্বর আছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে প্রমাণ করা আমাদের সাধ্য নাই। বেদই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ, এটা মেনে নিতে হবে।

ভগবৎ তত্ত্ব তো metaphysical রাজ্যের কথা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে বিষয় অসম্ভব হতেই পারে; কিন্তু এই Physical রাজ্যের কথা উচ্চ উচ্চ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেগুলি, সেগুলি বোঝেই বা কয়জন, আর সেগুলিও তো সব প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর্য্যায়ে পড়ে না; তাই বলে সেগুলি মিথ্যা একথা বললে লোকে পাগল বলবে। যেমন বৈজ্ঞানিক বলে একটি ছুঁচের ডগায় লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন প্রোটন খেলা করে; কিন্তু সেই ইলেকট্রন প্রোটনের খেলা খালি চোখে তো দূরের কথা, মাইক্রোস্কোপ বা খুব শক্তিশালী দূরবীন নিয়েও দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে বিজ্ঞানীর কথা মেনে নেয়। আবার যদি না মানে, তাহলে তাকে জীবনভরা পরিশ্রম করে, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে, গবেষণাগারে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তবে যেমন কোন মতবাদকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় তেমনি যে ভাগবৎ-সত্তাকে জানবার জন্য মুনি-ঋষিরা যুগ যুগ ধরে ধ্যান করেছেন, যোগী গিরিগুহা-বাসী হয়ে সাধনা করেছেন, তাঁদের উপলব্ধিজাত সত্য বস্তু বা ভগবৎ-বস্তুকেও উড়িয়ে দিতে যাওয়া তো ভ্রান্তি। আগে দীর্ঘদিন ধ্যান কর, সাধনা কর, তবে তো বলবে ভগবান আছে কি নাই।

মস্তবড় বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans দীর্ঘ বিজ্ঞান সাধনার পর ভগবান মানতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি বলেছেন—জগতের পেছনে একটি পরিকল্পনাশীল ও নিয়ামকশক্তি আছে বলে মনে হয়। সেই পরিকল্পনাশীল বাক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যাষ্টি-মনের কিছু সাদৃশ্য আছে।

আসল কথা, যার জল-তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সেকি তখন জল নিয়ে বিচার করতে পারে? জল ভিন্ন সে তখন বাঁচতে পারে না। এখানেও ঠিক তাই আমাদের তাঁকে জানবার তৃষ্ণা জাগে নি, তাই আমরা তাঁকে নানা গোলমালের মাঝে হারিয়ে ফেলি। যখন সংসার দাবদাহে ঘুরে ঘুরে আমাদের মনে তৃষ্ণা জাগবে সেই অমৃতের তখনই ঠিক তাঁরই সন্ধানে আমাদের ঘুরে বেড়াতে হবে; আর একদিন না একদিন এই তৃষ্ণা জাগবে সকলেরই। তিনি একদিন কৃপা ক'রে আপনাকে ধরা দেবেন কারণ কৃপাই হচ্ছে শেষ কথা। গ্রীক দার্শনিক প্লটিনাস-এর কথায় বলতে হয় আমরা চেষ্টা-বলে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত যেতে পারি, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে পারি না। অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাওয়া নির্ভর করছে তাঁর কৃপার ওপর। তাই আমাদের কাজ হবে তাঁর দুয়ারে আঘাত করা, সাধনা করা; তাহলে তাঁর কৃপা হবে, দ্বার খুলবেন। কৃপা হবেই হবে। ভগবৎ অভিজ্ঞা জানা বা লাভ সবই কৃপার ওপর নির্ভর করছে, উপনিষদ, গীতা, কথামৃত এসব শাস্ত্রেই ওই কৃপার কথা বলা হয়েছে। আমাদেরও তাই যুক্ত ক'রে কৃপা প্রার্থনা জানাতে হবে তাঁর চরণে।

আয়রে পূজি মাকে

শ্রীশ্রীঠাকুর

আজ শরতের রূপ দিপালী—ঘরে ঘরে মঙ্গলাচার—আনন্দ আর আনন্দ। খুশীর বাঁশী বেজে উঠেছে গগনে ভুবনে পূজার আনন্দ আজ ঘরে ঘরে।

(১)

পথিক শরৎ অতিথ শরৎ
ওমকে দাঁড়াও দেখি
বটের মূলে ছায়ার আসন
আজ কি যাবে লেখি॥

(২)

মেঘে মেঘে রঙ ধরেছে
সাত সায়রের রঙ
গোপাল বলে পড়বো আমি
রাখালিয়া রাখী॥

(৩)

পূজার বাঁশী ললিত ছন্দে
প্রাণের প্রবাল বোজে
জীবন নদী খুশীতে আজ
চাইলে অনিমেষ॥

জানবাজারের রাণী রাসমণির ঘরে আজ মহামহোৎসব। শ্রীঠাকুরকে তারা নিয়ে এসেছে। 'বাবা' না হলে তাদের পূজো হবে মিথ্যে। কিন্তু বাবাকে যায় না পাওয়া। কোথায় তিনি? জগদম্বা দাসী বার করে বাবাকে—বাবা, তুমি একলা বসে এখানে, তোমায় খুঁজে ফিরছি কত। আজ সপ্তমী, মার পূজো, চামর করবে না মাকে? চল তোমায় সাজিয়ে দিগে বেশ ভাল ক'রে মার সখী বেশে—চল চামর ক'রবে। 'ঠাকুর এসে দাঁড়ান' সখী বেশে। মধুর দেখে আর দেখে—চিনতে আর পারে না—ঠাকুর গান ধরেন:—

(১)

পাগলী মেয়ে দাঁড়ালি কি
দালান আলো ক'রে
আমিও কি রইবো হেথা
একলা কোণে প'ড়ে॥

(২)

সাত সাগরের শঙ্খ নেবো
মঙ্গলাচার করি
আকাশ হ'তে মেঘের চামর
আজকে লব কেড়ে॥

(৩)

অষ্ট সখী আসবে ঘিরে
অষ্ট কলস নিয়ে
তাদের সাথে আমিও নি
আঁখির কলস ভ'রে॥

পূজার তিনটি দিন 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' এ দ্বার কেটে। রাণী রাসমণির ঘরে পূজো—দীনদরিদ্রদের আজ সবার নিমন্ত্রণ।

পূজোর বাঁশীতে আর বিষাদের অকারণের হাসিতে আকাশ হ'য়ে ওঠে আরো নীল। চাঁদের মত এর একটা বিরহ মধুর রূপ আছে। আনন্দের হাট বাজারেও যেন জাগে বিষাদ মধুর বিজয়ার একটা রেশ। মধুরের এখন থেকেই ভাবনা। সকলে ঠাকুরকে ডেকে আনে। মুখ বুক তার আরক্তিম। ঠাকুর বলেন—মা যে আমার নিত্যময়ী।

(১)

কোন প্রাণে আজ বিদায় দেবো
কত সাধের মা আমার
মুখ দেখে যে বুক ভরে যায়
মাণিক সে যে সাত রাজার ॥

(২)

একলা ঘরে রইবো কেন
নিত্য পূজার মণ্ডে
মাকে আমার রাখবো ঘিরে
আলো হবে সব আঁধার ॥

(৩)

তিনটী দিনে সাধ পুরে না
সকল দিনের এই পূজার
মা যে আমার বিজয়িনী
বিজয়া নাই দুখ বাথার।

ঠাকুর বলেন—মাকে কেউ হারায় নাকি, মার কি বিসর্জ্জন আছেরে, চোদ্দভুবন জুড়েই যে মা—কোন সাগরে তাকে বিসর্জ্জন দিবি? দেখ দিকি তোর হৃদয় মন্দিরে মা যে সদাই বিরাজ করছেন। আর বুকে হাত বুলিয়ে দিই।

মাকে কোথায় হারাবি রে
কোথায় আছে কোথায় নাই
গগন ভুবন জুড়ে যে মা
ঘটে ঘটে তারেই পাই।
সাকার তিনি নিরাকারও
আরো কি-যে বলবে কে
মাকে আমার চিনতে গিয়ে
বিশ্বনাথের নাই দিশাই।
মায়ের কথা বলতে গিয়ে
আগম নিগম হ'ল হারা
বুকের কাছে তবু তারে
আপন ক'রে পাই সদাই ॥

মধুর বলে—আহা! আহা! এই তো আমার মা! সত্যিকারের মা!! হৃদবিলাসী মাকে পেলে আর কি চাইবো? রূপ তো নয়—ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী···মা মা শ্যামাময়ী এত দয়া তোর ওরে বাজা-বাজা-নিত্য আবাহনের বাদ্যি বাজা—ছেলের কাছে মায়ের বিসর্জ্জন নাই। মাকে আমার হৃদয় মন্দিরে নিত্য রাখবো; কোথাও বিরহ-বিচ্ছেদ নাই।

আয়রে পূজি মাকে মোদের
আয়রে সব ছেলে মেয়ে
মন্দিরে নয় পাষাণ রূপে
মা-যে আছে বুকটা চেরে ॥
সুখে দুখে খুঁজবি কোথা
দূরে-অন্তিকে
খুঁজবি কোথা আপন মাকে
এমন ধারা পাগল হ'য়ে।
নাচরে সবাই ঘুরে ফিরে
মন্ত্র তন্ত্র নাই
বিশ্বনাথ যে পাগল হ'ল
পাগল করা চরণ পেয়ে।

—৩—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য

শ্রীঅর্জনাপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রসালে বকুলে মৌ নিয়ে মাতামাতি
এমনি সে কোন খেলা
স্বপ্ন সীমারে লঙ্ঘিয়া চলে চুপে
আকাশ মাটীর খেলা।

জননী শ্যামার দুটি আঁখি ওঠে ভিজে
বিদায় অশ্রু রাগে
সোনার দুলালী—চলে যাবে কত দূরে
ভাবিতেই ব্যথা লাগে।

পাষণ্ডের সাথে কেমনে বাঁধিবে ঘর
পাগলে কি যায় বাঁধা
না জানি কপালে আরো কত দুখ আছে
নিষ্ঠুর বিধির সাধা।

তবু যেতে হবে সব আয়োজন শেষে
দুহিতার মুখ চুমি
কহিলেন শ্যামা, "কি আর বলিব মা গো
সুখী হও সুধু তুমি।"

লজ্জা আতুর দু'ফোটা অশ্রুজল
ফোটে দুলালীর চোখে
হিয়ার আঙনে কল্পলতার ফুল
ফুটে ওঠে চুপে চুপে।

আর দেরী নয় গগনে বাড়িছে বেলা
বহু দূর হবে যেতে
জননীরে নমি চলিল সারদা মেয়ে
দেব জনকের সাথে।

সিন্ধ করিয়া দক্ষিনাপুরীর পথ
চরণ অলক্তকে
সে চলা ছন্দে ফোটে মন্দার লতা
ধরণীর স্বর্লোকে।

বুকের গহিনে কান পেতে রন শোনে
ফল্গু নদীর কথা
পার হয়ে ঐ উড়াল বালুর চর
সবুজ সার্থকতা।

পথ আর পথ শেষ নেই সীমা নেই
সীমাহীন বিস্তৃতি
কোথাও ক্লান্ত আকাশের নীল দূরে
বেদনায় আনমিত।

ধান কাটা মাঠে তৃণ রোমাঞ্চ সুধু
সদা উঠেছে জাগি
ভাঙা আলপথে শুধু দুটি বুনোফুল
সদা মেলেছে আঁখি।

চলেছে সারদা দক্ষিনাপুরের পথে
পিতা শ্রীরামের সাথে
বন্ধুর পথ চির বন্ধুর সে কি
কণ্টক বেদনাতে।

কোথাও ঘনানী চারু কুন্তল রাশি
বিছায়েছে প্রান্তরে
সোহাগিনী মেয়ে মধুরা নায়িকা সম
কেহ বন পথ ধ'রে।

মন্থ গমনে চলিতে অবশ আবেশে
থমকিয়া যেন চায়
বনের কবিতা পলাশের ফুল হ'য়ে
ঝরে ঝরে পড়ে পায়।

কভু বাদা বনে ছায়া ছায়া বুনো ঝোপে
মাঝরাতাদের মেলা
রেলা ফুলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খায়
সোনা ঝিক্ মিক্ বেলা।

আর কত দূর, কত দূর আর ওগো
রোদ নামে মাঠ ভেঙে
ছায়া ঢাকা গ্রাম একটি সবুজ আশা
সুদূরে রেখেছে টেনে।

সারদার রাঙা ক্লান্ত মুখেতে চেয়ে
পিতার নয়নে জল
কহিলেন, "মা গো মিলিবে পান্থশালা
আরো কিছু পথ চল।"

কুশ তৃণে ঢাকা মেঠো পথ পার হ'তে
বাড়ে কণ্টক ক্ষত
সাগরে মিলিতে তটিনীও বুঝি হয়
এমনি উপলাহত।

আর যে চলে না ক্লান্ত চরণ দুটি
দেবতা গো দয়া কর
অসহ যে লাগে অবশ তনুর ভার
কেঁপে ওঠে থর থর।

বিহ্বলে এলায়ে পড়িল সারদা রাণী
মুখে না নিসরে বাণী
উদগ্রীব পিতা ছুটে আসে তাড়াতাড়ি
দুলালীরে লন টানি।

কহিলেন, "মাগো কি হয়েছে তোর বল ?"
সারদা কাতরে কয়
"কত বাকী বাবা দক্ষিনাপুরীর পথ
চলা আর নাহি সয়।"

পরশি ললাট চমকে পিতার মন
একি মা গায়ে যে জ্বর

সারদার দুটি তপ্ত কপোল বাহি
ঝরে আঁখি ঝর ঝর।

মন বলে তার অন্তরতম ওগো
তোমার মিলন পথে
চলা বুঝি শুধু বাঁহি শত কাঁটাক্ত
নহে সে ফুলের রথে।

বাঁহি সাবধানে দুলালীরে কোন মতে
আনিয়া পান্থবাসে
স্নেহাতুর পিতা হ'ল যেন কিছু শান্ত
সন্ধ্যা নামিয়া আসে।

ক্লিন্ত শয়নে লুটালো সোনার মেয়ে
যেন সে ছিন্ন লতা
শুপ্ত তনুরে ঘিরিয়া কাঁদিল শুধু
সে রাতের আকুলতা।

দুহিতারে রাখি পান্থ কুটীরে একা
বাহিরের আঙিনায়
রহিল শ্রীরাম আগলিয়া গৃহ দ্বার
নিশীথের প্রহরায়।

জ্বলে সুপ্রভ তারার দেয়ালী আলো
আকাশ গঙ্গা তীরে
দীপ দান ব্রত যাপিয়া রোহিনী বধূ
গৃহ পানে চলে ফিরে।

মুক্ত বিশাল খোলা প্রান্তর বুকে
দক্ষিনার হাহা বাণী
পান্থশালার জীর্ণ দুয়ারে ডাকে
পুষ্পল কর হানি।

দূরের জলায় ঘন আলেয়ার সাথে
জোনাকির লুকোচুরি
নিশীথে চুপি চুপি দেয় খুলে
রহস্যের মায়াপুরী।

সহসা নিবুম পান্থশালার বুকে
নিশি মন্থন রূপে
কুন্তলবতী কে আসি দাঁড়ালো ঘরি
মৃদু হাসি ভরা মুখে।

সে দুটি পায়ের মনি হসেক তালে
সে রাতের যত স্বপ্ন
মুখরি উঠিল দ্যুলোক ভূলোক জুড়ি
মুখরিত করি লগ্ন।

নিলাজ জোছনা নীল হয়ে যায় লাজে
সে রূপের মণিজালে
সে কালো চোখের পাথারে বিজলী মেয়ে
আঁধারে প্রদীপ জ্বালে।

নিশীথ নিশাসে প্রংর উঠিল কাঁপি
মাখিয়া দু'চোখে তন্দ্রা
শ্যামার কিনারী বিভল নয়নে চায়
নন্দন মহুদ্দা।

হেরিয়া সে রূপ আকুল আঁধার বরণী
কহিল সারদা চুপে,
"কে গো তুমি মেয়ে শিঙ্করে বসিয়া মোর
চেয়ে আছো মোর মুখে।

মিঠে পরশের পেলব মাধুরী ছড়ায়ে
অঙ্গের কুলে কুলে
কোথা হতে তুমি এলে বল একা একা
এসেছ কি পথ ভুলে?"

সারদার সেই আকুল প্রশ্নে মরি
হেসে ওঠে কালো মেয়ে
বলে সে "এসেছি দক্ষিনেশ্বর হ'তে
তোর লাগি আজ ধেয়ে।"

'দক্ষিনেশ্বর? ছল ছল করে আঁখি
কহিল সারদা কাঁদি,
"আমিও তো হায় ভেবেছিনু যাব সেথা
বিধাতারে কত সাধি।

ভেবেছিনু হায়—পরাণ নাথের পায়ে
ঠাঁই লব আর বার
পাষান দেবতা নাই যদি ফিরে চায়
তুলে লব সেবা তার।

আর কিছু নয় সেথা শুধু প'ড়ে রব
তারি সুখ টুকু চেয়ে
হায় সব সাধে বিধি যে গো সাধে বাদ!"
হেসে কয় কালো মেয়ে,

"সে কি কথা তুমি কে বলে যাবে না সেথা
তোমারই প্রতীক্ষায়
সে তো চেয়ে আছে তুমি ছাড়া আর তারে
কে আর দেখিবে হায়।

তুমি যাবে তার সেবা ভার তুলে লবে
তোমারই লাগি তো তারে
বাঁধিয়া রেখেছি পাষাণ দেউল বুকে
সে পাষাণ দেবতারে।"

কহিল সারদা "বাঁধিয়া রেখেছ তারে
এ অভাগিনীর তরে
এত দয়া তব কেন ওগো কালো মেয়ে
এই দুখিনীর পরে?

কেবা হও তুমি কেবা হও মোর বল?"
হেসে কয় কালো মেয়ে
"আমি তোর বোন চিনলি তো এইবার
এসেছি যে তাই ধেয়ে।

সপ্তশতীর সুরে সপ্তক বাজে
মহাকাল মন্দিরে
কৃত্তিকা বহু জানালো স্বাগত নন্দি
জননী কৌশিকীরে।

ঘুম যখন স্বপ্ননিম বিভাবরী
তারার প্রদীপ জেলে
অজানা পথের রূপকথাটুকু চুপে
দেখে গেল দ্বার ঠেলে।

জানিল না কেহ—সে রাতে আকাশ মাটীতে
রচিয়া স্বর্গ সরণী
মানুষের ঘরে দেবতার ঠাকুরালীতে
ধন্য হইল ধরণী।

সিন্দুরে মাজা পূবের নন্দ কাননে
প্রভাত মন্দানীলে
ফুটে ওঠে যেন হাজার আলোর পদ্ম
ঊষার স্বর্ণ কিরণে।

ফাগুনের সেই অনামা তিথিটি যেন
রামধনু আঁকা পথে
প্রজাপতিদের পলকা ডানার বারে
এল পুষ্পক রথে।

সে খবর এল পলাশের বনে বনে
তারি রাঙা অনুলিপি
পাঠালো ভ্রমর দখিনাপুরের পথে
কখন যে চুপি চুপি।

ভোর হয়ে গেছে শ্রীরাম আসিয়া বসে
দুহিতার শিয়রেতে
উদ্বেগ ছায়া তখন জাগিয়া আছে
কুঞ্চিত ললাটেতে।

রাঙা ঘুম ভেঙে শ্যামার কিয়ারী হাসে
জনকের পানে চেয়ে
ক্লান্তি ছোঁয়ানো নয়নে বারেক খোঁজে
কোথা গেল কালো মেয়ে।

দুহিতার স্নেহ সিক্ত ললাট ছুঁয়ে
দেব জনকের মন
হ'ল প্রসন্ন নিরাময় হেরি তারে
আগত যে শুভক্ষণ।

অধীরা সারদা শ্রীরামচন্দ্রে কয়
"চল বাবা তাড়াতাড়ি।
ক্ষণ বিলম্বে কি জানি প্রমাদ ঘটে
বেলা যত যাবে বাড়ি।"

জনকের মুখে ফোটে সস্মিত হাসি
কহিলেন স্নেহ ভরে,
"তাই চল মাগো শুভ যাত্রার পথে
কাজ নেই দেরী ক'রে।"

প্রভাতী পাখীর ঘুম ভাঙা মেঠো বারে
পিতা শ্রীরামের সাথে
প্রোষিত সে বালা চলিছে দয়িত গেহে
আধো লাজ আঁখি পাতে।

দু'ফোটা স্বপ্ন করে যেন ঝিকিমিকি
ওগো আর কত দূরে
গগনের গোঠে আলোর রাখাল কোথা
বাঁশীতে ধরেছে সুর।

(ক্রমশঃ)

—২০৫—

"নিজে মহৎ না হলে মহৎকে যায় না চেনা—যুগে যুগে যারা কল্যাণদীপ দিয়েছে
জ্বেলে আঁধারের বুকে—তাদের চেনার চোখ যুগে যুগেই বিরল।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

'যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়'

স্বামী বোধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যেন মহাসাগরের অতলান্ত হ'তে সযত্নে তুলে আনা মুক্তার মতো। প্রতিটি বাণীর পশ্চাতে ছিল তাঁর জীবন সাধনা। সেইজন্য তাঁর অনুভূতিলব্ধ কঠিন তত্ত্বকথাগুলি তিনি এমন ভাবে বুঝিয়ে দিতেন যা শ্রোতাদের কাণের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ ক'রে অপূর্ব এক ভাবলোকে তাদের নিয়ে যেত। তাঁর একটি কথা—"জড়ের সত্তা চৈতন্যে লয়, চৈতন্যের সত্তা জড়ে লয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ডেকেছিলেন মাটির মাকে। মাটিতে পেয়েছিলেন সাড়া। মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, কথা ব'লেছিলেন। পাষাণপ্রতিমা জেগে উঠে মানুষী মায়ের মতোই কাছে এসে পুত্রকে খাইয়ে দিয়েছিলেন, আবার তার হাতে খেয়েছিলেন। মায়ের সাথে খেলা, মায়ে-পোয়ে একসঙ্গে খাওয়া শোওয়া। এমনি ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের মাকেই আপন হারা। মা আর ছেলে; ছেলে আর মা। এক। এমনি ক'রে জড় আর চৈতন্যের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে একাকার হ'ল। জড়ের সত্তা চৈতন্যে আর চৈতন্যের সত্তা জড়ে লয় হ'ল।

আসলে—সবই চৈতন্যের প্রকাশ, জড় বলতে কিছু নেই। তবে চৈতন্যের প্রকাশ কোথাও কম, কোথাও বেশী। কাঠ, পাথর, ইঁট মাটিতেও আছে চৈতন্যসত্তা, তবে তার প্রকাশ এত কম যে সেগুলিকে জড়বস্তু ব'লে মনে হয়। কারণ বোধ করবার সূক্ষ্মতা আমাদের নাই।...এ প্রসঙ্গে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ তাঁর একদিনকার একটি ঘটনা বলেছিলেন—"আমার ঘরের নীচে একটি মাধবী গাছ ছিল। সেটি যখন আমাকে না ব'লে কেটে দেওয়া হয়, তখন আমি ধ্যান করছিলাম, তো হঠাৎ দেখি এক ঝলক মাধবী ফুলের সুগন্ধ; অথচ তখন ঐ ফুলের সময় নয়, কিন্তু ওই গাছটি সুগন্ধ ছড়িয়ে আমাকে জানিয়ে দিলে ওর বিদায়ের ব্যথা। এতো ওই ঠাকুরেরই বাণীর ব্যাখ্যা অবশ্য সকলের বোঝার এই সূক্ষ্মবোধ নাই। আবার সাধু মহাপুরুষদের চৈতন্য সত্তার প্রভাব বেশী। সেজন্য তাঁদের ব্যবহার্য জিনিষে তাঁদের সত্তা বেশ খানিকটা বিধৃত থাকে। এতো ওই চৈতন্যসত্তা জড়ে লয়, এরই ব্যাখ্যা। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর মাকে জাগালেন, সে তো ঐ একই ব্যাখ্যা।"

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অনুপরমাণুতে এক চৈতন্যসত্তাকে বোধে বোধ ক'রে বলেছেন—"যে আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার দু'শো ছিয়াশি মাইল, সেই গতিবেগে যদি কোন বস্তুকে চালিত করা যায়, তখন সেই বস্তুটি আর বস্তু থাকে না, সেটি তখন শক্তিতে পরিণত হয়।" সুতরাং জড়-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও দেখা যাচ্ছে যে জড় আর অজড়ে মিলে একত্ব হ'ল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"পদার্থ বিজ্ঞানের কাজ ঘটনাবলী আবিষ্কার করা, আর দর্শন যেন ঐ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলি নিয়ে তোড়া বাধবার সুতো। চিন্তাসহায়ে ঐক্য আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়। ধর্মের ভিতর স্থূল, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও চরম একত্ব—এই তিনটি ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই প'ড়ে থেকোনা। সেই চরম সূক্ষ্মতত্ত্বে—সেই একত্বে চ'লে যাও।'—চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ তাঁর এই কথার মধ্যে পরমবিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত করলেন—ধর্মবিজ্ঞানের এক নূতন আলোর সন্ধান দিলেন। সেই চরম সূক্ষ্মতত্ত্ব—সেই একত্বের সন্ধানে আইনষ্টাইনের বিজ্ঞানমানস দর্শনের রাজ্যে উপনীত হল। এক সর্বাত্মিকা শক্তি বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণ প্রবাহ। এঁকে পরমাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর যে নামেই অভিহিত

করি না কেন।···বিরাট এই বিশ্বে এক মহাশক্তির খেয়াল খুসীর খেলা দেখে আইনষ্টাইন মুগ্ধ বিস্ময়ে ধর্ম-বিজ্ঞানের তোরণদ্বারে এসে বলেন—"ধর্ম বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক ; ধর্ম হ'তে আমি শ্রেষ্ঠ প্রেরণা পেয়েছি।"

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের ঐ কথাগুলি মনন আর নিদিধ্যাসন করতে গিয়ে কিন্তু তথাকথিত অনেক বিজ্ঞানীর উর্বর মস্তিষ্ক উষর হয়ে পড়ে। এই সব বৈজ্ঞানিক, আবার দার্শনিক ও রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা 'ধর্ম-বিজ্ঞান' কথাটি হেসে উড়িয়ে দেন, যাঁরা ভগবানের ধার ধারেন না। আমাদের গুরুদেব শ্রীসত্যানন্দ মহারাজের কাছে এদেশ ওদেশের নানা গুণীজন এসেছেন। গুরুমহারাজ মৃদু হেসে বলতেন—"আমরা যদি ভগবানের ধার না-ই ধারি, তাতে ভগবানের তো কিছু আসে যায় না। তবে, বিশ্বের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক মহামনীষিদের কথাগুলো নেহাৎ উড়িয়ে দেব কি ক'রে ? যেমন—জর্জ বার্নার্ডশ বিশ্বের বাণী মন্দিরের একজন দিক্‌পাল, তাঁর একটি কথা বেশ মনে লাগে বলেছেন তিনি, বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন—যখন বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে একটি ছুঁচের ডগায় লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতিন নৃত্য করছে, অথচ তারা ধরা দেয় না স্থূল লীলায়, তখন এটি ধ্রুব সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যখন ভগবদ্বিশ্বাসীরা বলেন, দেবদূতেরা লীলা করেন সূক্ষ্মরূপে—আর দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, উপলব্ধি করেই বলেন, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় কুসংস্কার—হাসির খোরাক মাত্র।

মহামনীষী বার্নার্ড রাসেল ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সোজাসুজি কিছু বলেননি, নানা জল্পনার জাল বিস্তার করেছেন, কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরে ভগবদ্বিশ্বাস না থাকলে ঈশ্বর আছেন কি নাই, এই নিয়ে এত কথা বলেছেন কেন ? ···'জগদ্বিখ্যাত নাস্তিক লেখক অল্ডাস হাক্সলির আস্তিক্যের উপনয়ন হয়েছে।'—এই কথাগুলি যিনি বলেছেন তিনি বিশ্বের সাধক ও সুধীমানসসভাদলের এক অপূর্ব মানুষ ; যিনি যুগঋষি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাঁরই ছায়াতলে দীর্ঘকাল বাস করেছেন ; যিনি রোমাঁরোলাঁ, বার্নার্ড রাসেল প্রমুখ বিশ্বের প্রথম সারির সাহিত্যিক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এবং রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে কতো গভীর আলোচনা করেছেন। তিনি হলেন শ্রীদিলীপ কুমার রায়। মরমী সাধক দিলীপ কুমার আমাদের কাছে এনেছেন সেই শুভ সংবাদ, কেমন ক'রে নাস্তিক হাক্সলি আস্তিক অর্থাৎ ভগবদ্বিশ্বাসী হলেন ; কেমন ক'রে জীবনের শেষ অপরাহ্নে এসে হাক্সলির দীর্ঘকালের শূন্য হৃদয় পূর্ণ হ'ল।··· হাক্সলির জীবনের পাত্রখানি যিনি ভরিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের অমৃতে, তিনি হলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য স্বামী প্রভবানন্দ। এই অনুভূতিবান ভারতীয় সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যদেশ আমেরিকায় গিয়ে, পরশমণির ছোঁয়ায় নাস্তিক অল্ডাস হাক্সলির লোহা হৃদয়কে সোনা করেছিলেন। সেই পরশমণির নাম—বিশ্বাস। বিশ্বাসই ভগবান, 'তিনি চৈতন্যরূপে চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন, যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়' (শ্রীরামকৃষ্ণ)। শ্রীগুরুমহারাজ স্বামী সত্যানন্দের কথায়—'বিশ্বাস আর ঠাকুর এক।'

—:০:—

" 'মা' ডাক কে শেখালে ?—এর উত্তরে বলা যায়—সৃষ্টি হওয়ার পর তা আবর্তিত হ'তে লাগল—তাতে যে শব্দ সৃষ্টি হল—কেউ কেউ বলে তাই ওঁ। কিন্তু বলি তুমি জন্মাবার পর যে ম্যাঁ ক'রে উঠ সে কে শেখালে বল ?
ও কেউ শেখায় না—এ হচ্ছে অনাহত। অনাদি মন্ত্র—সকলের মা বাপ আছে কিন্তু মায়ের মা বাপ নেই—মা আদিভূতা সনাতনী।"

—(স্বামী সত্যানন্দদেব)

লোকমান্য চাইনে গো মা

সাধনাপুরী

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগজ্জননী শ্রীভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতেন, 'দেহসুখ চাইনে গো মা, লোকমান্য চাইনে গো মা, অষ্টসিদ্ধি চাইনে গো মা, শতসিদ্ধি চাইনে গো মা, শরণাগত শরণাগত, কেবল এই কর যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এই বাণী অনুশীলনে আমরা বুঝতে পারি লোকমান্য সিদ্ধাই যশ এ সব ঈশ্বরের কৃপা লাভের পথে অন্তরায়।

ভগবান তথাগতের বাণীমুখেও পাই :—

'যস্সিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি
অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা,
পহীনমানস্স অনাসবস্স
দেবাপি তস্স পিহয়ন্তি তাদিনো'।

সারথি ঠিকমত রথ পরিচালনার জন্য অশ্বকে উত্তমভাবে বিনীত করে বা বশে রাখে। সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়গ্রামকে ঠিকমত দমন করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হন, তিনি নববিধ মান ও চতুর্বিধ আস্রব ত্যাগ করে মুক্ত হন। এরূপ মুক্ত মহান্ পুরুষের দর্শনে দেবতারাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন।

(অহরহ কগ্গো ১৪ বর্ষপদং)

উপনিষদমুখেও আমরা পাই লোকমান্য যশ এসব ভগবৎ লাভের পথে অন্তরায়

'সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা।'

ব্রাহ্মণ মান সম্মানকে বিষের ন্যায় সর্বদা উদ্বেগের কারণ বলে মনে করবেন। কারণ সম্মান খুবই লোভনীয়। সম্মানলাভের আসক্তি এলে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে লৌকিক সম্মান লাভের বাসনা জেগে ওঠে। আত্মসাক্ষাৎকার সুদূর পরাহত হয়, যে কারণে বিষবৎ ত্যাগ করা উচিৎ।

অবতার পুরুষের বাণী, শাস্ত্রবাক্য এসব থেকে আমরা পেলাম মান-যশ সর্বৈবভাবে ত্যাগ করা উচিৎ। শাস্ত্রবাক্য আমরা অনেকেই পাঠ করি বা শুনি। অবতার পুরুষগণের উপদেশও আমরা ভাগবৎ গ্রন্থগুলির মাধ্যমে পাই কিন্তু জীবনে সেগুলি কাজে লাগাই না বা তার চেষ্টাও করি না বা পুরোপুরি এগুলি জীবনে প্রকাশিত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। কিন্তু এই শাস্ত্রবাক্যগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখি শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের জীবনে। শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব শাস্ত্রবাক্য বা ভগবৎ বাক্যের মূর্ত প্রতীক। শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেবের জীবনে লোকমান্য চাহিদা আদৌ ছিল না এ সম্বন্ধে আমি আমার অক্ষম লেখনীমুখে কিছু নিবেদন করব।

কলিকাতা মহানগরীর এ্যাসিসট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনারের সন্তান শ্রীঠাকুর কিন্তু কলেজ ও ইউনিভারসিটি যেতেন একটী আধ ময়লা খদ্দরের ধুতি ও খদ্দরের কোট পরে—বোতামও ঠিকমত লাগানো থাকতো না, মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা, মুখে গোঁফ দাড়ি, মাথায় টিকি। কখনও গাড়ী চড়ে যেতেন না—নিজে সাইকেল চালিয়ে অজপা জপ করতে করতে যেতেন—একেবারে কঠোর তপস্বীর মত দীন হীন বেশে। কলেজ বা ইউনিভারসিটিতে কখনও নিজ পরিচয় দিতেন না। বন্ধুরা দু' চার জন ছাড়া তাঁর পিতৃ-পরিচয় কেউ জানতো না। প্রফেসারগণ ও সহপাঠীরা ভাবতো গ্রামাঞ্চলের কোন অতি সাধারণ ঘরের ছেলে।

শ্রীঠাকুরের পোষাক-পরিচ্ছদের দৈনতা দেখে কোন কোন প্রফেসার তাঁকে অর্দ্ধ উন্মাদ বলে মনে করতেন। একদিন হঠাৎ ক্লাশে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সদ্য বিলেত ফেরৎ প্রফেসার বিনয় সরকার শ্রীঠাকুরকে Actuary সম্বন্ধে একটী জটীল প্রশ্ন করেই ওপর দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসতে লাগলেন —ভাবখানা এই যে, এতো পারবে না উত্তর দিতে, ক্লাসে

একটা রঙ্গের সৃষ্টি হবে কিন্তু ঘটনা ঘটলো ঠিক উল্টো—ধীর শান্ত কণ্ঠে শ্রীঠাকুর প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দিলেন—শুনে স্তম্ভিত হয়ে প্রফেসার বললেন, 'Where have you got it ?

শ্রীঠাকুর প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দিলেন, 'I have picked it up from some of the recent books in the library কিন্তু এর জন্য শ্রীঠাকুর কোন গর্ববোধ করলেন না। তিনি গীতার মূর্ত প্রতীক

'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।'

দিনের পর দিন ঠিক ওই একই কারণে অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদের দৈন্যতার জন্য লাইব্রেরীতে পড়তে গেলে বা বই নিতে গেলে লাইব্রেরীয়ান তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে অনেকক্ষণ তাঁকে বসিয়ে রাখতেন—সবশেষে বই দিতেন—ভাবতেন হয়তো গ্রামাঞ্চলের কোন গরীব ছাত্র। অবশ্য এ সবের জন্য শ্রীঠাকুর কোনদিন কোন ক্ষুণ্নতা প্রকাশ করতেন না অথচ সে সময়ে শ্রীঠাকুরের থাকত প্রচুর দৈহিক অসুবিধা। কলেজ ইউনিভারসিটির বাথরুম ইত্যাদি তিনি কোনদিন ব্যবহার করতেন না—কোন স্থানের জল পর্যন্ত খেতেন না। বাড়ী থেকে আসার সময় নিজ হাতে তৈরী সিদ্ধ পক্ক সামান্য কিছু খেয়ে নিতেন—কাজেই বিকেল কি সন্ধ্যার মুখে তিনি তখন যত ক্ষুধার্ত তত তৃষ্ণার্ত থাকতেন তবুও কিছু বলতেন না। যখন লাইব্রেরিয়ান বই দিতেন তখন পড়তেন। প্রায়ই এ রকমটা হয়—একদিন শ্রীঠাকুরের সহপাঠী ইউনিভারসিটীর সেরা ছাত্র হেমেন রায় চৌধুরীও গেছেন বই নিতে বা পড়তে—লাইব্রেরীয়ানের ওই আচরণ দেখে তাঁকে খুব তিরস্কার করলেন। বললেন, 'কা'কে আপনি এমন অবহেলা করে বসিয়ে রাখছেন—পুলিশ কমিশনারের ছেলে—ও ইচ্ছা করলে আপনার চাকরী বরখাস্ত করতে পারে—দিন লিগগির ওকে বই দিন।' শ্রীঠাকুরের পরিচয় পেয়ে লাইব্রেরিয়ান যন্ত্রাহতের মত বললেন, 'excuse me, বলবেন তো বলবেন তো,' সেই থেকে তিনি শ্রীঠাকুরকে খুব সমীহ করে চলতেন আর খুব তাড়াতাড়ি বই দিতেন। এমনই ছিল শ্রীঠাকুরের নিরহঙ্কারিতা বা মান-অপমানে সমজ্ঞান।

শ্রীঠাকুরের ওই মলিন খদ্দর ইত্যাদির জন্য কতদিন কলেজ ফেরৎ বাড়ী ঢুকতে গিয়ে থানার দারোয়ান পর্যন্ত বলেছে, 'নেহি যায়েগা' বাধা পেয়ে সুখ দুঃখে অবিচল শ্রীঠাকুর তখন পেছন দরজা দিয়েই বাড়ীতে ঢুকেছেন।

কলকাতার জনারণ্যে শ্রীঠাকুর জপমগ্ন হয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে খুব বিপদও ঘটতো। একদিন কলেজ ফেরৎ এক ক্লান্ত অবসন্ন বেলায় সাইকেলে চড়ে বাড়ী ফেরার পথে সাইকেলের গতির মাঝে একটী ছোট্ট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঠিক সাইকেলের চাকার তলায় পড়ে গেল আর তখন 'গেল' 'গেল' বলে চারিদিক থেকে লোক জমা হল, পুলিশও এসে পড়ল—তাঁকে বলল, 'চাপা দিয়েছ কেন ? থানায় যেতে হবে। শ্রীঠাকুরও নীরবে চললেন তাদের সঙ্গে।

কিন্তু এ থানায় হবে না, ও থানায় যাও···আবার সেখান থেকে আরেক থানাও যাও, এমনি করে করে অনেক পথ চলার পর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে তখন একটী থানায় এসে পিতার পরিচয় দিয়ে বললেন—পিতাকে খবর দিতে—খবর পেয়ে মহেন্দ্রনাথ তখন বললেন, 'শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো'। পিতৃ পরিচয় পেয়ে পুলিশদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে যায়—এ তারা কাকে ধরেছে ! কিন্তু উপায় নাই বড় সাহেবের আদেশ পালন করতেই হবে।

পিতা মহেন্দ্রনাথ সকলের এজাহার নিলেন ও যখন জানলেন পুত্র নির্দোষ তখন মেয়েটিকে কিছু খাইয়ে ও বাপকে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়ে ছেড়ে দিলেন। মহেন্দ্র নাথের বিচার দেখে বড় সাহেবদের একজন খুব খুশী হলেন।

শ্রীঠাকুর চিরদিন ট্রেণে থার্ড ক্লাশে যাতায়াত করা পছন্দ করতেন। অর্থশালী ভক্তেরা, আত্মীয়েরা কত মিনতি করতেন—'অন্ততপক্ষে সেকেন্ড ক্লাসেও চলুন'—শ্রীঠাকুর বলতেন, 'না আমি সাধু, ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করে কি হবে, দীননারায়ণদের মত থার্ড ক্লাসে যাওয়াই উচিৎ—এছাড়া বিলাসিতা করে কি হবে—সাধুর আবার মান অপমান।'

বাংলা ১৩৬০ সাল, জগজ্জননী সারদাদেবীর জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীঠাকুর মায়ের নামে বিরাট কৃষ্টিমূলক

মেলা সুরু করান। নাম দেন 'সারদা মেলা'। শ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে বৈদিক হোম, বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ, ভজন, আরতি, মায়ের নাম, এইসব দিব্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'সারদা মেলা' সুরু হত। সপ্তাহব্যাপী এই দিব্য মেলায় অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান, দীননারায়ণ সেবা, সাধুসেবা, দ্বাদশ ঘণ্টাব্যাপী হোম এসবের কথা সংবাদপত্র গুলিতে প্রকাশিত হত। যুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদা জননীর নামে ধর্ম মচানো, উৎসব, লোক কল্যাণকর কাজ এসব সংবাদের প্রচার শ্রীঠাকুর চাইতেন। একবার আমাকে শ্রীঠাকুর বললেন, 'সারদা মেলা ও শ্রীমার তিথি পূজা সম্বন্ধে আমাদের 'আশ্রম সংবাদ লিখে দিতে। আমি লিখে শ্রীঠাকুরকে দেখালুম। লিখেছিলুম ধর্মমূলক ও কৃষ্টিমূলক মেলা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব উদ্বোধন করলেন। এই লাইনটী দেখেই শ্রীঠাকুর আমাকে তিরস্কার করলেন। বললেন, 'শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের নাম প্রচারের জন্য মেলা হচ্ছে, খুব ধুমধাম করে উৎসব হচ্ছে এটা লোকের জানা উচিত। এজন্য আমি বিশেষ বিশেষ সংবাদ পত্র প্রকাশের জন্য আমাদের আশ্রম সংবাদ লিখতে বললাম, আমার নাম তোকে দিতে বলেছি ? কাট আমার নাম।' আমি বললুম, 'ঠাকুর আপনার শুভ ইচ্ছাতেই 'সারদা মেলা' সুরু—আপনিই মেলার সবকিছুর মূলে—আপনার উপস্থিতিতেই মেলার উদ্বোধন হয়েছে—তাই যা সত্যি আমি তাই লিখেছি।' শ্রীঠাকুর বললেন, 'নারে আমার নাম বাদ দিয়ে লেখ—সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে বৈদিক হোম ও বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রপাঠ ভজন আরতি ও মার নাম গানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীসারদা মেলা উদ্বোধিত হল। আর বাকী লেখা ঠিক আছে।'

আমি জানছি শ্রীঠাকুরের কথার বিরুদ্ধে এতটুকু এদিক ওদিক করা চলবে না। কাজেই শ্রীঠাকুরের নাম আশ্রম সংবাদ থেকে বাদ দিতেই হল। এমনই ছিল তাঁর নাম-যশ প্রচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়তা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধু সন্তেরা কোথায় কবে যাবেন, কি করবেন, কতদিন থাকবেন সব কথা খবরের কাগজে কাগজে আগে থাকতেই প্রকাশিত হয়ে থাকে ভক্তদের অবগতির জন্য। কিন্তু শ্রীঠাকুর তাঁর আশ্রমের নিজস্ব মুখপত্র ভাবমুখেতে পর্যন্ত তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ হ'তে দিতেন না, বলতেন,—'নাম-যশ এসব বন্ধন।'

ইউনিভার্সিটীর সেরা ডিগ্রী লাভের ইচ্ছাও শ্রীঠাকুরের ছিল না—বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার একান্ত অনুরোধে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। বহু ভক্তকে এমনকি অনেক ত্যাগী সন্তানকে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য থিসিস লেখার প্রেরণা দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, নিজের দাদার থিসিসের বিষয়টী রিভাইজ করে দিয়েছেন কিন্তু নিজে কোনদিন থিসিস্ লিখে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নি।

এম. এ পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে শ্রীঠাকুর কঠোর তপস্যা ও নিবিড় ধ্যানের গভীরে ডুব দিলেন। এই রকম ভাবে দীর্ঘ চোদ্দ পনেরো বছর কাটলো নির্জন সাধনায়। কিন্তু এরপর মধু পিয়াসী ভ্রমরের মত একে একে উপস্থিত হলেন বহু গৃহী ভক্ত ও ত্যাগব্রতে ইচ্ছুক সন্তান সন্ততিগণ। তখনও দেখেছি গভীর ধ্যানে কেটে গেছে দীর্ঘ ষোল ঘণ্টা আঠারো ঘণ্টা—এ ছাড়া কৃচ্ছ্র তপস্যা, নাম কীর্ত্তন, ভজন, পূজো আরতি আর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ভাগবৎ গীতা ইত্যাদি পাঠ এসবের মাধ্যমে কেটে যেত ক্ষণ। কোন কর্ম্ম চাঞ্চল্য, পত্র পত্রিকা এসব ছিল না। কিন্তু সে—মহারাজ একদিন অন্য অন্য আশ্রমে জ্ঞানের বহুল চর্চ্চা, পত্র পত্রিকা প্রকাশ, গ্রন্থ প্রণয়ন এসবের খুব প্রশংসা করলেন আর শ্রীঠাকুরের আশ্রমে অর্থাৎ নিজ গুরুদেবের আশ্রমে সেসব কিছু নাই কেবল জপ ধ্যান আর খোল খঞ্জনি পিটিয়ে নাম-গান—ইত্যাদি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কিন্তু নিন্দাও করা হল বৈকি এতে। একথা শুনে শ্রীঠাকুর কিছুমাত্র বিরক্ত হলেন না—ভাবলেন একথা তো শুধু সে—মহারাজের মুখের কথা নয়—একথা আরও বহু বিদ্বৎজনে বলতে পারে তাই শ্রীঠাকুর আশ্রমের সুনামের জন্য ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রচারের জন্য নিজেও লেখনী ধরলেন, নিজ ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদেরও লেখনী ধরালেন। 'ভাবমুখে' পত্রিকার জন্ম হল। আমরা সবলেই তাতে লিখতে সুরু করলুম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা লীলামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা, গীতা ভাষ্য বিশ্বের সাধুসন্তদের জীবনী, দেবতার লীলাবিলাস ইত্যাদি ইত্যাদি বহু জ্ঞানগর্ভ, সারকথা প্রকাশিত হতে সুরু হল। শ্রীঠাকুর নিজে তো সঙ্গীত নাটক রচনা করতেনই যদিও তার প্রচার ছিলনা এখন থেকে অর্চনাদি শরণাদি বিমলদা অরুণদা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেককেই প্রেরণা দিয়ে দিব্য সঙ্গীত, কবিতা, দিব্য নাটক-নাটিকা, গীতি আলেখ্য জীবনী এসব লেখাতে লাগলেন। ভিণ্ডার ঐশ্বর্য্য কিছুটা প্রকাশ করলেন। শ্রীঠাকুর প্রয়োজন হলে ভাবমুখে পত্রিকা চালাবার জন্য প্রায় প্রত্যেক মাসে একাধিক লেখা দিতে সুরু করলেন কিন্তু সেখানেও লোকমান্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ছদ্মনামে লেখা প্রকাশ করতে দিতেন।

World philosophy মুদ্রণের সময়ে নিজের নাম কিছুতেই দিতে দেবেন না—বললেন, Published by Sree Sree Ramakrishna Sevayatan এটি দাও। আমি তো নিজের নাম যশের জন্য বই লিখিনি—আশ্রমের সম্মানের জন্য লিখেছি—কেউ যাতে বলতে সুযোগ না পায় যে এ আশ্রমে শুধু হরিনামের মালা টপকানো—নাম সঙ্কীর্ত্তন আর খাওয়া দাওয়া হয়—জ্ঞানের দিক নাই—এসব কারণে মার ইচ্ছায় কলম ধরেছি। নাম নিয়ে কি হবে। প্রেসিডেন্ট মহারাজ (স্বামী বিবিদিষানন্দ) জোড়হাতে আকুল প্রার্থনা জানালেন—কাঁদতে লাগলেন, তপোক্লিষ্ট দেহে প্রচুর ধ্যান ধারণা করেও অত সুকঠিন দীর্ঘ পরিশ্রমের পর নাম দিতে দেবেন না সেকি হয়? প্রেসের তো একটা আইন আছে—নাম আপনাকে দিতেই হবে।' শ্রীঠাকুর এবারেও আপত্তি করলেন—তখন প্রেসিডেন্ট মহারাজ বললেন—তাহলে ঠাকুর আপনি যাঁর ইচ্ছায় কলম ধরেছেন তাঁর কাছেই নির্দ্দেশ নিন—নাম দেবেন কিনা? শ্রীঠাকুর স্নানান্তে নির্জ্জন মন্দিরে বসলেন ধ্যানে—মার নির্দ্দেশ পেলেন গ্রন্থখানিতে শ্রীঠাকুরের চরিতার নাম দিতে হবে—এক্ষেত্রেও শ্রীঠাকুর নিজেকে অপ্রকাশিত রাখতে চেয়েছিলেন।

শ্রীঠাকুর তীর্থশ্রেষ্ঠ দক্ষিণেশ্বর ধাম আর নিজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত আশ্রমগুলি ছাড়া কোথাও যেতেন না। বেলুড় মঠ গুরুধাম বলে অবশ্য যেতেন তাও অভেদানন্দ স্বামীর তিরোধানের পর সে যাওয়া খুবই কমে গিয়েছিল। সাধন জীবনের প্রথম দিকে বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে যেতেন—পরবর্ত্তীকালে সেও বন্ধ হয়ে যায়। কোন সভা সমিতিতে যাওয়া বা প্ল্যাটফর্ম্ম লেকচার দেওয়া কোন ভক্তের বাড়ী যাওয়া কোন তীর্থাদিতে বা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ ইত্যাদি কোন কিছুই শ্রীঠাকুরের ছিল না, লোক জানাজানি হওয়া এসব একবারেই চাইতেন না।

লোকমান্য লাভের পথ, প্রচারের পথ সমস্ত রকমে বন্ধ রাখতে চাইলেও লোকমান্যের জয়টীকা পরে যাঁর জন্ম যিনি বিশ্বের পূজার বস্তু তিনি নিজেকে যতই গুহারিত রাখার ব্যবস্থা করুন লোকমুখে, ভক্তমুখে দিক-দেশান্তরে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, কঠোর তপশ্চর্য্যা, অসামান্য রূপলাবণ্য, আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা, কবিত্বশক্তি, সর্ব্বজীবে দয়া, ক্ষমা, সহনশীলতা, নিরভিমানতা, ইত্যাদির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্ব্বিকল্প সমাধিবান পুরুষ জগদ্ধিতায় দেহখনটুকু রেখেছেন এসব কথা বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশের দার্শনিক, সঙ্গীতশিল্পী, চিন্তাশীল, চিত্রশিল্পীগণ এসে দর্শন করে, কৃপালাভ করে, শ্রীকণ্ঠের বাণী শুনে ধন্য হয়েছিলেন! এসব কারণে আধ্যাত্মিক রাজ্যে খুবই উচ্চ অধিকারিক পুরুষ জেনে গভর্ণমেণ্ট থেকে শ্রীঠাকুরকে সাধু সমাজের Eastern zone এর President করতে চেয়েছিল এ জন্য একটী written proposal এসেছিল, শ্রীঠাকুর তো লোকমান্য চাইতেন না এজন্য সেই proposal প্রত্যাখান করলেন।

ত্যাগী সন্তানদেরও উপদেশ দেবার সময় বলতেন, 'তোমরা সন্ন্যাসী লোকৈষণা, বিত্তৈষণা এসব বিরজা হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়ে ত্যাগ পথ নিয়েছ কাজেই সিদ্ধাই লোকমান্য, যশ এসব দিকে যেন দৃষ্টি না যায় তাহলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। কবি গ্রের কবিতার লাইন মাঝে মাঝে বলতেন

'The paths of glory
Lead but to the grave.'

কাজেই সব সাবধান।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ডিরেক্টর মিঃ নন্দী, মিঃ বরুয়া

জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ইত্যাদি বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিরা এক সময়ে শ্রীঠাকুরের কাছে খুব আসতেন। শ্রীঠাকুরের মধুর ব্যবহার, সুকণ্ঠ, মর্মস্পর্শী কবিত্বশক্তি, ত্যাগ-তপস্যা তাদের সকলকে গভীরভাবে অভিভূত করে। মিঃ নন্দী সাহেব একদা শ্রীঠাকুরকে একাধিক দিন অনুরোধ করেন, 'ঠাকুর আপনি অনুমতি দিন—আপনার শ্রীকণ্ঠের আশীষ বাণী একটু রেকর্ড করে নিয়ে যাই প্রতিদিন বেতার অনুষ্ঠান সুরু হবার আগে প্রচারিত হবে, এতে দেশের অনেক অমঙ্গল কেটে যাবে, জনগণের কল্যাণ হবে, নৈতিক উন্নতি হবে।' শ্রীঠাকুর প্রতিবারই মৃদু হেসে আপত্তি করেছেন, বলেছেন, 'মিঃ নন্দী তোমার এই শুভ উদ্দেশ্য দেশবাসী বুঝতে পারবে না; তোমার অনেক শত্রু সৃষ্টি হতে পারে, জনগণ সকলে কি তোমার মত শ্রদ্ধা করে? নিশ্চয় করে না। অশ্রদ্ধা করে আমার কণ্ঠ শুনলে তাদের অপরাধ হবে। অন্যান্য ভক্তগণ চাইবে তাদেরও নিজ নিজ গুরুর আশীর্বচন প্রচারিত হোক। এমনি ভাবে খুব বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হবে বা হতে পারে। আবার আমার দিক থেকেও আপত্তি আছে—লোকমান্য চাহিদা আমার জীবনের কাম্য নয়—সাধুর সব বন্ধন গেলেও অন্তরে সূক্ষ্মাকারেও লোকৈষণা থেকে যায়। আর ওটাই হচ্ছে শেষ বন্ধন। অশ্রদ্ধাভরে অসুরা পরবশ যেমন তেমন ভাবে, আমার কণ্ঠ শুনে তাদের অকল্যাণ হোক এও আমি চাইনা। হিমালয়ে চলে গিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে নিষ্কলে করে পরব এই আমার ইচ্ছা ছিল। মন্দির আশ্রম, গুরুগিরি এসব আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তবে ৺মায়ের ইচ্ছায় ওসব হলনা।

শ্রীঠাকুর এইভাবে সব সময় লোকমান্য লাভের সুযোগকে এড়িয়ে গেছেন।

'লোকমান্য চাইনে গো মা' এই বাণীটি নিয়ে চিন্তা করলে অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ে। রাত্রে আরতির পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ওই প্রার্থনা বাণী 'দেহসুখ চাইনে গো মা লোকমান্য চাইনে গো মা' ইত্যাদি সমবেত সাধু ও ভক্তগণ সুর করে প্রার্থনা জানাতেন। ভজন, নাম প্রণাম মন্ত্র এসবের পর প্রতিদিন ওই প্রার্থনা মন্ত্র শ্রীঠাকুরের নির্দেশে সকলকে করতে হত। জ্যাঠামশায় (শ্রীঠাকুরের দাদা) দিল্লী থেকে যখন এখানে এসে প্রতি বছর প্রায় একমাস করে কলকাতায় থাকতেন তখন শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। শ্রীঠাকুরের আশ্রমের প্রায় প্রতিটী অনুষ্ঠানেই তখন যোগ দিতেন। একদিন জ্যাঠামশায় শ্রীঠাকুরকে বললেন, 'ভাই তোমার আশ্রমের প্রায় সব নিয়মই আমি follow করবার চেষ্টা করি। কিন্তু ওই যে প্রার্থনাটী তুমি সকলকে করাও ওইটি আমি follow করতে পারি না। কেননা মনে একরকম আর মুখে এক রকম এ মিথ্যাচার আমি করতে পারি না। আমার লোকমান্য চাহিদা আছে সেইজন্যই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছি। দেশ-বিদেশের নানান পত্রিকায় আমার প্রচুর লেখা published হয়েছে। দেহসুখ চাহিদাও আমার পুরো মাত্রায় আছে—কেননা যতদিন বাঁচবো ওই আধি-ব্যাধি রোগ-জীর্ণ শরীর নিয়ে বাঁচতে রাজী নই। দেহ সুখ লোকমান্য এসবের জন্যই আমি এখনও service করে চলেছি কাজেই দেহসুখ চাইনে গো মা, লোকমান্য চাইনে গো মা ও আমি বলতে পারি না, তখন আমি চুপ করে থাকি।' শ্রীঠাকুর নিজ দাদার এই সত্য ও সরল উক্তিতে প্রসন্ন মধুর হেসে বললেন 'দাদা তা কেন বলছ? রোগজীর্ণ হয়ে বাঁচতে চাওনা এ ঠিক কথা কিন্তু দেহসুখ চাহিদা তোমার অনেক কম তোমার যে রকম অর্থোপার্জন, ক্ষমতা সে তুলনায় তুমি যথেষ্ট সংযমী তোমার আহার, বেশবাস যথেষ্ট সংযত, তুমি জপ ধ্যান, প্রাণায়াম, পাঠ, ব্রহ্মচর্য্য পালন সবই করে যাচ্ছ, তুমি কারো সেবা নাওনা। তবে বলেছ ঠিকই, যতক্ষণ চাহিদা আছে ততক্ষণ চাইনে গো মা বলার মিথ্যাচার কিছুটা হয় বৈকি কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, এই প্রার্থনা গৃহীদের জন্য নয়—এটী সর্ব্বত্যাগী সাধুদের প্রার্থনা। কিন্তু সাধুদের মধ্যেও দেহসুখ লোকমান্য এসব চাহিদা আছে বা থাকে কিন্তু ওই চাইনে বলা মানেই না চাওয়ার autosuggestion চাইনা চাইনা এই প্রার্থনা করতে করতে মনকে autosuggestion করতে করতে তাঁর কৃপায় একদিন সত্যিকারে শুকনো পাতার মত দেহসুখ, লোকমান্য চাহিদা ঝড়ে পড়ে যেতে পারে।' জ্যাঠামশায় তখন বললেন হ্যাঁ একথা খুবই ঠিক। এখানে আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

আমেরিকার Illionois University-র religion এর অধ্যাপক Mr. James white hurst, Origone University-র Mathematics এর chair-holder Dr. Smith, আমেরিকার Child psychology অধ্যাপক Dr. Rulph, Dr. Ray ইত্যাদি সকলে শ্রীঠাকুরের দর্শন পেয়ে সান্নিধ্য লাভ করে বিশেষ অভিভূত হয়ে শ্রীঠাকুরের ছবি তুলতে চেয়েছেন—নিজের দেশে সেই ছবি নিয়ে গিয়ে শ্রীঠাকুরকে স্মরণ করার জন্য। শ্রীঠাকুর বাধা দেন, বলেন, 'এখানকার কথা মনে রাখার জন্য এইসব সাহেবদের ছবি নাও আমার ছবি তুলে কি হবে—ও থাকুক।' ছবি তুলেও পাছে লোকমান্য চাহিদা এসে পড়ে। শ্রীঠাকুরের এসব আচরণ লোকশিক্ষার জন্য। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।

বাতিকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শত ষোল উৎসব উপলক্ষে শ্রীঠাকুর গিয়েছিলেন ১৯৬৪ ১২ই জানুয়ারী। উৎসবে সুধী-সম্মেলন উপলক্ষে আশালতাপুরী (সুলেখিকা আশালতা সিংহ) সুসাহিত্যিক শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও 'উষসী' পত্রিকার সম্পাদক, কল্লোল যুগের সাহিত্যিক বারাণসী থেকে আগত শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই জানুয়ারী মন্দিরের বারান্দায় শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে তারা ঘন হয়ে বসে নানা আলোচনায় রত। শ্রীঠাকুরের সঙ্গীত তাঁরা ভিক্ষা করছেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে শ্রীঠাকুর ও অর্চনাদি রচিত দিব্য সঙ্গীতগুলি প্রায়ই পরিবেশিত হয়। সেগুলি তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছেন। সুসাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র মশায় বললেন, 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক নিয়ে আজীবন আমার চর্চা। সেই সুদূর বেনারসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আপনার রচিত অপূর্ব সঙ্গীতগুলি শুনতাম তখন অতি বিস্মিত হয়ে ভাবতাম এগুলির মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তা কে? না জানি তিনি কেমন! সাক্ষাতে দেখছি আমার কল্পনার চেয়ে আপনি কত সুন্দর, কত মহান্! বাইরের নানা পত্র পত্রিকায় যাতে এই সুন্দরতম দিব্যতম সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হয়ে সর্বজন ভোগ্য হয়—এই আমার প্রার্থনা নিবেদন করছি। শ্রীঠাকুর অতি মৃদু মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বাইরে যে আমি গান দিই না। আমার গান গোপালকে মা ভবতারিণীকে শোনানোর জন্য, নিবেদনের জন্য। ওখানে যদি নাম যশের লোভ প্রবেশ করে তাহলে খুব ক্ষতি হবে। তখন হয়তো সর্বদা মনে হবে কবে আমার কোন গান কোন বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। কবে আবার রেডিও প্রোগ্রামে আমার গান বাজবে।"

আশালতামা বললেন, 'যেমন করে আমাদের গোপালের প্রসাদ দেন, তেমনি করেই আমরা গোপালের গানের প্রসাদ পাব। গানগুলি গোপালের পূজায় নিবেদিত হয়ে তাঁর পূজান্তে সর্বজনে বিতরিত হবে। গোপালের সঙ্গে একটি ভাবের সম্বন্ধ সর্বদা পাতাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা আর কোথা পাব।

শ্রীঠাকুর তখন তাঁর স্বরচিত গানের খাতা থেকে কতকগুলি বাংলা ও হিন্দী ভজন পড়ে শোনালেন ও অর্থ বলে দিলেন। বললেন, 'এই গান দিয়ে আমি পূজা করি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধ্যানান্তে আমি নতুন সঙ্গীত রচনা করে সুর সংযোগ করে গোপালকে মা ভবতারিণীকে শোনাই। যতক্ষণ না আমার দিনের শেষে নিবেদন—এই গানের অর্ঘ্যটি পূর্ণরূপে দিতে পারছি ততক্ষণ আমার তৃপ্তি নাই।

'আমাদের গান বা সঙ্গীত শুধুমাত্র দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য' এটা বোঝাবার জন্য শ্রীঠাকুর আশ্রমের অনেক ঘটনার কথা বললেন। তাঁরা রেডিওতে শ্রীঠাকুর রচিত পৌষপার্বণ গীতি আলেখ্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও জানালেন।

শ্রীঠাকুর বললেন, 'নিখিল সেন অনেকদিন থেকে রেডিওতে আমার লেখা গান ছাড়া পারতপক্ষে গায় না—আমার গান রেডিওতে ওই সিডিউল করেছে। আর কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মিঃ নন্দী, মিঃ বরুয়া, রথীন, অমল এখানের সঙ্গীত, ভজন, গীতি আলেখ্য বেতারে পরিবেশন করার জন্য খুব উৎসাহী—আমি বাধা দিলেও শোনে না। তবে মার যদি ইচ্ছা হয় একদিন সঙ্গীতের বহুল প্রচার হবে। তবে এখন অত ইচ্ছা নাই। স্বামিজী শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বলেছিলেন, 'কামনা কাঞ্চন ত্যাগী হয়েও শতকরা নিরানব্বই জন সাধু নাম যশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। পড়োছসনা

Milton এর সেই উক্তি Fame, that last Infirmity of noble mind.'

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বললেন তবু সাহিত্য বিদ্বজ্জনের। আপনার কাছে ঐ সঙ্গীতগুলি বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করবার প্রার্থনা জানাচ্ছি।

শ্রীঠাকুর বললেন, 'ভারতবর্ষের সম্পাদকের অনুরোধেও আমাকে দু'একটা কবিতা প্রকাশ করতে দিতে হয়েছে। আপনার কথাটাও ভেবে দেখছি কিছু অন্ততঃ প্রকাশ করতে দিতে হবে—আপনার শুভ ইচ্ছা পূরণের জন্য—আর ইচ্ছা মনে করে। কিন্তু ওই যে বললাম সাধু সব কথা গেলেও সব শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায় লোকৈষণা। খুব বড় সাধুও উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিমান প্রতিভাসম্পন্ন ইত্যাদি প্রচার নিজের সম্বন্ধে হোক এ চাহিদা মনে মনে পোষণ করে। এবং চাহিদাও ঈশ্বরকে নিবিড় করে পাওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

—:০:—

সচ্চিদানন্দ

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনায় উপনিষদের ঋষি দ্রষ্টারা বলেন, তিনি সৎ, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ। 'সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬।২।১)। এই সদ্ বস্তু হতেই সকল সৃষ্টি। এই সৎ স্বরূপ যিনি ছিলেন, আছেন ও কালও থাকবেন, তাঁরই পরিচয় অন্য সব উপনিষদেও—'অস্তীতি, স এবদ্যস উ সদ্ভাঃ (কঠ, ২।৩।১৩,২।১।১৩) এতদ্বৈতৎ—ইনিই সেই আত্মা। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' (বৃহদারণ্যক), 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ (ঐতরেয়)।

এই সৎস্বরূপ যিনি সৃষ্টির মূলে তিনি চিৎস্বরূপ বা চেতনাযুক্ত। তাঁর ঈক্ষণেই সৃষ্টি। 'স ঐক্ষত' (ঐতরেয়) ব্রহ্মের চিৎস্বরূপতা বা জ্ঞানস্বরূপত্ব তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (২।১।১) বাক্যে নির্দেশিত। তিনিই 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্'। কঠোপনিষদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ একই ভাষায় এই চৈতন্যস্বরূপের পরিচয় দেন। ব্রহ্মসূত্রেও পরমাত্মার ও জীবাত্মার এই জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতি বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে।

এই ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্বও ঋষিরা জেনেছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি দেখলেন ও বলেন, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ'—বিজ্ঞানময়ের ভিতর আনন্দময় আত্মা। বৃহদারণ্যক বলছেন (৩।৯।২৮।৭) 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'। উপনিষদগুলিতে বারে বারে এই আনন্দ স্বরূপের দর্শন। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডক) আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান, আনন্দ আত্মা, ততো বৈ সদজায়ত। রসো বৈ সঃ, আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' (তৈত্তিরীয়) আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে ঋষিরা জানলেন।

সৎ চিৎ আনন্দ ভিন্নভাবে ব্রহ্মের বা আত্মার গুণবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, বহু প্রচলিত উপনিষদগুলিতে একসঙ্গে সচ্চিদানন্দ বলে কোথাও ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে বর্ণিত হতে দেখা যায় না। তবে দেখা যায় যে, এই বিশেষণ বহু শত বৎসর ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ও 'রসো বৈ সঃ' এই সব বচনের মধ্যে সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও এবং পরবর্তীকালে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ও ভক্তিবাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিশেষণের প্রয়োগ দেখে থাকলেও, ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ দর্শন নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেন, "সচ্চিদানন্দ নামকরণ যেমন তাঁর নিজের মৌলিকত্বের পরিচয় দেয়, তেমন তাঁর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় দেয়। সচ্চিদানন্দ শব্দটি প্রাচীন উপনিষদে পাওয়া যায় না।" (শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৮১ পৃঃ ১২)

সচ্চিদানন্দ নামকরণে শ্রীঅরবিন্দের মৌলিকত্ব বলা ঠিক মনে হয় না কারণ তাঁর বহুপূর্ব হতেই ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে সচ্চিদানন্দ নামটি সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত।

কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত ৩২ খানি উপনিষদের মধ্যে কঠ, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতির সঙ্গে পঞ্চব্রহ্ম উপনিষদ ব্রহ্মের অদ্বৈত স্বরূপ, আকাশময় বিগ্রহ প্রভৃতি আলোচনা করে দূর আকাশে যে 'সঃ শিবঃ সচ্চিদানন্দে'র পরিচয় দিয়েছেন তা ব্রহ্মেরই বর্ণনা। গোপালপূর্বতাপনীয়োপনিষদে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ।

"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়া ক্লিষ্টকারিণে
নমো বেদান্ত বেদায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥"

শঙ্করাচার্য তাঁর বেদান্তসারে, তত্ত্ববোধ ও ব্রহ্মানুচিন্তন প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার কথা বলেছেন।

"অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান ॥"

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোত্তর খন্ডে শিবকবচে শিবের যে বর্ণনা "নিত্যশুদ্ধ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবয়ায়" তা ব্রহ্মেরই বর্ণনা। শিব এখানে ব্রহ্মেরই স্বরূপ। দেবীভাগবতে (৫।৮) মহামায়াকে সচ্চিদানন্দরূপিণী বলে বর্ণনা। প্রাণতোষিণী তন্ত্রেও নিঃশব্দ, নির্বিশেষ জ্ঞানের অবস্থাকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলা হয়। 'শূন্যাত্ সচ্চিদানন্দং নিঃশব্দং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।'

চৈতন্যচরিতামৃতে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের কথা। এখানে (আদি ২, মধ্য ২০) ব্রহ্মসংহিতার একটি শ্লোক বহুবারই উদ্ধৃত হয়েছে। 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণসচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সচ্চিদানন্দের কথাই বার বার বলেন। "বেদে ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে ও সচ্চিদানন্দ শিবঃ। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ।" (কথামৃত ৪।১৫) ভাবে বিভোর হয়ে বলছেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না।' (৪।১৩।৩) যিনিই অখন্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই কালী (৪।১২।২)। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর ধর্মতত্ত্বে বলেন যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্যক অনুশীলনে সচ্চিদানন্দ জগৎ ও জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হতে পারে। সচ্চিদানন্দ নামে, ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তায়, পরম শক্তিমান বা ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি বহুকাল ধরেই চিন্তিত ও বর্ণিত হয়ে এসেছেন।

—:—

বেদান্ত পূর্ব্বদিগন্তে

স্বামী নীলানন্দ

॥ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ॥

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত ॥' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ / শান্ডিল্য বিদ্যা)।[১]

অন্বয়ঃ এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; কারণ তাহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয়, ও তাঁহাতে জীবিত থাকে। অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে—(অর্থাৎ) মানুষ যেহেতু ভাবরূপী, সে জীবিতাবস্থায় যেরূপ নিশ্চয়শীল হয়, দেহত্যাগের পর সেইরূপই হইয়া থাকে, (অতএব) যে (এই তত্ত্ব জানিয়া) দৃঢ় প্রত্যয় অবলম্বন করিবে (অর্থাৎ তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া রূপ উপাসনা করিবে)।[২]

ব্যাখ্যা : সমস্ত বিশ্ব-চরাচর ব্রহ্মস্বরূপ। আমাদের এই জ্ঞান রাখিতে হইবে যে এই 'জগৎ ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট' এবং প্রলয়কালে ব্রহ্মেই লীন হয়। পুনরায় সৃষ্টিকালে ইহা 'ব্রহ্ম' হইতেই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং জগতে স্থিত যাবতীয় চেতন ও অচেতন জীব ও বস্তু ব্রহ্মেই অবস্থান করে। অতএব রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়া তাঁহার (সগুণ / নির্গুণ) উপাসনা করিবে। তিনি 'জগৎ জগৎ প্রতি রূপ বভূব'—সেইজন্য তিনি সগুণ। আবার তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'—সেজন্য তিনি নির্গুণ বা অরূপ। মানুষ ইহজন্মে যেরূপ চিন্তা করে দেহত্যাগের পর এমনকি পরজন্মে সেইরূপ চিন্তা এবং দেহলাভ করে। যেমন রাজা ভরত মৃত্যুকালে হরিণের চিন্তা করায় পরজন্মে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য মৃত্যুকালে শুদ্ধস্বভাবরূপী একমাত্র নামরূপী ব্রহ্মেরই চিন্তা করিতে হয়।

উপনিষদে 'শান্ত উপাসীত' শব্দদ্বয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে—এই কারণে যে মানুষ স্বভাবতঃ অশান্ত। সে নিজের ক্ষুধা, অর্থ, ধনসম্পদ, মান-যশ ইত্যাদি লাভ এবং তাহা ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য অহরহ অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদ এবং যুদ্ধ করে। শ্রীযুক্ত মিনু মাসানী তাঁহার 'Our growing Human Family' গ্রন্থে মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) দুটি রূপ দেখাইয়াছেন। এক 'struggle for existence' ; দুই 'survival of the fittest' ঐ দুই কথার অর্থ হইল (১) অস্তিত্ব অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকার জন্য সংগ্রাম (২) যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু ইহা হইল ক্ষত্রিয়ের কথা। রাজনীতির কথা। পূর্বে যেমন যুদ্ধ হইত ; এই কালেও তেমনই ভোটযুদ্ধ হইতেছে। এই ভোটযুদ্ধে একদলের জয়, আর অন্যদলের পরাজয় ঘটিতেছে। ইহাতে বিশ্বে কি প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতেছে? মিলিটারী বা পুলিশের ভয়ে কিংবা পরমাণু বোমার ভয়ে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপিত হইতেছে বটে ; কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রশ্ন : তাহা হইলে মানুষ প্রকৃত শান্তি পাইবে কি করিয়া? উত্তর : ভারতীয় বৈদান্তিক জ্ঞান এবং বৈদিক যজ্ঞাদি আচার অনুষ্ঠানাদি প্রবৃত্তিই তাহাকে প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিতে পারে!' যেমন 'ঋগ্বেদে'র প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে ঋষি বলিতেছেন : 'গায়ত্রীছন্দে'—

"অগ্নিম ঈড়ে পুরোহিতং / যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্। / হোতারং রত্নধাতমম্" ॥*

অন্বয় : 'অগ্নিকে বন্দনা করি, (তিনি) পুরোহিত / (তিনি) যজ্ঞের ঋত্বিক, (তিনি) হবনকারী, (তিনি) শ্রেষ্ঠ রত্ন (ধন) দাতা ॥' ৪

বেদান্ত দর্শনের যে বিচার, 'ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে আবার সদসৎ নহে, ইহা অনির্বচনীয়া মায়া'—ইহা সংশয়াত্মক। কারণ বিষয় সম্পর্কে কাহারও পূর্বজ্ঞান নাই। যেমন, আমি একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া বলিতেছি : উহা সংশয়াত্মক এই কারণে যে, যদিও মরীচিকা ভ্রম উৎপাদন করে, কিন্তু কোথাও কোথাও মরুদ্যানে জল পাওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে অন্ধের হস্তি দর্শনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। চার অন্ধ ব্যক্তি হস্তী দেখিতে গিয়া প্রত্যেকেই এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিজ নিজ অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল হাতি কুলার মত, থামের মত, দড়ির মত, জলের জালার মত ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে জাগতিক বিষয় সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ঐ চার অন্ধ ব্যক্তির ন্যায়। জৈন দর্শনে ইহাকে স্যাদ্‌বাদ বলা হয়।

অতএব শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত মতে জগৎ সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা বা অধ্যাস ইহা বলা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দাক্ষিণাত্যের ধর্মগুরু শ্রীমৎ রামানুজ আচার্যের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদকে সমর্থন করিতেন। ঐ মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগৎকে সত্য বলা হইয়াছে। তিনি উপমা দিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন—বেলের শাঁস খাইতে হইলে তাহার খোলা ও বীচি বাদ দিতে হয়, কিন্তু ওজন করিতে হইলে তাহার কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না।

তবে শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর পক্ষে বেদান্ত দর্শনে ব্যবহৃত উপমাগুলি যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ। যথা : 'উহা জল নহে' উহা তিক্ত গুড়, উহা 'ধূমায়মান পর্বত' উহা মরীচিকা, উহা দর্পণস্থিত প্রতিবিম্ব ইত্যাদি। বেদান্ত দর্শনে এইরূপ শিক্ষা

দেওয়ার কারণ হইল বাহ্যবস্তু দেখিয়া শিক্ষার্থী ছাত্রের মনে বিষয় সম্পর্কে ভ্রমাত্মক মিথ্যাজ্ঞান বা অধ্যাস জন্মাইতে পারে। সেইজন্য সদ্ অর্থাৎ বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা তাহার পূর্বজ্ঞান হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা বলিবার আছে যে, এইরূপ নেতি নেতি অর্থাৎ নয় নয় বাক্যের ফলে শিক্ষার্থীর মনে জগৎ সম্পর্কে একটা বীতস্পৃহা বা বৈরাগ্য জন্মাইতে পারে, যাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

কিন্তু তাহাকে যদি এইরূপ বলা হয় যে ; হে পথচারী তুমি পশ্চিমে' বৃথাই জলের অনুসন্ধান করিতেছ, উহা লবণাক্ত সমুদ্র, উহা পান করিবার যোগ্য নহে ; কিংবা তুমি কূপ খনন কর তাহা হইলে নিশ্চয় জল পাইবে ; অথবা তুমি যখন বিদেশে কিংবা অপর কাহারও গৃহে যাইবে তখন গৃহস্বত্বের নিকট জল চাহিয়া পান করিবে তাহা হইলে শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে এবং জগতে সে বড় বড় কাজ করিবার প্রেরণা পাইবে।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাক্যের সমর্থন পাই বেদান্তদর্শনে। প্রশ্ন যে আত্মাও কেন অনির্বচনীয় হইবে না ? উঃ "আত্মা যে চৈতন্যস্বরূপ এবং একমাত্র পরমার্থ সৎ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদির অনুকূলে যে সকল যুক্তি তাহা দ্বারা আত্মার স্বভাব যে নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধি, নিত্যমুক্ত, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই চৈতন্যময় আত্মা যে অনির্বচনীয় হইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। অবাধিত স্বয়ং প্রকাশরূপ—তাহাই হইল আত্মার সত্তা ! সেই সত্তা আত্মার স্বরূপ ভিন্ন অপর কিছু নহে।' এই চৈতন্যময় আত্মাই হইলেন 'ব্রহ্ম' এবং চৈতন্যময়ী নারী হইলেন তাঁহার শক্তি। অবশ্য কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞানে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না।

তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। যেমন উষাকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা হইতে উত্থান, সূর্য প্রণাম, প্রাতঃ স্নান, নিত্য হোমানুষ্ঠান, পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং সন্ধ্যারতি ইত্যাদি। তপস্যা না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করা যায় না। তপস্যার মধ্যে সাত্ত্বিক আহার একান্ত প্রয়োজন। লোভে পড়িয়া কোন কিছুই খাওয়া উচিত নয়। যাহা কিছু হজমের পক্ষে বিঘ্নকারক, স্নায়ু-কলাদির পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা মোটেই খাওয়া বা পান (যথা মাদক দ্রব্য, ধূমপান) ইত্যাদি মোটেই করা উচিত নয়।

'যজ্ঞ' বা 'হোমের' অগ্নিই আমাদের চিত্তের সর্ব প্রকার শুদ্ধির সহায়ক। ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র দ্বারা আমাদের মনের বাসনাগুলি অর্পণ করিয়া আমাদের মনকে নির্বাসনাযুক্ত ও শুদ্ধ স্বরূপ করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের আত্মা যখন চৈতন্যময় হইবে তখনই আমরা প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ হইব।

উপসংহার : পাশ্চাত্য মনীষী রুডিয়ার্ড কিপ্লিঙ যে উক্তি করিয়াছেন, 'Oh, East is East and West is West, and never the twin shall meet'[৮]—তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : 'উপনিষদ' 'বেদান্তদর্শন' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এই তিনী ধর্মশাস্ত্রকে প্রস্থানত্রয়ী বলা হয়। সমন্বয় সাধনই গীতার মূলকথা। Clive Johnson যথার্থই বলিয়াছেন : "The Gita insists that if a man is to develop a balanced spiritual life he must harmonize in his spiritual practice all of the yoges or paths of God".[৯]

'The song of God' প্রবন্ধে Clive Johnson swami prabhavananda'র যে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও প্রণিধান যোগ্য : Man is a complex of faculties—reason, will emotion and the impulse of action and he must seek union with God through all of Them. He must be active as well as meditative he must cultivate love for the divine beings—such in short, is the yoge ideal as taught in the Gita.[১০]

উক্ত প্রবন্ধে Clive Johnson ঈশ্বরের সহিত যোগসাধনের উপায় স্বরূপে যে 'harmonize' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইল সমন্বয় হওয়া বা করান।

আবার swami prabhavananda যে মানুষকে ঈশ্বরলাভের পথে একই সঙ্গে active অর্থাৎ কর্মশীল এবং meditative অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ হইতে বলিয়াছেন উহাই গীতামতে সমন্বয় সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

আমাদের মতে ভগবান গীতার নবম অধ্যায়ের ২৭···'যৎ করোষি···কুরুষ মদর্পণম্'—শ্লোকে যে সব কিছুই তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ভোগ করিতে বলিয়াছেন তাহাই ভক্ত তথা সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ পন্থা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানখানি উপরোক্ত ভাবের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ :

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি তখন তারি ধুলোয় ধুলোয় জাগে পরমবাণী।"[১১]

কিঃ দ্রঃ—যজ্ঞাদি নিত্যকর্ম গৃহস্থ বা আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীর অবশ্য করণীয়। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর কোন নিত্যকর্ম নাই। সন্ন্যাসী>সমাকন্যাসী>সমাকজ্ঞানী>পূর্ণজ্ঞানী।

টীকা :—'ঋত্ব ধাতমম্'—(১) প্রভূতরত্নধারী—ঋগ্বেদ সংহিতা (হরফ প্রকাশনী) (২) রত্নদাতা—ডঃ সুকুমার সেন (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস) (৩) যজ্ঞের ফলদাতা—সায়ন (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) 'বেদ'—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ; বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা—পৃঃ ১৩।

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (২য় ভা/১৩৫০), পৃঃ ১১৮
২। প্রাগুক্ত ঐ পৃঃ ১১১
৩। Samsad English—Bengali Dictionary (1950) পৃঃ 1140
৪। ডঃ সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৮) পৃঃ ১
৫। মৃগতৃষ্ণা—(Mirage)
৬। টীকা : পশ্চিম = বামদিক, পূর্ব = ডানদিক } দ্রঃ 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'—স্বামী গম্ভীরানন্দ—পৃঃ ১০১
৭। মহামহোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, 'বেদাঙ্গদর্পনম্' (প্রথম ভাগ) পৃঃ ১০৫-১০৬
৮। Robin Hyman, 'A Dictionary of Famous Quotations, (1973) (The Ballad of East and west) P—189
৯। Clive Johnson—'The song of God, (Vedanta and the west / California / U.S.A. May—June 1970 (No No 203) Journal , পৃঃ 59
১০। I bid P-59
১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতবিতান' (অখণ্ড / ১৩৭৪) পূজা (২৬ নং), পৃঃ ১৫-১৬।

—:০:—

"তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, ফল-ফুল সৃষ্টি করছেন, মানুষ তাঁকে পূজা করবে বলে। তিনি পূজা চান"।

—স্বামী সত্যানন্দদেব

শারদ প্রাতে

যোগদাপুরী

সোনার হাটে ফুল ফোটে যে
ধূলোর ধরণীতে
তোমার পূজার গাই গান
মোরা আলোর সঙ্গীতে
ভুবনে ভবনে হেসেছে ঐ
তোমারি রূপ রাশি
দোপাটি শিউলীর শারদ প্রাতে
তোমারি মৃণাল হাসি
শ্যাম ছায়ায় সিঞ্চিত হোক
ফুলেফুল মেলাগুলি
অপরূপ রূপের সাগর বুকের
জাগুক মোদের মিতালি ॥

আলোর তীরে বাজে বাঁশী
পূজার ঘরে ঘরে
মা এসেছে সারদা মা
জগৎ আলো ক'রে
কেউ বা আনে স্বর্ণ অর্ঘ্য
মায়ের পূজার তরে
কেউ বা বাজায় বেণু বীণা
চির চেনা সুরে সুরে
সবার মাকে ভরিয়ে দিও
তোমার আশিষ খানি
বারে বারে আসবে তুমি
এই তো মোরা জানি।

—:০:—

পূজা-মন্ত্র

শরণাপুরী (রামকৃষ্ণ তীর্থ)

শ্রীঠাকুরের বাণী—দুনৌকা করলে চলবে না। দুটী রাখলে চলবে না। হয় গুরু নিষ্ঠা—নয় শাস্ত্র নিষ্ঠা রাখতে হবে। এটী শুনে আমরা গোড়ার দিকে বহুদিনের পূজিত দেবদেবীদের পূজো ও বার-ব্রত সবাই ছেড়ে দিলাম এইভাবে কিছুকাল যাওয়ার পর একবার একটি ঘটনা ঘটল—। কালিকাপুর থেকে শ্রীঠাকুরের একটি ভক্ত কন্যা জানালো —ঠাকুর যতবারই তুলে ফেলে দিচ্ছি - ততবারই আবার এসে কুয়োর মধ্যে পড়ছে একটি বিষধর সাপ। বারবার এই কাণ্ড দেখে গ্রামের সকলে বলছে তুমি 'মা মনসা'র পূজো বন্ধ করে দিয়েছ এটি ঠিক হয়নি। পূজো দিয়ে পাঠাও—এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই করব। শ্রীঠাকুর লিখলেন পূজো বন্ধ করো না পূজো পাঠাও। শ্রীঠাকুরের চিঠি পাওয়ার পর যেদিনই ফল মিষ্টি খাগরা ইত্যাদি বেশ ভাল করে পূজো পাঠানো হলো সেদিনই থেকে সাপটিকে আর কুয়োর মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না—আশ্চর্য্য ব্যাপার।

একবার শ্রীঠাকুরের কাছে একজন বৃদ্ধ তান্ত্রিক দীক্ষা নেয়। নাম শশী পণ্ডিত। শ্রীঠাকুর একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আচ্ছা শুনেছি আপনি যখন ছেলেদের ক্লাস নিতেন তখন নাকি তারা বেশী দুষ্টামি করলে ছেলেদের দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে এই নে চিটিং যা বলে ছেলেদের দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দাড় করিয়ে দিতেন আর সত্যি ছেলেরা সেইভাবেই দেয়ালের সঙ্গে আটকিয়ে যেত। ঐ যে মাণিক আপনার কাছে পড়েছে ঐ বলেছে। সেই বৃদ্ধটি তখন মাণিকজ্যাঠার দিকে একবার স্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব উচ্চহাস্য করে ওঠেন। তারপর ঠাকুর বলেন আচ্ছা তা আপনি

অতীন্দ্রিয় কিছু দেখেছেন কি ? তিনি বল্লেন হাঁ ঠাকুর—একবার বাড়ী ফিরছি, রাত্রি তখন প্রায় বারটা সাড়ে বারটা হবে। জোছনা রাত্রি সারা মাঠ আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে। আমি চলেছি আলের উপর দিয়ে···হঠাৎ দেখছি দূরে একটি নারীমূর্ত্তি কি যেন করছে—চলতে চলতে আমি যখন আরো খানিকটা কাছে গেছি তখন তাকে আমি মন্ত্রদ্বারা গতিবদ্ধ করলাম। তিনি আর এগুতে পারলেন না। তারপর একেবারে তার কাছে গিয়ে বললাম মা আপনি কি করছিলেন—তিনি বল্লেন আমি মড়কের বীজ ছড়াচ্ছিলাম এবার এখানে মহামারী লাগবে। যাইহোক তাকে আবার মন্ত্রদ্বারা বশে করেছিলাম। তারপর ঠাকুর কি আশ্চর্য্য পরদিন থেকেই চারিদিকে কলেরা আরম্ভ হয়ে গেল।

এই ঘটনার অনেক বছর পর—তখন আমরা শশী পণ্ডিতের ঘটনা একদম ভুলেই গেছি। এমন সময় ঘটল আরেকটি অনুরূপ ঘটনা—

শ্রীঠাকুর মন্দির মধ্যে শয়ন করতেন আর আমরা কজন মন্দিরের সামনের ঘরটায় শুতাম। শ্রীঠাকুর প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে গঙ্গাধারের বারান্দায় ধ্যান করতেন আর সাধুরাও শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ধ্যান জপ করতেন। এই সময় শ্রীঠাকুরের ধ্যান করবার সেই ছোট্ট মশারীটি ফেলে দেওয়া, জল-আসন দেওয়া কাজটি আমি করে যেতাম।

একদিন হয়েছিল কি—এই জল আসন ইত্যাদি দেবার জন্য যখন ঠাকুরের ঘরে গেলাম তখন তিনি বল্লেন হাঁরে শরণা তুই কি মাঝ রাতে আমার এই ঘরে এসেছিলি ? আমি বল্লাম না ঠাকুর আমি এই আসছি—রাত্রে তো আসিনি। শ্রীঠাকুর আবার বল্লেন সত্যি বলছিস, তো আমি যে দেখলাম তোর মত কে একজন মাটি থেকে কি যেন কুড়োচ্ছে। তা তুই নস্—আমি বল্লাম না ঠাকুর আমি তো আসিনি। তারপর ধ্যানান্তে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন কেউ কি তোরা কোন কারণে আমার ঘরে এসে কিছু খুঁজছিলি। সকলে বল্ল—না ঠাকুর। শুনে ঠাকুর বল্লেন আমি অবশ্য শরণাকেই মনে করেছিলাম। চাঁদের আলোয় আমি স্পষ্টই দেখলাম। তোর মত কে একজন মেঝে থেকে কি কুড়োচ্ছে। তারপর অন্নপূর্ণা মা বল্লেন ঠাকুর আপনি ভাগ্যিস কুড়োনো দেখেছেন নইলে যদি ছড়ানো দেখতেন তবে মায়ের দয়া আরম্ভ হয়ে যেত। অন্নপূর্ণা মা'র কথা শুনে শ্রীঠাকুর খুবই আশ্বস্ত হলেন। যাইহোক তাহ'লে কোন ক্ষয়ক্ষতি হবে না ভেবে। শ্রীঠাকুর বলতেন, মনসা শীতলা এদের সত্যিকারের রূপে শক্তি আছে।

শ্রীঠাকুরের সেবার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না দেখে ঠাকুরের জন্ম-পত্রিকাটি নিয়ে অভয়াচরণ জ্যোতি-র্বিনোদ ভট্টাচার্য্য নামে একজন জ্যোতিষীর কাছে পাঠানো হলো। তিনি বল্লেন সময়টা খুবই খারাপ। শুক্র রাহো বৃহস্পতি কেতু মঙ্গল ও শনি গ্রহ কুপিত হয়েছে এদের তুষ্টির জন্য জপ করতে হবে ও রাহো ও ছিন্নমস্তার হোম করতে হবে। তার কথামত গ্রহগণের জপ সন্ন্যাসিনীমেয়েরা ও মায়েরা সংখ্যা ধরে ভাগ করে নিলো ! এমনকি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য আশ্রমের যে সব মায়েরা থাকতেন যেমন পুষ্পমা বেলামা মালতি মাকে জপ করার জন্য চিঠি দেওয়া হলো। আর হোমটিও দুজনে ভাগ করে নিল অর্চ্চনা বল্ল আরতি ব্রাহ্মণের মেয়ে ও ছিন্নমস্তার হোম করুক আর আমি রাহোর হোমটি করবো। শ্রীঠাকুর বল্লেন তাই হোক—

অর্চ্চনা রোজ বিকেলে ও আরতি ভোরে হোম করতে লাগল। এইভাবে কয়েকদিন হোম ও জপ হতে লাগল। আর শনির জপ করতেন অভয়াচরণ নিজে।

সেদিন ছিল একাদশী। প্রতি একাদশী রাত্রে তো সারারাত হোম হত, তাই আরতি ঠিক করলো আজ রাত্রে রামকৃষ্ণ হোম না করে ছিন্নমস্তার হোম করবো। আরতি যথা সময়ে হোম আরম্ভ করল আর বুবী, গীতা, আরাধনা, সুমনাদি, বুড়ি অন্নপূর্ণা মা, সতিমা, শোভা, অর্পিতামা, হরিদি, যোগমায়া ইত্যাদি একটু দূরে দূরে বসল। গভীর রাত। অনেকে মৌন। নিবিষ্ট মনে হোম ও জপদ্বারা প্রার্থনা চলতে লাগলো—এইভাবে প্রায় দেড়ঘন্টা কি দু'ঘন্টা অতীত

হবার পর হঠাৎ আরতি চোখ খুলে দেখে হোমকুণ্ডের দু'হাতের মধ্যে চারদিকে বড় বড় রক্তের ফোঁটা। কেন নিরীক্ষণ করে দেখার পর ইসারায় সবাইকে দেখালো। সকলে প্রথমে অবাক হলো, তারপর কারো কোথাও কেটেছে কিনা দেখল খোঁজ নিল কিন্তু সেরকম কিছু না দেখে তারা কিছুটা ভয়ই পেল। আরতি এটা দিব্য জিনিষ মনে করে ফুলে করে রক্তের ফোঁটা মুছে মাথায় ঠেকিয়ে মালার কৌটাতে রেখে দিল রাতটা বিধা দন্দের মধ্যে কাটলো, ভোরে শ্রীঠাকুর আসার পর হোমে আহুতি দেওয়া হলো। তারপর শ্রীঠাকুরকে সব জানানো হলো, তিনি আরতিকে বল্লেন, তোমাদের হোমে প্রসন্না হয়ে মা ছিন্নমস্তাই এসেছিলেন ও তার চিহ্ন রেখে গেছেন। আমাদের সকলের আনন্দের সীমা রইলো না সত্যি এরপর থেকে শ্রীঠাকুরের শরীর খুব শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়ে গেল। শ্রীঠাকুর বলতেন বহুদিন ধরে পূজা পেয়ে পেয়ে সব দেবদেবীর একটি অভিমানিনী সত্তা সৃষ্টি হয়েছে। আত্মকল্যাণের জন্য গুরু ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠার দরকার কিন্তু জগতের কল্যাণ, দেশের, দশের ও নিজের সংসারের কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজা করলে শীঘ্রই ফল পাওয়া যাবে। জগতে কিছুই মিথ্যা নয় এমন ঘটনা ঘটেছে ঘটছে বা ঘটে। দেবদেবী ও মন্ত্রশক্তি সবই সত্যি।

—:০:—

কণিকা গুচ্ছ

ফণিভূষণ বিশ্বাস

(১)

স্পর্শ মণির স্পর্শে যাহার অন্তরে সোনা আছে,
মণি-কাঞ্চনে লাভালাভসব তুচ্ছ তাহার কাছে।
পেয়েছে যে জন অন্তরে তার এ সোনার সন্ধান,
বিরাজে তাহার ভক্তির মাঝে জাগ্রত ভগবান।

(২)

অবিশ্বাসে অনেক গেলেও
থাকে মনস্তাপ,
বিশ্বাসেতে যেটুকু পাই
সেই তো পরমলাভ।

(৩)

দুঃখের দিনে নয়ন জলে
ধৌত করি' হৃদয়খানি ভাইরে,
স্মৃতির তপে প্রাণের জপে
আনন্দকে ইষ্ট রূপেই পাইরে।

(৪)

'আমি কর্তা' এইভাবে যেবা কর্ম্ম করে,
অহং-এর দুর্গে সেই মাথা কুটে মরে।
কিন্তু যার কর্মে সদা নিষ্কাম ভাব,
সে করে আপন মাঝে ভগবানে লাভ।

(৫)

"কে তুমি?" আত্মারে ডাকি'
আমি শুধালাম।
সে কহিল, 'সেই এক বহু হয়ে
আমি আসিলাম'।

—:০:—

যোগমায়া

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভি জানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্" ॥
(গীতা—৭।২৫)

আমি সকল লোকের নিকট নিজরূপে প্রকট হই না। কিন্তু কোন কোন ভক্তের নিকট নিজ রূপে আত্মপ্রকাশ করি (মধুসূদন)। যোগমায়া—যোগ অর্থাৎ আমার সঙ্কল্প, সেই যোগের বশবর্তিনী যে মায়া তাহাই যোগমায়া। অভক্ত লোক যাহাতে আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে না পারে আমার সঙ্কল্প অনুসারিণী মায়ার প্রভাবে আমার স্বরূপ আবৃত থাকে। যোগমায়া দ্বারা আমি আবৃত থাকি তাহার অর্থ এই নহে যে আমি কাহাকেও দেখিতে পাই না (মধুসূদন)।

যোগমায়া নামক শ্রীকৃষ্ণ শক্তি সর্বদা জাগ্রতভাবে তাঁহার কার্যে নিযুক্ত থাকে। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্রামে বা যোগ নিদ্রায় রাখে। তাই এই কৃষ্ণ শক্তির নাম যোগমায়া। "ত্রিগুণের মিশ্রণের নাম যোগ, আর উহাই মায়া, সেই যোগমায়া দ্বারা আবৃত আমি, সকলের নিকট প্রকট থাকি না। ভক্তকে স্ব-স্বরূপে দর্শন দান করি" (শঙ্কর)। অজন্মা অবিনাশী, সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ আমি মনুষ্যরূপে স্থিত আমাকে জানিতে পারে না (রামানুজ)। ভগবানের আংশিক প্রকাশের অতীত যে অজ অব্যয় শ্রেষ্ঠ ভাব, কোনও জীবের পক্ষে তাঁহাকে সেইভাবে জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। তিনি জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত। সর্বত্র অনুস্যূত থাকিয়াও সকলের অগোচর। সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ শক্তি যোগমায়া দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে (শ্রীঅরবিন্দ)। শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃ সঙ্কল্প শক্তিই যোগমায়া (কৃষ্ণানন্দ স্বামী)। যে শক্তি জীবকে ঢাকে তাহা মায়া, যে শক্তি ভগবানকে ঢাকে তাহা যোগমায়া (ডঃ মহানামব্রত)।

যোগমায়া অঘটন ঘটাইতে যোগ্যতা বিশিষ্ট এই শক্তির সহায়তায় সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ অজ্ঞবৎ প্রতিভাত হন, ক্ষুদ্র শক্তি জীবের মত। যশোদানন্দন কৃষ্ণ মা যশোদার বন্ধনে ছেদনে অসমর্থ। কাহার নিকট কৃষ্ণকে কতটুকু ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, কাহার নিকট তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে হইবে বুঝিয়া তাহার ব্যবস্থা করাই যোগমায়ার কার্য। যোগমায়া বহির্মুখদের মোহে মোহাচ্ছন্ন করেন। আর ভক্তদেরে ভাবের মাধুর্যে মোহিত করেন। জীবের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য কৃষ্ণের যে কৃপাশক্তি তাহাই যোগমায়া (শঙ্কর, বিশ্বনাথ)। যোগযুক্তি, আমার অচিন্ত্য জ্ঞানের প্রভাব। যাহা ঘটে না, তাহা ঘটাইতে নৈপুণ্য যাহার, তাহাই যোগমায়া (শ্রীধর স্বামী)।

"যোগঃ কর্মসু কৌশলম" (২।৫০)। কর্মের কৌশলই যোগ। শ্রীকৃষ্ণ এই অর্থটাকে একটু বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি কৌশল বুঝাইবার জন্য যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—"পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" (৯।৫, ১০।৭, ১১।৮)। যোগ শব্দের এই অর্থ ধরিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে যোগী (১০।৭), যোগেশ্বর (১১।৪, ১১।৯, ১৮।৭৫, ১৮।৭৮) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক যোগ, সৃষ্টি কৌশল বা ঘটনা সামর্থ্য যেজন্য ইহাকে মায়া বলিয়াছেন। অতএব যোগরূপ যে মায়া এই অর্থে যোগমায়া শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে বুঝিতে হইবে যোগ শব্দ মায়া শব্দের সহিত একার্থক।

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভি সর্বমিদং জগৎ।
* * * *
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"
(গীতা—৭।১৩—১৪)

৭।১৩—১৪ শ্লোক বিচার করিলে বুঝিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ

প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতিই বেদান্তের মায়া। "মায়া = তত্ত্ব প্রকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া অতত্ত্ব প্রকাশের কারণ, আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযুক্তা অবিদ্যা" (মধুসূদন)। মিথ্যা ভূত প্রপঞ্চের প্রকাশিকা (নীলকণ্ঠ): সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই গীতায় মায়া বলা হইয়াছে (তিলক)। দৈবী = অলৌকিকী (শ্রীধর স্বামী)। ভগবান মায়ার সাহায্যে ক্রীড়া করেন, তাই ইহা দৈবী। দৈবী কারণ ঈশ্বরের স্বভাব (রামদয়াল)।

—:০:—

কর্ম্মেভ্যো নমঃ

শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

কর্ম্মে, জ্ঞানে বা ধ্যানে যে ভাবেই হোক—পরম মায়ে যুক্ত থাকাই সাধনা। মাতৃ-যোগের কারণেই সাধনা। এই সৃষ্টিচক্র কর্ম্মময়। কর্ম্মশূন্য সাধনা অসম্ভব।

"জীব মাত্রেই সাধক। কর্ম্মমাত্রেই সাধনা" কারণ সাধনা নিজেই কর্ম্মবিশেষ। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও কর্ম্ম পূজাদিও কর্ম্ম। ধ্যান ধারণাও কর্ম্ম। আবার নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থানও কর্ম্ম। শুধু কর্ম্মের আকার ভেদ মাত্র।

আমরা সংসারী সাধারণ মানুষ। এই কর্ম্মকে দু'ভাগে বিভক্ত করি। কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম। অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম ও অনাত্মকর্ম্ম। যে কর্ম্মে আত্মাকে বা প্রাণকে প্রসারিত করে, আমাদের দেহ মন্দিরে আত্ম-অস্তিত্বে স্থিতি লাভে সাহায্য করে—সেই সকল কর্ম্মই আমাদের কাছে আত্মকর্ম্ম। আর যে কর্ম্মের ভিতরে আমরা ঐ উপলব্ধি লাভে অসমর্থ সে সকল কর্ম্মই আমাদের কাছে অনাত্মকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম। এক কথায় আত্ম উপলব্ধির সহায়ক কর্ম্মই কর্ম্ম এবং বাকী সবই অকর্ম্ম।

তাই আমরা মনে করি যে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই প্রকৃত কর্ম্মযোগী। আর সংসার আশ্রমের সংসারীরা সকলেই আত্মকর্ম্মে সদাই আত্মবিস্মৃত। এটা কিন্তু ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপক্ষে সংসারেই সকলের জন্ম। একই ভাবধারায়, একই নিয়মের অধীনে সব জীবের আগমন। এই জগৎ সংসার, পরমাত্মারূপিণী মায়ের এক অখণ্ড আশ্রম। তাই যে যে স্থানে—যে ভাবেই থাকুক বা জীবনধারা নির্বাহ করুক না কেন—কোন ভাব বা কোন ধারাই ঐ মাতৃধারার বাইরে নয়। বিশ্বমাতার সংসারে থাকতেই হবে। স্থূলে বা সূক্ষ্মে এর বাইরে যাবার অধিকার বা যোগ্যতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবেরও নেই।

বিশ্বমায়ের এই বিরাট কর্ম্মযজ্ঞাগারে অণু থেকে অনীয়ান, মহি থেকে মহীয়ান প্রত্যেকেই সদাসর্বদা মাতৃ-মহাযজ্ঞে, কর্ম্ম চঞ্চল। এ যজ্ঞ বিরাট। এ যজ্ঞ বিশাল। এ যজ্ঞ অখণ্ড এবং অনন্ত। এই যজ্ঞেই সকল জীবের পরিত্রাণ।

জীব বা প্রাণী মাত্রেই অন্নে পরিপুষ্ট। অন্ন থেকে রস, রস থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি স্নায়ু, এবং বীজের সৃষ্টি। আর ঐ বীজ থেকে আবার জীব। এরই নাম সৃষ্টিচক্র। অন্নই প্রাণের পোষক এবং প্রাণের ধারক। সুতরাং অন্নই সৃষ্টিচক্রের একমাত্র উৎস। আবার এই অন্নের উৎস যজ্ঞ। এই যজ্ঞই ব্রহ্ম-যজ্ঞ। ব্রহ্মময়ীর অখণ্ড কর্ম্ম-যজ্ঞ।

এই অখণ্ড কর্ম্ম-যজ্ঞের উৎস সূর্যদেব। অদিতি পুত্র আদিত্যের এক নাম বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ড যজ্ঞের সকল আহুতি শ্রীবিষ্ণু বুকে ধারিত হয় বলেই যজ্ঞের অপর নামও বিষ্ণু। সৌর কর্ত্তা সূর্যদেব—সৌর মণ্ডলের কেন্দ্র শক্তি। এই পৃথিবী বুকের জলরাশিকে বাষ্পে রূপান্তরিত কোরে জলকণা রূপ আহুতি বৃষ্টির আকারে পৃথিবীকে প্রদান করে।

তাই সবিতা বা যজ্ঞ থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকেই জীবের পোষণ। এইভাবে বিরাট থেকে ক্ষুদ্রে, ক্ষুদ্র থেকে বিরাটে বিশ্বমাতার কর্ম্ম-যজ্ঞচক্র প্রতিনিয়ত চলমান। মাতা থেকে সন্তানে আবার সন্তান থেকে মাতায় এই কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত। এই কর্ম্মযজ্ঞ, মাতৃস্নেহ চক্রের পরিপূর্ণে আবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়।

সূর্যের দ্বারা পরিবৃত থেকে সকল গ্রহ যেমন আপন আপন কক্ষে বিচরণ কোরে চলেছে—ঠিক সেইভাবে আমরা সকলেই বিশ্বমাতার দ্বারা পরিবৃত থেকে আমাদের আপন আপন কর্ম্মপথে বিচরণে রত। বিশ্বমাতৃশক্তি সাগরে সদাই ভাসমান—এইভাবে জাগ্রত থেকে সংসার ধর্ম পালন একান্ত প্রয়োজন।

চৈতন্যময়ী মা সর্বজীবে সংগোপনে অধিষ্ঠিতা থেকে অক্লান্তভাবে কর্ম্মে রত। মুহূর্তের তরেও কোন ক্লান্তি বোধ নেই। সন্তানকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠাদানে সদাই নিযুক্তা। তাই প্রতিটি জীবই সাধক এবং সচ্চিদানন্দের সন্ধানে কর্ম্ম-চঞ্চল, সদাই অস্থির।

সৎ-চিৎ এবং আনন্দই জীবের জীবনে প্রধান লক্ষ্য এবং পরম প্রাপ্তি। সৎ, মানে অস্তিত্ব। "আমি আছি। আমি থাকব।" এই অস্তিত্বের অভাবেই মৃত্যু ভয়। জীব প্রতিটি পলে আপন অস্তিত্বকে অনুভব করে। অস্তিত্ব রক্ষায় জীব একান্ত ভাবেই যত্নবান। "আমি থাকব—আমাকে রক্ষা কর"—জীবের এই প্রার্থনাই প্রধান। এই অস্তিত্ব রক্ষার কারণেই জীব কর্ম্মময় এবং আকাঙ্ক্ষাময়। তাই জীব মাত্রেই সে সৎ বা আপন আপন অস্তিত্বের সাধক—এ কথা সহজেই বোধে আসে।

আবার, আমি স্থির বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাই যে, আমি আছি বা আমার অস্তিত্ব আছে। আমি আছি এটা স্থির—কিন্তু সেই সত্তা অনুভবে আমি অক্ষম। আমি বুঝব না যে আমি আছি। এভাবে থাকা না থাকারই সমান। এ ভাবের সত্তায় আমার শান্তি অসম্ভব। আমার প্রাণ এ ভাবের অস্তিত্ব কখনও চায় না। আমার প্রাণ চায় যে আমি থাকব এবং বুঝব যে আমি আছি। এইটাই আমার কাম্য অনুভূতি। এইটাই আমার চৈতন্য যুক্ত অস্তিত্ব।

এই অস্তিত্বের চেতনাকে জাগ্রত রাখার জন্যই আমরা সদা চঞ্চল। বিষয়ের পর বিষয়ে আমাদের চৈতন্য প্রতিফলিত। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে আমরা শুধু অস্তিত্বেরই অন্বেষণ করি না—চৈতন্য যুক্ত অস্তিত্বই আমাদের প্রার্থনা। তাই আমরা সৎ এবং চিৎ বা অস্তিত্ব এবং চেতনা, এই উভয়েরই সাধক। আর ঐ জাগ্রত চেতনার জন্যই আমরা কর্ম্মময়।

এবারে—আমার ঐ অস্তিত্ব বোধটুকু যদি সদা বেদনোদায়ক বা বেদনাদায়ক ভাবে বিদ্যমান থাকে—সে ভাবে থাকার থেকে না থাকা নিশ্চয়ই বহুগুণে কাম্য। বেদনার অনুভূতি কখনই আমরা চাই না। আমাদের প্রার্থনা সদাই আনন্দে থাকব। থাকব এবং বুঝব যে আমি আছি এবং সেই বোধের অস্তিত্বটুকু আনন্দময় হবে। আনন্দে সদাসর্বদা পরিপূর্ণে থাকবো। এই ভাবের অস্তিত্বই আমাদের প্রাণের একান্ত ঈপ্সিত বস্তু। আনন্দলাভেই আমাদের বাস্তবতা—আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং চঞ্চলতা।

তাই এক আনন্দের অবসান মাত্রেই আমরা নূতন আনন্দের সন্ধানে ছুটি। শৈশবে খেলা—যৌবনে বিষয় এবং বার্ধক্যে ধর্মের ভিতরে আমরা শুধু ঐ আনন্দলাভের বাসনাতেই যত্নবান থাকি। সুতরাং আমরা শুধু অস্তিত্ব এবং চৈতন্যের অন্বেষীই নই। আমরা অস্তিত্ব, চৈতন্য এবং আনন্দের উপাসক। এক কথায় আমরা সকলেই সচ্চিদানন্দের অন্বেষণে কর্ম্মময় সাধক।

সত্তা, জ্ঞান, আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই জীবের জীবন। কিন্তু এই পরম প্রাপ্তি একমাত্র মানব দেহের পক্ষেই সম্ভব। কারণ মানবদেহই প্রকৃত কর্ম্মদেহ। কার্য্য-কারণ শৃংখলার প্রতীক।

জীব জগৎ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, পশু বা তির্য্যকজাতি। মানবজাতি এবং পারলৌকিক দেবতাবর্গ।

ইন্দ্রিয়বর্গ, অন্তঃকরণ এবং প্রাণ এই তিনের সংমিশ্রনেই জীবদেহ গঠিত। ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ জীবদেহের বাইরে স্থাপিত। বিশেষ বিশেষ পশুর বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় এত প্রবল শক্তি সম্পন্ন বা তীব্র যে ঐ প্রবল ইন্দ্রিয়ের গতিরোধ সংযত বা রোধে অসমর্থ। তীব্র ইন্দ্রিয় শক্তির আকর্ষণেই সদা পরিচালিত। ভোগেই ঐ প্রবল ইন্দ্রিয় বৃত্তির একমাত্র নিবৃত্তি। তাই পশুবর্গকে ভোগ প্রধান জীব বলা হয়।

আর দেবতাগণ অন্তঃকরণ প্রধান। অন্তরে বাসনা জাগার সাথে সাথেই প্রাপ্তি। ইচ্ছা মাত্রেই সিদ্ধি। দেবতাদের ইচ্ছা শক্তিই কার্য্য। কোনরকম কর্ম্ম প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। তাই দেবতাবৃন্দ ইচ্ছাময়।

একমাত্র মানবজাতিরই ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কোন ইন্দ্রিয়ই অত্যাধিক প্রবল নয়। তাই পশুজাতির মতন প্রবলভাবে ভোগের দিকে আকর্ষণে—ইন্দ্রিয়বর্গ ততটা সক্ষম নয়। আবার কোন ইন্দ্রিয়ই একান্তভাবে দুর্বলও নয়। ইন্দ্রিয়াদির এই সামঞ্জস্যই মানবের বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য।

ইন্দ্রিয়বর্গই বিষয় বাসনা বা ইচ্ছাকে অন্তরে জাগায় এবং সেই ইচ্ছা বা বাসনাকে কার্য্যে রূপায়নের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে। তাই ইচ্ছা এবং প্রাপ্তি কর্ম্ম সাপেক্ষ এবং কর্ম্ম সময় সাপেক্ষ। ঐ ইচ্ছা এবং কর্ম্মের মধ্যে যে সময়টুকু, সেই অবসরেই মানব হিতাহিত বিবেচনায় সমর্থ। সেই বিবেচনা থেকেই ক্রমশঃ জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিচার শক্তির স্ফুরণ ঘটে। তাই মানব ভোগ মুখে ছুটেও আবার বিচারে ফিরেও আসতে পারে। অথবা বিচার বিবেচনার সাহায্যে ভোগের বাসনাকে দমনেও সে সক্ষম।

কিন্তু মানব ছাড়া অন্য কোন জীবের পক্ষে এটা অসম্ভব। কারণ পশুদের প্রবল ইন্দ্রিয় বিচারের সুযোগই দেয় না। আর দেবতাদের ইচ্ছার সাথে সাথেই সিদ্ধি। বাসনা মাত্রেই প্রাপ্তি। ইচ্ছা এবং প্রাপ্তির মধ্যে কালের কোন ব্যবধানই নেই। তাই বিচার বিবেচনার সুযোগও ঘটে না। এই জন্যে মানবজীবনই কর্ম্মক্ষেত্র। মানবদেহই একমাত্র কর্ম্মদেহ।

তাই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের পক্ষে কর্ম্ম সন্ন্যাস বা কর্ম্মশূন্য অবস্থা লাভ অসম্ভব। ত্যাগী হবো ভাবলেই ত্যাগী হওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বময়ীকে অন্তরে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা না হয়, ততক্ষণ কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। বিশ্বজননীকে অন্তরে স্থাপন করার মানেই সম্পূর্ণ বিশ্বকে অন্তরে ধারণ করা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অন্তরে ধারণের পরে জীবের আর কোন বাহ্যিক আসক্তি বা অভাববোধ থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং অন্তর্যামিনীকে পরিপূর্ণরূপে লাভ না করা পর্য্যন্ত অনাসক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। কর্ম্মত্যাগও অসম্ভব।

ইন্দ্রিয় বোধে বিন্দু আসক্তি থাকা পর্য্যন্ত কর্ম্ম থাকবেই থাকবে। কর্ম্ম-শূন্যতা বা কর্ম্ম-সন্ন্যাস সহজ নয়। প্রকৃতপক্ষে সে অবস্থা লাভ করা কৃপা সাপেক্ষ এবং একান্তই দুর্লভ বস্তু। বিচার বিবেচনার সাহায্যে কর্ম্মত্যাগ হয় না। যতক্ষণ বিচার থাকে, ততক্ষণ কর্ত্তব্য বোধও থাকে এবং ততক্ষণই কর্ত্তব্য পালনে কর্ম্মও থাকবেই। বিচারের অতীত অবস্থা লাভ হোলে কর্ত্তব্য আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়। বুদ্ধি বা বিচারে পরিচালিত হোয়ে তখন কর্ম্মপথে চলতে হয় না। প্রাণের প্রেরণায় তখন সকল কর্ম্মই ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়।

"The Aims and ideals of the mission being purely spiritual and humanitarian, it would have no connection with politics."
(6) Vivekananda. Romain Rolland

মহামায়াপুরী

স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে এক একটী বিশেষ দিনের স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীঠাকুর বসে আছেন গঙ্গাধারের বারান্দায় সকালবেলায়। এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা হবে। আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে। হলের ভেতরে ভক্ত মায়েরাও বসে আছেন তাঁর উপদেশ ও সান্নিধ্য লাভের আশায়। ভক্তদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সেদিন আত্মসমর্পণের কথা উঠলো। শ্রীঠাকুর বললেন, "দেখো ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণ ঠিকভাবে করা বড়ই কঠিন জিনিষ। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর চরণে নিবেদন করা। নিজের বলতে এতটুকুও কোনো বোধ থাকবে না, তখন সেই বিরাট ইচ্ছাই হবে তোমার ইচ্ছা, বাধা বিঘ্ন কোনো কিছুতেই বিচলিত হওয়া চলবে না, তখন তিনিই নেবেন সব ভার। দক্ষিণেশ্বর লীলায় ঠাকুর বলেছেন, "আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী মা যা করান তাই করি, অহং-এর লেশমাত্র থাকবে না, তবে সর্বোপরি তাঁর কৃপা, কৃপা ছাড়া হয় না কিছু, এর জন্য চাই প্রার্থনা, দক্ষিণেশ্বর লীলায় ঠাকুর বলেছেন আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন, তবে এই যে তোমরা সংসারের নানান ঝামেলার মধ্যে থেকে ছুটে আসছো, এটা কি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, সেই বিরাট দৃষ্টিশক্তি সর্বতোভাবে ওতপ্রোতো হয়ে আছে, তবে নিত্য প্রার্থনা রেখে যেতে হবে তাঁর চরণে, আবার এই যে এদের দেখছো, (আশ্রমের সাধু ছেলেদের প্রতি লক্ষ্য করে) এরা ছোটবেলা থেকে আমার কাছেই পড়ে আছে, আমি খাই নাই তো এরাও খায় নাই, আমি শুই নাই তো এরাও শোয় নাই, আবার বনে জঙ্গলে মাঠে মাঠে দৌড়েছি রোদ্দুরে তো এরাও আমার সঙ্গে দৌড়েছে, এরা অনেকেই অবস্থাপন্ন বাড়ীর ছেলেমেয়ে, কিন্তু সবরকম কষ্টই এরা করেছে আমার সঙ্গে, এরা এসেছে জানবে বহুজন্মের পুণ্যফলে। আমি এদের কিছু কিছু পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছি, বেদোক্তজলা বুদ্ধি হোক। ইউনিভার্সিটির পড়া প্রথম দিকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তারপর আমিই আবার আরম্ভ করলুম, কোনো দিকেই যাতে পিছিয়ে না থাকে। আবার কিছু কিছু ভজন গান বাজনার ব্যবস্থা করেছি, কয়েকজনের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশও দেখেছি, (এই বলে দু'এক জনের নাম করলেন) ঠাকুরের কৃপায় আশ্রমের ইস্কুলগুলি গড়ে উঠলো এদের মাধ্যমে, ঠাকুরের কাজ এরা কিছু কিছু ক'রে যাচ্ছে, আবার রাত্রি জেগে জপ মৌন থাকা এগুলিও করে যাচ্ছে"। "আর দেখ স্বামীজীদের হাড়ভাঙ্গা তপস্যায় প্রার্থনায় আজ জগৎ জুড়ে কাজ চলছে। স্বামীজীরা কত কষ্ট ক'রে পদব্রজে কপর্দকহীন হয়ে তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করেছেন। আবার হিমালয়ের ওদিকে কত কত সাধু মহাত্মা গুহাশ্রিত হয়ে নির্জনে ধ্যানে ডুবে আছেন, কোনোদিন হয়তো আহার জোটে সামান্য কোনোদিন হয়তো জোটে না, আর ভিক্ষালব্ধ আহার ছাড়া তাঁরা গ্রহণ করেন না। এদেরই আশীর্বাদে এই সমস্ত মঠ মিশন আশ্রম গড়ে উঠছে দিকে দিকে, তবে একটী কথা কি জানো, কর্মে বেশি জড়ালে নানান গোলমাল এসে যায়, তাতে সাধন ভজনে বিঘ্ন ঘটে, সাধারণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও এসে যায়। কোথাও কোথাও শুনি মোমাছির চাষ হচ্ছে, দেখো স্বামীপাদ এরা চেয়েছিলেন পরস্পর কল্যাণ চিন্তা, যা কিছু 'বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়' তারই জন্যই এই কঠিন ব্রত। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ) ইচ্ছা ছিলো, স্বামীজী চেয়েই ছিলেন, "The aims and ideals of the mission being purely spiritual and humanitarian, it would have no connection with politics."

"তবে কি জানো, ধর্মলাভ বড় কঠিন জিনিষ, মানুষের

অনেকটাই নির্ভর করছে তার সংস্কারের উপর, 'instinctive ntution' তবে কৃপার জন্য প্রার্থনা রেখে যেতে হবে, ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম দুটোই যেন আমরা প্রার্থনা সহায়ে করে যেতে পারি, প্রতিষ্ঠা নাম যশ এগুলির মোহ কাটাবার চেষ্টা করতে হবে"। কথা বলতে বলতে একটু চুপ ক'রে গেলেন, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'Instinctive intution মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি পরিণত হল বুদ্ধিতে, বুদ্ধি রূপায়িত হয় প্রজ্ঞায়, প্রজ্ঞাই দেবত্ব। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর আবার কথা বলতে সুরু করলেন, 'দেখ কিছু কিছু কাজের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে, তবে মনে থাকে যেন আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র। নাও কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেলো, (গৃহীভক্তদের দিকে তাকিয়ে) তোমাদের আবার বাড়ী ফিরতে হবে। ভক্তেরা সকলেই প্রণাম করলেন। শ্রীঠাকুর গঙ্গার দিকে তাকিয়ে জোড়হাত ক'রে প্রণাম করলেন, তারপর মন্দিরে প্রবেশ করলেন, ভক্তেরা প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

—:০:—

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

অজ্ঞানতা অন্ধকার—মনীষা আলোতে
দূরীভূত হয় তাহা যে পুণ্য প্রভাতে ;
সে প্রভাত এসেছিল আসে যুগে যুগে
সুপ্ত জাতি জেগে ওঠে—অমৃত স্বরগে।
ঋষি কণ্ঠে শুনি তাই—"অমৃতস্য পুত্রাঃ,"
মোরা সেই ভারতের হই ঋষি গোত্র।
দেবতা পূজার আগে অধিবাস ক্রিয়া,
বেদ শাস্ত্র এই বিধি রাখিল লিখিয়া।
সেই বিধি মতে যত মাঙ্গলিক কাজ,
গ্রহণ করিল সবে মানব সমাজ।
ক্ষণ জন্মা পুরুষেরা দেশের কল্যাণে,
মঙ্গল চিন্তায় সদা মগ্ন থাকে ধ্যানে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর পুণ্য আলোকে,
মনীষারা আবির্ভাব হয় দিকে দিকে।
ঊর্দ্ধ সপ্ত লোক হ'তে আসে মহাজন,
নানা ভাবে নানাদিকে সেই জাগরণ।
গীতায় শ্রীভগবান রাখেন স্বাক্ষর,
হইলে ধর্ম্মের গ্লানি আসেন সত্বর।
সেই মহাকর হতে জীবের কল্যাণে,
শিব অংশ হ'তে আসে ভৈরব এখানে।
নর শ্রেষ্ঠ 'নরেন্দ্রের' সেই সত্তা জাগে,
রামকৃষ্ণ পাদস্পর্শে প্রেম অনুরাগে।
"শিব-জ্ঞানে জীব সেবা" এই ব্রত নিয়া,
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে ভারত ব্যাপিয়া।
পাশ্চাত্য হইতে আসে প্রাচ্যে আহ্বান,
বিশ্ব ব্যাপিয়া ওঠে বেদান্তের গান।
নররূপী নারায়ণ সেবার লাগিয়া,
মঠ ও মিশন স্থাপে উদ্বেলিত হিয়া।
বর্ণভেদ ঘুচাইয়া মানুষে মানুষে,
প্রীতির বন্ধন লাগি অভীঃ মন্ত্র ঘোষে।
সেই মন্ত্রে অভিষেক পূজা আয়োজন,
হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে জাগে গুঞ্জরণ।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে অধিবাস ক্রিয়া,
বিংশ শতাব্দীতে পূজা হৃদয় মথিয়া।
সন্ন্যাসীজির অভীঃ মন্ত্র অধিবাস ঘোষে,
ইরোজের রণাঙ্গণে পূজা যে "সুভাষে।"
আধ্যাত্ম ভারত জাগে, জাগায় জগৎ,
সত্য শিব সুন্দরের এ চির মহৎ।

—০০০—

সমন্বয়ী দর্শন

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

["সমন্বয়ী দর্শন" গ্রন্থের 'জ্ঞানতত্ত্ব' অধ্যায়ে বেশ কিছু ভুল থাকায় সম্পূর্ণ অধ্যায়টি সংশোধন ক'রে পুনরায় প্রকাশ করা হ'ল। যাঁরা বইটী কিনেছেন তাঁরা ঐ অধ্যায়টীর স্থলে এইটী পড়বেন।]

জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞান বলিতে আমরা বুঝি জানা। সৃষ্টির আদি হইতে এই জানার কার্য্য সুরু হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে জগৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানা হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃহত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আবার এই জানিবার ক্ষুধা ও জানিবার আকাঙ্ক্ষাও ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া উঠিয়াছে মানুষের প্রাণে। তাহা হইতেই দর্শনের সুরু, দর্শনের নিত্য নূতন সৃষ্টি—প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্র। কেহ বলেন জানিতে হইবে অসীমকে। কেহ বলেন জানিতে হইবে সসীমকে। কেহ বলেন জানার প্রয়োজন আমাদের এই জগৎটুকু অথবা জীবনতত্ত্বটি। কেহ বলেন জানিতে হইবে আমাদের নিজেদেরকে। এইরূপ নানাভাবের জ্ঞানের কথায় নানা দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার দর্শন সিদ্ধান্ত-সমূহকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে নানা বিজ্ঞান—যথা পদার্থবিষয়ক, রাসায়নিক ইত্যাদি অথবা শ্রী-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, মন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, জীবিকা বিষয়ক বহুবিধ বিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের আদি হচ্ছে দর্শন বা তত্ত্ব বিজ্ঞান। এই প্রবন্ধে তাহারই কিছু আলোচনার চেষ্টা করা হইল।

প্রাচ্য দর্শনে এবং পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাই পার্থক্য যে প্রাচ্যের দর্শন অখণ্ডের আলোতে খণ্ডকে দেখিয়া থাকে এবং পাশ্চাত্য দর্শন খণ্ডের আলো দিয়াই আভাস পাইতে চেষ্টা করে অখণ্ডের।

দর্শনের প্রথম বিকাশ জগতের ইতিহাসে উপনিষদের যুগে। ব্রহ্ম হইতেই এই জ্ঞানালোচনার সুরু হইয়াছে। ঔপনিষদ পুরুষ ব্রহ্মই প্রথম দ্রষ্টা—তত্ত্বদর্শী দার্শনিক। সর্ব্বজ্ঞত্বই তাঁহার তপস্যা। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম..... যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ....." (মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৮)। সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞানে ব্রহ্ম স্ফীত হন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ ব্রহ্মের জ্ঞানবত্তাই তপস্যা বা সৃষ্টি। জ্ঞানের দুইটি বিভাগ—পরা এবং অপরা। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ" ॥ (১।১।৪ মু:)। "দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে। এই কথাটিই বেদার্থ বিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। উক্ত বিদ্যাদ্বয় পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ।"

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ॥ (১।১।৫ মু:) "তন্মধ্যে ঋক্‌বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিদ্যা। আর পরাবিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষরকে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়"।

সত্য জ্ঞানলাভের কয়েকটি উপায় উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। সবিশেষ জ্ঞান, মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা। উপনিষদে ইহাদের এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যেন ইহারা ক্রমানুয়ে একটি অপরটির অপেক্ষাকারী। "যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি" (৭।১৭।১ ছাঃ উঃ) অর্থাৎ যখন কেহ সবিশেষ জানেন, তখনই তিনি সত্য বলেন।

এই বিজ্ঞান আবার মননের অপেক্ষা করে—"যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি।" (৭।১৮।১ ছাঃ উঃ) যখন কেহ মনন করেন, তখন তিনি বিজ্ঞান লাভ করেন।

এই মনন শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে—"যদা বৈ শ্রদ্দধাতাথ মনুতে" (৭।১৯।১ ছাঃ উঃ) যখন কেহ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন, তখনই তিনি মনন করেন।

শ্রদ্ধা নিষ্ঠার অপেক্ষা করে। "যদা বৈ নিষ্ঠতাথ শ্রদ্দধাতি" (৭।২০।১ ছাঃ উঃ)।

কেহ যখন নিষ্ঠাবান হন, তখনই তিনি শ্রদ্ধালু হন এবং এই নিষ্ঠা অপেক্ষা করে একাগ্রতার—"যদা বৈ করোতাথ নিষ্ঠতি" (৭।২১।১ ছাঃ উঃ)। কেহ যখন একাগ্র হন, তখনই তিনি নিষ্ঠাবান হন।

কি বহির্বস্তু সম্বন্ধীয়, কি আত্যন্তিক, যে কোন জ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য লাভ করিতে হইলে এই কয়েকটির বিশেষ প্রয়োজন। এই যে বিশেষ জ্ঞান, মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা প্রভৃতির কথা উপনিষদ বলিলেন, ইহাদের প্রত্যেকটি মনের কার্য্য এবং জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনকে লইতে হয় ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতা। উপনিষদ বলেন দশেন্দ্রিয় ও মন ইহারাই একাদশ রুদ্র দেবতা। আবার অষ্টবসুদেবে ইহাদের বাস। অর্থাৎ চন্দ্রাদি অষ্টবসু মন ও দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে একাদশ রুদ্র দেবতায় পরিণত হইয়া জগৎ আকারে বাস করিতেছেন। (বৃহদারণ্যক ৩।৯।৪) ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রত্যেকের নিজ নিজ দেবতা ও দেবাসুর সত্তা আছে (ছান্দোগ্য ১।২।৩)। তাঁহাকে মুখ্যপ্রাণ ও ক্রমে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় এবং তিনি আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয় ও মন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস (বৃঃ উঃ ২।১।৩)। গার্গ্য বলিলেন—এই যে চন্দ্রে অবস্থিত পুরুষ ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। এই চন্দ্র হইতেছেন মন বুদ্ধির দেবতা এবং চন্দ্রে অবস্থিত পুরুষই ব্রহ্মরূপে উপাসিত হন এবং ইনিই আছেন বলিয়া মন মনন করিতে সক্ষম। এই মন ও জ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষদে আর একটি বর্ণনা আছে যে, সংশয়যুক্ত মনই অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ বলিতেও বুঝায় একাদশ ইন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ জ্ঞানদান করেন বহু বিষয়ে, কিন্তু তাহা সংশয়ধর্মী ও প্রত্যয়-স্থিতিহীন। তাই মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সত্য প্রতীত হইলেও আত্মাই প্রকৃত সত্য। প্রাণা বৈ সত্যং—(বৃহদারণ্যক ২।১।২০) অস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি·····তেষামেষ সত্যং··· তস্যোপনিষৎ সত্যমিতি (উঃ আঃ ২।১।২০)। প্রকৃতপক্ষে এক চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় প্রত্যেক দর্শনেই প্রত্যেক জ্ঞানের চরমে আত্যন্তিক জ্ঞান বিরাজ করিতেছে। এই দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে এবং বহির্বস্তুর জ্ঞান নিয়া আলোচনার সুরু হইলেও, উহা যেন চরম জ্ঞান লাভ করিবার একটি পন্থা মাত্র।

এখন দেখা যাউক মীমাংসা দর্শন। ইহা জৈমিনীয় প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসক দার্শনিকগণের মধ্যে কুমারিল মতাবলম্বীগণ জ্ঞানের ছয়টি উপায় মানিয়াছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি।

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি বা সাক্ষাৎ প্রতীতি।

অনুমান—বিচার-জাত সিদ্ধান্ত।

শব্দ—বেদের বাক্যগুলি প্রামাণ্য—তাহার উপলব্ধি।

অর্থাপত্তি—একটি বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে উহাকে বুঝিবার জন্য যখন অন্য একটি বস্তুকে ধরিয়া লওয়া হয়, তাহাকেই অর্থাপত্তি বলে।

অনুপলব্ধি—যাহা আমাদের দর্শন-ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্বীকৃতি। ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। অবশ্য প্রভাকর মতাবলম্বীরা ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ মানেন না। মীমাংসকেরা বলেন, কোন জ্ঞান মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সত্য বলিয়াই মানিয়া লওয়া হয়। ইহাই জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য।

প্রভাকরের মতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় যুগপৎ একটি সংবিত্তিতে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানের সময় ইহা ঘটিয়া থাকে। ইহাই প্রভাকরের ত্রিপুটি প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞানের সত্যতা জ্ঞানের বাহিরে কিছুর উপর নির্ভর করে না

অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের জ্ঞান হয়। যেমন প্রত্যক্ষ একটি বিশেষ জ্ঞানের উপায়। আমরা জ্ঞান হওয়া মাত্র প্রত্যক্ষ সত্যকে সত্য বলিয়া মনে করি।

কুমারিলও বলেন যে, জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সত্য কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ আমাদের জ্ঞাততা রূপ ধর্মের দ্বারাই হইয়া থাকে। প্রভাকর আরও বলেন, যে নির্বিকল্প বা সাধারণ জ্ঞান সবিকল্প বা বিশেষের সহিত মিশ্রিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশেষ জ্ঞান পূর্বে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্মৃতি হইতেই আসিয়া থাকে। আমাদের ভ্রান্তি দর্শন, শুক্তিতে মুক্তাভ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে কুমারিল বিশ্বাস করেন যে, ইহাও সেই মুহূর্তে সত্য প্রতীতি। পর মুহূর্তে যে ইহাকে ভ্রান্ত জ্ঞান বলা হয়, তাহার কারণ, তখন ঐ স্থানে অপর একটি সংবিত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে যদ্দ্বারা বস্তুর বিপরীত প্রকৃতি প্রকাশ পায়, অথবা প্রথম জ্ঞানার্জনে অবলম্বিত উপায়ে—প্রমাণে অথবা করণে—কোন দোষ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সকল জ্ঞান তৎকালে অভ্রান্ত। জ্ঞান সম্বন্ধে কুমারিলের আর একটি মতবাদ দিয়া মীমাংসা দর্শনের আলোচনা সমাপ্ত করা হইল।

ইংরাজীতে একটি মতবাদ আছে—একটি সত্যের সত্যতার প্রমাণ হইতেছে অন্য সমস্ত সত্যের সহিত তাহার ঐকান্তিক মিল। ইহাকে কোহিয়ারেন্স্ তত্ত্ব বলে। কিন্তু কুমারিল বলেন, একটি সত্য জানিতে হইলে যদি সব সত্যকে জানিতে হয় এবং ইহাই যদি সত্যের নিরিখ হয় তাহা হইলে সত্য জ্ঞান লাভ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হইয়া থাকে—এইরূপ সমালোচনা পাশ্চাত্য দর্শনেও আছে।

ইহাতে মনে হয় মীমাংসকেরা বস্তুবাদী হইলেও জ্ঞান সম্বন্ধে বিজ্ঞানবাদী, তাঁহাদের জ্ঞান স্বয়ং দৃঢ়। অন্য জ্ঞানের সহিত তাহার সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি তাহার সত্যতার পোষকতা করে মাত্র—তাহা অপেক্ষ নয়।

আর একটি কথা—আত্মাই জ্ঞানের সংবেত্তা ও ভোক্তা মীমাংসকদিগের মতেও। আত্মাই মনের সংযোগে সংবিত্তির সৃষ্টি করে।

ইহার পর আসে ন্যায়দর্শন। ইহাতেও জ্ঞানের চারিটি পাদ আছে। প্রমাতৃ অর্থাৎ জ্ঞাতা, প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয়, প্রমিতি অর্থাৎ জ্ঞান, প্রমাণ অর্থাৎ যাহার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে সত্য বা মিথ্যা জ্ঞান। যাহা হউক, যে প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের সত্য মিথ্যার বিচার হইতেছে সেই প্রমাণের আবার চারিটি প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে বস্তু গ্রহণ করি বা অনুভব করি সে সকল অনুভূতিই প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপজাত। যেমন, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একটি সম্বন্ধ হয় এবং ইহা হইতে একটি জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এইভাবে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে এই ব্যাপার ঘটে। এই পঞ্চেন্দ্রিয় অবশ্য সত্যকার ইন্দ্রিয় নহে। ইহারা আসল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্বরূপ। আসল ইন্দ্রিয় সত্তা ইহাদের অন্তরালে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংস্পর্শজ এই জ্ঞান হইতে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিন প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপাদান, হান ও উপেক্ষা। ইন্দ্রিয় এবং বস্তুর সন্নিকর্ষে প্রথম সাধারণ জ্ঞান হওয়া মাত্র নির্বিকল্প জ্ঞান হয় এবং পরে তাহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়ার পর সবিকল্প জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা হইতে বস্তুটিকে লাভ করিবার ইচ্ছা বা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। পাইবার ইচ্ছাকে উপাদান ও ত্যাগ করিবার ইচ্ছাকেই হান বলে। বহির্বস্তুর সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজ জ্ঞান বাহ্য প্রত্যক্ষ। সুখ দুঃখাদি মানস বস্তু মনোগ্রাহ্য অন্তর প্রত্যক্ষ। আর তিন প্রকার প্রত্যক্ষ ন্যায় প্রসিদ্ধ—সামান্য-লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ ও যৌগিক। প্রথমটিতে জাতি প্রত্যক্ষ, যথা মানুষ মরণশীল। তুষারে শৈত্য দৃষ্টি, প্রস্তরে কাঠিন্য দৃষ্টি জ্ঞান-লক্ষণ প্রত্যক্ষ। ধর্মকীর্তি বলেন যৌগিক প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় অনন্ত, দেশকালাতিক্রমী সত্য প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরে প্রত্যক্ষ জ্ঞাত হেতুর সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাই অনুমান। যথা—ধূম প্রত্যক্ষ

হইতে আগুনের অস্তিত্ব জ্ঞান। এই স্থানে ধূম হইতেছে হেতু। প্রমাণের আর দুইটি প্রকার—উপমান এবং শব্দ। উপমান—একটি পূর্ব দৃষ্ট পরিচিত বস্তুর স্মৃতি হইতে পরবর্তীকালে কোন দৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য জনিত জ্ঞান-ই উপমান। আর প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমানরূপ প্রমাণ যখন কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করিতে অক্ষম হয় তখন জ্ঞানদানের সহায়ক হয় শব্দ-প্রমাণ। বেদাদি শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যকেও শব্দ-প্রমাণ বলে। শিষ্যগণের জ্ঞান এই শব্দ প্রমাণের দ্বারা হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমাজে বাসকালে নানারূপ কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহারা ঐগুলির অর্থ শিখে এবং জ্ঞান লাভ করে। এইভাবে প্রমাণ ব্যতীত ন্যায় দর্শনে আরও পঞ্চদশটি পদার্থ আছে। যথা—প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতন্ডা হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। আবার প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় দ্বাদশ প্রকার যথা—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ।

ন্যায় মতে এই ষোড়শ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিলে মুক্তি অনিবার্য। এই অতি সংক্ষিপ্ত ন্যায় হইতেও বুঝা যাইবে যে, ন্যায় মোক্ষশাস্ত্র ও অবয়ব-বহুল দর্শন। ইহাতে পাশ্চাত্যের লজিক, মেটাফিজিক্স, থিয়োলজি ও সাইকলজির বিষয় বস্তুর বহু আলোচনা রহিয়াছে। ন্যায় দর্শনের একটি নাম আন্বীক্ষকী (এস্থলে Kant-এর Critique স্মরণীয়) শাস্ত্র। বস্তুতঃ নূতন প্রতিশব্দ অভাবে অতি সার্থক ভাবেই এই শব্দটি পশ্চিমী এপিসটিমোলজির প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ভারতীয় ন্যায় একান্তভাবে এপিসটিমোলজি-ই। ইহার বহুত্ববাদ, আত্ম-অনাত্ম ভেদবাদ, জ্ঞান প্রকরণ বহুভাবে সমালোচ্য কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বৌদ্ধদর্শনের "সর্বম্ পৃথক"-বাদের ভ্রম দর্শাইয়া বিশে শতাব্দীর রিলেটিভিটি ফিলোজফি ও সাইকলজীর ও অনুরূপ ইন্দ্রিয় গোচর সামান্য ও বিশেষ প্রত্যক্ষকে ন্যায় এক অপূর্ব ঐক্য দিয়া 'বহু'কে 'একে' সমন্বিত করিয়াছে—গুণ সমবায় ও সম্বন্ধ-সমন্বয়।

বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞান তত্ত্ব ন্যায়েরই প্রায় অনুরূপ। বৈশেষিক দর্শনের ইহাই মত যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের ও মনের সহিত আত্মার সংযুক্ততাই আত্মাতে জ্ঞান উপজাত হইবার কারণ। জ্ঞান আত্যন্তিক ভাবে আত্মারই। স্থূলদেহের নহে। জ্ঞান যদি স্থূলদেহের হইত তাহা হইলে 'আমি দেখিতেছি' 'আমি শুনিতেছি' না বলিয়া আমরা 'আমার চক্ষু দেখিতেছে' 'আমার কর্ণ শুনিতেছে' ইহাই বলিতাম। এইভাবে বৈশেষিকে জ্ঞানের বিষয় অনন্ত। সত্য জ্ঞান চারি প্রকার। প্রত্যক্ষ, লৈঙ্গিক (অনুমান), স্মৃতি, আর্যজ্ঞান (ইনটুইটিভ্)। প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্থূল ভূতের জন্য। পরমাণু দ্বসরেণু এসব প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও সামান্যের ধারণা হয়। যে কোনও একটী বস্তুর জ্ঞান তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর দ্বারা যেখানে ঘটে তাহাকে বলে লৈঙ্গিক জ্ঞান। আত্মা ও মনের সংযোগ হেতু যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে স্মৃতি জ্ঞান বলে। ঋষি ও সিদ্ধপুরুষদিগের জ্ঞানকে আর্ষজ্ঞান কহে।

ভ্রান্তজ্ঞান আবার চারিপ্রকার—সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায়, স্বপ্ন। অনধ্যবসায় অর্থে আমাদের অনির্দিষ্ট জ্ঞান বুঝায়।

বিশেষের দ্বারাই আমাদের কোন বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই বিশিষ্টতা নিত্য বর্ত্তমান—ইহাই তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। পরমাণু আকাশ প্রভৃতি আদি তত্ত্বগুলির পার্থক্যকারী গুণগুলি প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমিত হয়। বৈশেষিক জ্ঞানতত্ত্বে অনন্ত জ্ঞেয় বিষয় (পদার্থ নিচয়) সাতটি শ্রেণীতে নিরূপিত। যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। বৌদ্ধমতে আত্মা ও জড় যদি থাকে—তবে তাহারা সম্বন্ধগুচ্ছের প্রতীতি মাত্র। জ্ঞান ইহাই বা ইহাদেরই। অন্য পক্ষে ন্যায় মতে জ্ঞের বিষয় তর্ক-বিজ্ঞানের বস্তুসমূহ বলিয়া মনে হইতে পারে। বৈশেষিক কিন্তু সুস্পষ্টভাবে অনুভবের সর্বপ্রকার বিষয়কে জ্ঞেয়-বিষয় জ্ঞানে শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, শুধু প্রতীতি বা প্রকৃতি-বস্তুগুলিকে নহে।

ইহার পর সাংখ্যের জ্ঞানতত্ত্ব। এই মতে জ্ঞানতত্ত্বে তিনটি বস্তু আছে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানোদ্ভবের ধারা অর্থাৎ কিভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাংখ্যীয় পরিভাষায় ইহাই বৃত্তি বা প্রমাণ এবং ইহারই প্রতিবিম্ব প্রমাণ যাহা প্রমাতৃ-চৈতন্যে জ্ঞান উৎপন্ন করে। সাংখ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। তন্মধ্যে মনের দ্বারা আভ্যন্তরিক ক্রিয়াগুলির জ্ঞান হয়। তাহার নাম মানস-প্রত্যক্ষ বা অনুভব। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির দ্বারা বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়, অবশ্য তাহার সহিত মন ইত্যাদিরও সহযোগিতা থাকে। ইহার নাম প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতেছেন পুরুষ। আর বুদ্ধি অহংকার, মন, ইন্দ্রিয় ইহারা পুরুষের জ্ঞানের যন্ত্র মাত্র। ইহাদের প্রত্যেকেই জ্ঞেয় বস্তুগুলি ধরিয়া দিতেছে জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষের নিকট। কিন্তু পুরুষ এই জ্ঞানের জ্ঞাতা হইলেও তাঁহার কৈবল্যের হানি ঘটে না। যাহাই হউক, কেমন করিয়া এই কার্য্য ঘটিয়া থাকে সাংখ্য তাহা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—ছয়টি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর মিলনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জ্ঞেয় বস্তু বা বাহ্য বস্তুগুলি নিত্য ক্রিয়াশীল। ইহাদের সহিত ইন্দ্রিয়ের প্রথম সংযোগ হওয়া মাত্র ইন্দ্রিয়গুলিও জাড্যহীন বা জড়ত্বহীন হইয়া চঞ্চল বা সক্রিয় হইয়া উঠে। আবার ইন্দ্রিয়ের এই চাঞ্চল্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্তঃকরণও হইয়া উঠে ক্রিয়াশীল। তাহাতে অন্তঃকরণের প্রকাশগুণে ব্যাপ্ত হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ তিনটি। মন, বুদ্ধি, অহংকার। বিষয় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ঘটাইবার পর বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত হইবার পর মন সেগুলি ধারণ করে। পরে অহংকারের দ্বারা সেগুলি সংকৃত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত হয়। ক্রমান্বয়ে অনুভূতির এই প্রক্রিয়াগুলির নাম—আলোচনা, সংকল্প, অভিমান, বিনিশ্চয়। আলোচনাকে ন্যায়ের ভাষায় নির্বিকল্প জ্ঞান বলা যায়। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বিষয় যখন বুদ্ধিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহা চিদ্বরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই প্রতিবিম্ব আবার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইলে বিষয়ের অনুভূতি হয়। সকল সাংখ্যবাদী কিন্তু শেষ পর্য্যায়টি মানেন না। মনের পূর্ব্ব জ্ঞান, সংস্কার ও স্মৃতি-ধর্ম্মক অংশের নাম চিত্ত। অপরাংশ যাহা 'কৃতি' তাহা সংকল্পক। কল্পনা, ইচ্ছা ও অবধান ক্রমে কার্য করে। চিত্তের এই অনুভূতি বা সংবিত্তির কয়েকটি প্রকার আছে। যথা—প্রমাণ (সত্যজ্ঞান), বিপর্য্যয় (মিথ্যা জ্ঞান), বিকল্প (বস্তু শূন্য), নিদ্রা এবং স্মৃতি। তন্মধ্যে আবার প্রমাণের কয়েকটি প্রকার আছে। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ; অনুমান অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় জ্ঞান করা ; আগম অর্থাৎ আপ্তপুরুষের বাক্য। অন্য দর্শনের মতো এই দর্শন বেদের প্রমাণ মানে না। মোটামুটি ইহাই সাংখ্যের জ্ঞানতত্ত্ব।

জৈন দর্শন :

এই দর্শনে জ্ঞান পাঁচ প্রকার এবং জ্ঞানলাভের উপায় দুইটি, পাঁচ প্রকার জ্ঞান যথা—মতি শ্রুতি, অবধি, মনঃ পর্য্যায়, কেবল। উপায় দুইটি প্রমাণ এবং ন্যায়। প্রমাণের দুইটি প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। উপরোক্ত পঞ্চবিধ জ্ঞান এই দুই প্রকার প্রমাণের দ্বারা লভ্য। মতি, শ্রুতি, পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা লভ্য। অবধি, মনঃ পর্য্যায়, কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা লভ্য। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে জৈনদের অপর একটি মতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ত' বটেই তাহা ছাড়া মনোরাজ্যের সূক্ষ্মশক্তির দ্বারা যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান হয় তাহাও প্রত্যক্ষ-ই।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, জৈন মতে জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ বা অনন্তর (ডাইরেক্ট), পরোক্ষ বা সান্তর (ইনডাইরেক্ট)। আবার প্রমাণাকার ও নয়াকার ভেদেও জ্ঞান দ্বিবিধ। প্রমাণ-আকারে জ্ঞান বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান। নয়-আকার জ্ঞান বস্তুর সাপেক্ষ বা সম্বন্ধ-গত জ্ঞান।

এখন পঞ্চপ্রকার জ্ঞান কি? জৈন দর্শন তাহা এইভাবে করিয়াছে। মতি বলিতে এইগুলিকেই বুঝায়—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, স্মৃতি এবং সংজ্ঞা বা প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর স্মৃতি হইতে কোন বস্তুকে চিনিয়া

লওয়া। 'ঊহা' বা তর্ক অর্থাৎ বিশেষ হইতে সামান্য জ্ঞান (ইনডাক্‌টিভ) এবং অভিনিবোধ বা অনুমান অর্থাৎ সামান্য হইতে বিশেষের জ্ঞান (ডিডাক্‌টিভ)। মতি জ্ঞানকে কখনও কখনও তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উপলব্ধি (সংবিত্তি), ভাবনা (স্মৃতি) উপযোগ (বোধ)। এই মতি জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও মন উভয়ই কার্যকরী। মনকে অনিন্দ্রিয় নামে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক করা হইয়াছে। শ্রুতি জ্ঞান বলিতে বুঝায়—শব্দ বা পদ, চিহ্ন বা প্রতীক ইত্যাদি হইতে লব্ধ জ্ঞান। তন্মধ্যে বাক্য জ্ঞান মহাবীর প্রমুখ তীর্থঙ্করগণের উক্তি বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে জ্ঞান। মতি যেমন তিন ভাগে বিভক্ত, শ্রুতিরও তেমনি চারিটি বিভাগ। লব্ধি (এ্যাসোসিয়েশান্), ভাবনা (এ্যাটেনশান), উপযোগ (আন্ডারস্টানডিং) ন্যায় (বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীর মূলে অর্থ-নির্ণয়)।

তৎপরে আসে অবধি, মনঃ, পর্যায় এবং কেবল। অবধি অর্থাৎ দেশকালে দূরবর্তী দ্রব্যের জ্ঞান। যথা ;—যোগী-প্রত্যক্ষ দূরদর্শন দূরশ্রবণ। মনঃ পর্যায় অর্থাৎ অন্যের চিন্তা প্রত্যক্ষ করা টেলিপ্যাথিক জ্ঞান এবং কেবল হইতেছে পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যের এবং তাহাদিগের পরিবর্তন সকলের অপরোক্ষানুভূতি। ইহা পরিব্রাজ্যাদিগের লভ্য। এই পাঁচপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে জৈনগণ বলেন, প্রথম তিনটি জ্ঞানের যথা, মতি, শ্রুতি ও অবধি, ইহাদের মধ্যে ভ্রমের স্থান থাকিতে পারে কিন্তু শেষের দুইটি অর্থাৎ মনঃপর্যায় ও কেবল তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। জৈনগণ বলেন, সত্যজ্ঞানই কার্যকরী হয়। কারণ ইহা বস্তুর সত্য স্বরূপটিকে প্রকাশ করে। কিন্তু ভ্রান্তি জ্ঞান দ্রব্যের সত্যস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন—রজ্জুতে সর্পভ্রম। এখানে ভ্রান্তিই রজ্জুকে স্বস্থানে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। এই ভ্রান্তি আবার তিন প্রকার। সংশয়, বিপর্য্যয় (সত্যের বিপরীত ধারণা অনধ্যবসায় (অনবধান বা ঔদাসীন্য হেতু ভ্রান্তি জ্ঞান)।

জ্ঞান এবং দর্শন জীবচৈতন্যের দুইটি বিভাব। কোন বস্তুর সামান্য প্রত্যক্ষকে দর্শন বলে। বিশেষ প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলে। এই সামান্য জ্ঞান হইবার দুইটি স্তর আছে। প্রথম 'ব্যঞ্জনাবগ্রহ' অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় গোলকে বস্তুর কম্পন আসিয়া লাগা। তাহার পর 'অর্থাবগ্রহ' অর্থাৎ বস্তুর কম্পন লাগিবার পর আমাদের চৈতন্যের চাঞ্চল্য এবং ইন্দ্রিয় পথে সংবেদন অনুভব। এই দুই ঘটনাতে আমাদের কেবলমাত্র সামান্য জ্ঞান হয়। তাহার পর জ্ঞান বা বিশেষ প্রত্যক্ষ। তাহারও তিনটি স্তর রহিয়াছে। যথা—ঈহা, অভাবা, ধারণা। 'ঈহা' অর্থে মনের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়া উঠাকে বুঝায়। 'অভাবা' অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের একত্র আলোচনা করিয়া বস্তু 'ইহা' 'উহা নয়' এইরূপ জ্ঞান হওয়া। 'ধারণা' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বস্তুটির গুণগুলি উপলব্ধি করিয়া গুণসমেত বস্তুটির ধারণা। এইভাবে দর্শন ও জ্ঞান জীব চৈতন্যের দুইটি প্রকাশমাত্র।

জৈনমতে আত্ম-অনাত্ম দুই-ই জ্ঞেয় বস্তু এবং জ্ঞানী ও জ্ঞান পৃথক হইলেও অবিচ্ছেদ্য। প্রত্যেক জ্ঞানেই জ্ঞানীর জ্ঞাতৃর প্রকট এবং আত্মজ্ঞান অর্থে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাবিত এক পূর্ণ ঐক্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানলাভের দুইটি উপায় 'প্রমাণ' এবং 'নয়'। তন্মধ্যে প্রমাণের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রমাণ সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছে। নয় সম্বন্ধেও জৈনশাস্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা আছে। নয়—বস্তুর আপেক্ষিক জ্ঞান বা একটি দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বস্তুকে প্রকাশ করা। এই নয়কে কোন কোন মতে বহু ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটি মতে নয় সপ্তভাগে বিভক্ত। অবশ্য ইহাই অখণ্ড সত্য নহে। সাতটি নয় ক্রমান্বয়ে এইরূপ—নৈগম্য নয়—কোন্ উদ্দেশ্যে আমরা কোন্ কাজ করি এই সম্বন্ধটি ইহা হইতে বুঝায়। যথা—কাঠ কাটিতেছি। কেন ? না রন্ধনের নিমিত্ত। সংগ্রহ নয়—ইহা সামান্য পরিচয় বা সাধারণ জ্ঞানকেই বুঝায়। যথা—জাতি। ব্যবহার নয়—লৌকিকভাবে আমরা জাগতিক ব্যাপারে দর্শনাদির দ্বারা যুগপৎ সলক্ষণ-বিলক্ষণ যে জ্ঞান লাভ করি তাহাই। ঋজুসূত্র নয়—একটি দ্রব্যকে একটি স্থানীয়কালে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে

জ্ঞান। এইগুলি 'অর্থসম্বন্ধী' নয়। 'শব্দ নয়'—বস্তুর প্রকাশ হয় নামে। এই নামের কার্য হইতেছে, গুণ বা সম্বন্ধ ক্রিয়া বা দ্রব্য যাহাই হউক, কোন একটি বস্তুকে মনের নিকট ধরিয়া দেওয়া এবং একটি নামের অর্থ একটি-ই হইয়া থাকে। ইহাই 'শব্দ নয়'। 'সমাভিরূঢ় নয়'—শব্দের প্রত্যয় অনুসারে তাহাদের ভিন্নতা দেখানো।

'এবং ভূত নয়'—বস্তুর বহু প্রকাশ। তন্মধ্যে একটি স্থানে, একটি কালে তাহার একটি অর্থ-ই শব্দের ধাতু প্রত্যয়ে ভাবিত হয় ও চলতি ব্যবহারে শব্দটির দ্বারা ঐ ভাবটিই লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই 'এবং ভূত নয়।' এইগুলি 'শব্দ-সম্বন্ধী' নয়। নিত্যতা ও অনিত্যতার দৃষ্টিকোণ হইতে নয় দুইভাবে নিরূপিত—'দ্রব্যার্থিক' ও 'পর্যায়ার্থিক'। প্রথমটি সত্তাত্মিক, দ্বিতীয়টি অবস্থাত্মিক।

এই সকল আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত অপর একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তাহাই সত্য দৃষ্টি। ইহার নাম 'নায় নিশ্চয়'।

'নায় নিশ্চয়ের' দুইটি ভাগ আছে। শুদ্ধ নিশ্চয় এবং অশুদ্ধ নিশ্চয়। শুদ্ধ নিশ্চয় শুদ্ধ স্বরূপের বিষয় এবং অশুদ্ধ নিশ্চয় আপেক্ষিক রাজ্যের বিষয়। এই 'ন্যায়ের' দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে জৈনগণ বৈশেষিকগণের 'অসৎ-কার্য-বাদ' অর্থাৎ কার্য কারণের ভিতর অনুস্যূত থাকে না, এই বাদ এবং সাংখ্য বেদান্তের 'সৎ-কার্য-বাদ' অর্থাৎ কার্য কারণে অনুস্যূত থাকে, এই দুই মতই সত্য বলেন। যেমন স্বর্ণ-কঙ্কণ দ্রব্যার্থিক নায়ে ধাতু দৃষ্টিতে স্বর্ণ মাত্রই কিন্তু পর্যায়ার্থিক নায়ে অলংকার দৃষ্টিতে উহা অভিনব, স্বর্ণ মাত্র নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ ব্যবহার হইতেছে 'স্যাদ্‌বাদ'। এই মতে এবং সকল দ্রব্য-ই সৎ-অসদাত্মক হওয়ায় সমস্ত সত্যই আপেক্ষিক। অর্থাৎ সমস্ত সত্যের মাঝে এই কথার ব্যবহার রাখা উচিত, "সম্ভবতঃ ইহা সত্য হইতে পারে।"

জৈন দর্শনের পর আসে বৌদ্ধ দর্শন। যাঁহাকে মূল করিয়া এই বিরাট দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই বোধিসত্ত্বের নিকট পরাজ্ঞানের প্রশ্ন উঠিলে তাঁহার নিকট হইতে এক সুগভীর মৌনতাই উত্তররূপে প্রকাশিত হইত এবং উক্ত কারণেই বহুমতে নাস্তিক নামেই তাঁহার পরিচয়। এমনকি তাঁহার উপদেশাবলীও খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত ভাবকণিকেই ভিত্তি করিয়া আজ গড়িয়া উঠিয়াছে বিরাট বৌদ্ধশাস্ত্র। বৌদ্ধদের একটি মতবাদের নাম 'মাধ্যমিক শূন্যবাদ' এবং স্থায়ী আত্মা না মানার জন্য ইহার অপর নাম 'নৈরাত্ম-দর্শন'। বৌদ্ধ দর্শনের বহু মণীষীর মতই ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ স্থায়ী আত্মা বলিয়া কিছুই নাই—সবই শূন্য। তাহা হইলে এই যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিচিত জগৎ ইহা কি? এবং ইহার সম্বন্ধে যে আমরা নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছি তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব। বৌদ্ধদর্শন এখানে আনিয়াছে একটি ক্ষণের অস্তিত্ব। একটি বস্তুর অস্তিত্ব একটি ক্ষণেই সম্ভব। একটি ক্ষণেও যে তাহার অস্তিত্ব মানা হইতেছে তাহার কারণ সেই ক্ষণে সেই বস্তুটি একটি প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নাশ হইয়া যাইতেছে। তাহার স্থানে আসিতেছে আর একটি বস্তু ও করিতেছে অপর একটি প্রয়োজন সিদ্ধি এবং ইহাদিগকে যে 'আমি' জানিতেছি তাহাও ভ্রমমাত্র। কতকগুলি ক্ষণিক অস্তিত্ববান চিত্তবৃত্তি মিলিত হইয়া 'আমি জানিতেছি' এই ভ্রমের সৃষ্টি করিতেছে। ইহার নাম 'ক্ষণভঙ্গবাদ'। জ্ঞেয় সত্তা বা জ্ঞাতা আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ইহা হইতে বৌদ্ধদর্শনে 'স্কন্ধ বা স্কন্ধ' মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। স্কন্ধ অর্থাৎ কতকগুলি ক্ষণিক অস্তিত্ববান স্বতন্ত্র বস্তুর সম্মেলন। ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা (১) রূপস্কন্ধ, অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল, ক্ষিতি, অপ প্রভৃতি চতুর্ভূত ইত্যাদির একত্র ভাব। (২) বেদনা—সুখ, দুঃখ এবং অসুখ এই তিনটি অনুভব। (৩) সংজ্ঞা অর্থাৎ জাতি-সম্বন্ধাত্মক জ্ঞান। (৪) সংস্কার—ইহা বিভিন্ন প্রবণতাপুষ্ট সংস্কার। ইহা হইতে আমরা বুঝি আমাদের মনোবৃত্তিগুলি কেমন করিয়া বিশেষ বিশেষ ভাবে চঞ্চল হইয়া মিলিত বা পৃথক ও ক্রিয়াশীল হয়। (৫) বিজ্ঞান স্কন্ধ হইতেছে বোধের প্রকাশ। আমাদের সকল জ্ঞান, সকল অনুভূতি, এই পঞ্চ-স্কন্ধ

সম্মেলনের ফল। ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংযোগ হইলে রূপস্কন্ধের ক্রিয়া হইবামাত্র সংজ্ঞাস্কন্ধেরও ক্রিয়া সুরু হইয়া যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে মনোবৃত্তি চঞ্চল হইয়া বস্তুটিকে রূপ প্রত্যক্ষ ও বিশেষ জ্ঞান দিয়া তাহাকে বিশেষ নামে বিশেষ জাতি রূপে ও সম্বন্ধ-সমান্বিত সত্তারূপে বুঝায় অর্থাৎ প্রত্যয় সম্পন্ন করে। এই সকলের সংযোগে তাহাকে বিশেষ জ্ঞানরূপে পরিণত করিতে সহায়তা করে সংখার বা সংস্কার স্কন্ধ। অবশেষে আন্তরিক ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া জ্ঞানরূপে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই বিজ্ঞান স্কন্ধ। বৌদ্ধ মতে ব্যষ্টি বোধের মূল উপাদান—স্থূল, চেতন ও নৈতিক।

বৌদ্ধ দর্শনের চারিটি শাখা, বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক এবং যোগাচার। তন্মধ্যে বৈভাষিক মতে আমরা বাহিরে বস্তুকে যেরূপে প্রত্যক্ষ করি এবং অন্তরে তাহার সম্বন্ধে যাহা অনুভূতি হয় উহারা সেইভাবেই সত্য। জ্ঞানতত্ত্বে ইহা বাহ্য-প্রত্যক্ষবাদ। এই মতে জ্ঞানের দুইটি করণ—গ্রহণ এবং অধ্যবসায়।

গ্রহণ হইতেছে কল্পনা রচিত কিন্তু অস্পষ্ট। অধ্যবসায় কাল্পনিক কিন্তু স্পষ্ট। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ইহাদের গ্রহণ করিয়া চিত্তকে জাগরিত করিয়া তোলে এবং বিজ্ঞান বা চৈতন্যকে করিয়া তোলে স্ফুরিত।

গ্রহণ যিনি করিয়া থাকেন, তিনি উপলব্ধি করেন, যিনি উপলব্ধি করেন তিনিই বিজ্ঞান এবং যে স্থানে চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন তাহা চিত্ত অথবা মন। এই মন বা চিত্তের ধর্ম্ম হইতেছে স্মৃতি। এ মতে মনে হয় ইন্দ্রিয় পথে বিষয় গৃহীত হইয়া স্মৃতি সহায়ে এবং অধ্যবসায় দ্বারা উপলব্ধি বা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে জ্ঞান কল্পিত হয়।

সৌত্রান্তিক মতবাদে প্রত্যেক বহির্বস্তুর নিজস্ব সত্তা হইতে আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বলিয়া মনে হইলেও উহা বাহ্যবস্তু উপজাত ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্ঞানতত্ত্বে ইহা বাহ্য অনুমেয়বাদ।

এই মতে চারিটি কারণের ভিত্তি ভূমিতে জ্ঞান হয়, যথা অবলম্বন (ডেটা) সমানন্তর (সাজেসন্) সহকারী (মিডিয়াম্) অধিপতিরূপ (অর্গ্যান্)। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতবাদই বৌদ্ধ সম্ভাবিতবাদ।

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদের মতে জ্ঞান আমাদের নানা বাসনার সংস্কার উপজাত। বাহ্যবস্তু বলিয়া কিছুই নাই। সমস্তই আমাদের নিরালম্বন কল্পনা। এমতে বাহ্যবস্তু প্রত্যয়ের উদ্ভব দুটি বৃত্তিপথে—একটি বৃত্তিতে আমরা কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি করিতেছি, ইহাই খ্যাতিবিজ্ঞান। অন্য বৃত্তিটির দ্বারা কল্পিত বস্তুগুলির পরস্পরের ভিতর সম্বন্ধ স্থাপিত করিতেছি। ইহাই কল্পিত বস্তু প্রতি বিকল্প বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানবাদে বসুবন্ধু মৈত্রেয় অসঙ্গ প্রভৃতির একটি মতবাদ আছে—সে সমস্তই চিত্তের কল্পনা এবং এই কল্পনার দুইটি প্রকার আছে—এক প্রকার কল্পনাতে বস্তুগুলিকে দৃষ্টিগোচর বলিয়া বোধ করি—তাহাই প্রত্যক্ষ এবং আর এক প্রকার কল্পনাতে বোধ হয় যেন বস্তুগুলি পূর্ব্ব দৃষ্ট। ইহাই স্মৃতি। এইভাবে প্রত্যেকের ভিতর এই বস্তুর প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির ধারা চলিয়াছে। ইহাকে বলা হয় সন্তানধারা। আবার একজনের সন্তান ধারা অপরের সন্তান ধারাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। একই শক্তি, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান উভয়ই সৃষ্টি করিতেছে। এই শক্তিই উৎপাদ স্থিতি ভঙ্গ বস্তু 'আলয় বিজ্ঞান'। ইহা হইতেই অন্তরের এবং বাহিরের ধারায় জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে।

মাধ্যমিক মতে আন্তর বা বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনুভূতি বা জ্ঞান সমস্তই প্রতীতি মাত্র। সত্য সর্ব্বথা শূন্য। একদিকে ইহা প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ। অন্যদিকে ইহাই সর্ব্বশূন্যবাদ বা সর্ব্বনৈরাত্মিকবাদ। ভগবান বুদ্ধ-ব্যাখ্যাত মধ্যমবাদে—শাক্য কাচ্চন সম্বাদে পাই—'হে কাচ্চন। এই জগৎ অস্তি নাস্তি দ্বৈত সর্গ। সত্য প্রজ্ঞ জগতে দ্রব্যসমূহের প্রসৃতি দেখিয়া নাস্তি দৃষ্টিহীন হন আবার তিনিই জগতে দ্রব্যসমূহের অপসৃতি দেখিয়া অস্তি দৃষ্টিহীন হন। প্রত্যেক দ্রব্য আছে—প্রত্যেক দ্রব্যই নাই, দুইটিই অতি কথা। হে কাচ্চন। মধ্যই সত্য।'

ইহার পর দেখা যাউক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শন। এই মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, অভিন্ন। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ই। এই জ্ঞাতৃত্ব গুণসম্পন্ন বলিয়াই জীবের 'আমি বস্তু জানিতেছি' এইরূপ প্রতীতি হয়। এই সবিকল্প জ্ঞানের কারণ কি? বেদান্তের মতে এক চৈতন্য স্বরূপের বিকার তিন প্রকার—(১) প্রমাতৃচৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞাতা। (২) প্রমাণ চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানের ধারা। (৩) বিষয় চৈতন্য অর্থাৎ বাহিরের বস্তু জ্ঞানকালে আত্মার আলো অন্তঃকরণের উপর পতিত হওয়ার ফলে অন্তঃকরণ দ্রষ্টারূপে প্রতিভাত হয়। আবার অন্তঃকরণের আলো পতিত হয় বস্তুর উপর, বিষয়কে প্রকাশ করিবার জন্য। কিন্তু বিষয়কে প্রকাশ করিতে গিয়া অন্তঃকরণ আপনিই সেই বিষয় আকারে পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। ইহাকে প্রাপ্যকারী বলে। ইহা-ই বৃত্তি। এই যে অন্তঃকরণের আলো বস্তুর উপর পতিত হয় ইহা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়াই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারাই এই ব্যাপার ঘটে। কেহ বলেন, কেবল চক্ষু নহে, শ্রবণ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও ইহা ঘটে। অবশ্য আত্মার সংবৃত্তির সময় বাহ্যবস্তু থাকে না। তখন থাকে কেবল ইন্দ্রিয় সম্বাদ, বৃত্তি চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য। যাহাই হউক পূর্বোক্ত বৃত্তি চারি প্রকার—সংশয়, নিশ্চয়, গর্ভ, স্মরণ। বৃত্তি যখন সংশয়াত্মিকা তখন উহা মানস ব্যাপার। বৃত্তি যখন নিশ্চয়াত্মিকা তখন উহা বুদ্ধির ব্যাপার এবং 'আমি জানিতেছি' অর্থাৎ নিজের বিষয় জ্ঞান এইরূপ বৃত্তি অহংকার বা গর্ভের ব্যাপার। একাগ্রতা ও স্মরণ চিত্তের ব্যাপার। অর্থাৎ বৃত্তি ভেদে অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি, গর্ভ ও চিত্ত। তন্মধ্যে মন, সংকল্প, বিকল্প, প্রত্যক্ষ, বাসনা ও ভাবী-কর্ম্মী এবং বুদ্ধি—ধারণা, তর্ক, সিদ্ধান্ত ও অহং চেতনাধর্ম্মী। বেদান্তে আবার এই অন্তঃকরণ, মন, চিত্ত এবং বুদ্ধির স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্তঃকরণের স্থান হৃদয় গুহায়, চিত্তের স্থান নাভিপ্রদেশে, মনের স্থান গলদেশে এবং বুদ্ধির স্থান মুখে। মনই বস্তুর জ্ঞান দান করে। বৈশেষিক দর্শনে একটি মতবাদ আছে, ইন্দ্রিয়গুলি এবং ইন্দ্রিয়গোলকগুলি এক। কিন্তু বেদান্তীগণ বলেন, ইন্দ্রিয়গোলকের পশ্চাতে চৈতন্য শক্তি আছে ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার অধিষ্ঠান স্বরূপে আছে অন্তঃকরণ, যাহা ইন্দ্রিয় সংবেদ গ্রহণ ও শৃঙ্খলিত করে। এই অন্তঃকরণের স্বচ্ছতায় চৈতন্যের আলোকে বস্তু প্রতিবিম্ব অর্থাৎ বস্তুচৈতন্য উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিভেদে এই অন্তঃকরণ বিভিন্ন এবং তাহাই ব্যক্তিভেদে প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের কারণ। এইরূপে জ্ঞানের উপায় তিনটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম। ইহা ন্যায় দর্শনের অনুরূপ। শ্রীশঙ্করের সংবিত্তির ভ্রম সমীক্ষণ তাঁহার জ্ঞানতত্ত্ববোধে আমাদের সহায়। একটি রজ্জু দেখিয়া বলা হইল ইহা সর্প। এই সিদ্ধান্তে 'ইহা' ইন্দ্রিয়ের বিষয়—'সর্প' অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে বিষয়ের উপর আরোপ। ইন্দ্রিয় দ্বারে উপস্থিত বিষয়ের যে প্রকার বা যে আকার প্রতীতি অন্তঃকরণ করিয়াছে—ইন্দ্রিয় সম্বাদের যে অনুবাদ অন্তঃকরণ করিয়াছে—প্রমাতৃ চৈতন্যের এই অপগ্রহণ বা অপব্যাখ্যা ভ্রান্ত সংবিত্তির কারণ।

রামানুজের মতে জ্ঞানের উপায় তিনটি। প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম এবং ইনিও প্রত্যক্ষের ভিতর দুইটি ভেদ দেখাইয়াছেন—সবিশেষ ও নির্বিশেষ। অর্থাৎ প্রথম জ্ঞেয় বস্তুর শ্রেণী বা জাতি সম্বন্ধে নির্বিশেষ বা অস্ফুট জ্ঞান; পরে বস্তুটিকে একাধিকবার দেখিয়া তাহার জাতিধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানাকেই সবিশেষ জ্ঞান বলা হয়। সবিশেষ জ্ঞান ছাড়া জ্ঞান হয় না। রামানুজের মতে জ্ঞান ভেদাভেদাশ্রিত। জ্ঞানের একটি সহায়ক স্মৃতি—এবং আর একটি সহায় প্রত্যভিজ্ঞা (রিকগনিসান)। সবিশেষ জ্ঞান ইহাদেরই সহায়ে উৎপন্ন হয়। রামানুজের মতে দ্রব্যগুলি যে এত জটিল তাহার কারণ উহারা পঞ্চীকরণ প্রথায় মিলিত হইয়াছে। সমস্ত জ্ঞানই যে সত্য কোন কোন দর্শনে ইহা মানা হয় নাই। কিন্তু রামানুজ বলেন সমস্ত জ্ঞানই সত্য। শুক্তিতে রজত ভ্রম হওয়ার কারণ দুইটি বস্তুরই ভিতর পঞ্চীকরণ প্রথায় পঞ্চভূত পরিমাণ ভেদে আছে। ভূতগ্রামের ভিতর পরিমাণের আপেক্ষিকতায় সাদৃশ্য বা ভেদ প্রবল হয়। সাধারণতঃ আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ বা একদেশদর্শী হওয়ার ফলে যখন শুক্তিকে রজত বলি, তখন পূর্ণভাবে না জানিয়াই

বলি। সত্য তাহাকেই বলা যায় যাহা যথার্থ এবং ব্যবহারোপযোগী। যথা—মরীচিকাকে ভ্রম বলা হয়—তাহার কারণ উহাতে জল থাকিলেও উহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। তাই সমস্ত জ্ঞানই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা সত্যের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করিতে পারিব। ইহা ভগবদনুগ্রহে মুক্তজীবেই সম্ভব।

মধ্ব পুরাপুরি দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে সংবিত্তি বিষয়াশ্রয়ী ও বিষয়বস্তু-তন্ত্রী। ভ্রান্ত সংবিত্তিতে বিষয়ের আকার ভ্রান্ত, কিন্তু তাহা হইলেও সংবিত্তি বিষয়াশ্রয়ী এবং ভ্রান্ত সংবিত্তিও একটি সংবিত্তি। বিষয় ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত দুই ভাবেই সংবেদিত হয়—তজ্জন্য চাই ভ্রান্ত সংবিত্তি ও অভ্রান্ত সংবিত্তি দুই-ই।

গীতামতে জ্ঞানকে একটি চরম পবিত্র পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ এই জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা যে কোনও পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। এই জ্ঞানলাভ হইলে শোকাদি জনিত মোহ দূর হয়। গীতার জ্ঞানতত্ত্বের ভেতর ভারতীয় দর্শনের বিরাট সাধনতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যে জ্ঞান সাধ্য ও সাধন দুই। এই জ্ঞান সংশয়াত্মার দ্বারা লভ্য নহে। আবার এই জ্ঞান লাভ না হইলে, সর্ব্ব সংশয় ছিন্নও হইবে না। তাই বিশ্বাসের পাথেয় লইয়াই এই জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে হইবে। অবশেষে চরমেও পূর্ণজ্ঞানলাভে সর্ব্বসংশয় হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় সাধক উপনীত হইবে। যে কারণে গীতামতে জ্ঞানের প্রকারভেদ—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ত্রিবিধরূপে ব্যাখ্যা করিয়াও, সাত্ত্বিক জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলা হইয়াছে। যে জ্ঞান দ্বারা জগতের বহুত্বের মধ্যে এক অদ্বয় অব্যয়কেই দর্শন হইবে। এমনকি সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক যে ত্রিপুটী ব্যাপার অর্থাৎ—জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা প্রত্যেক কর্ম্মেরই যাহা আশ্রয়, সেখানেও দেখা যাইতেছে—চরম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তিনটিই মিলিত হইতেছে গীতার চরমতত্ত্ব পুরুষোত্তমে। এই পুরুষোত্তমই হইতেছেন প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ।

প্রাচ্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কেহ আর আলোচনা করেন নাই।

পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথম দৃষ্টি পড়ে গ্রীকদর্শনে। কারণ গ্রীসেই পাশ্চাত্য দর্শনের আদি প্রকাশ বলে ধরা হয়। আর গ্রীকদর্শনে সত্যকার জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা সুরু সক্রেটিসের যুগ হইতে। সক্রেটিসের মতে যে কোন বস্তুর জ্ঞানের নিরিখ হইতেছে সেইটিরই যাহা সার্বিক সত্তা তাহাই। এই সার্বিক সত্যের ধারণা (Concept)—দার্শনিকী চিন্তাজাত আত্মজ্ঞান। তাহারই আলোতে বস্তু-সম্বাদ পরখ করিয়া লইতে হইবে, স্থূল বস্তুর সহিত তুলনায় নয়। পশ্চিমী দর্শনের সত্যানুসন্ধিৎসায় বিপ্লব ঘটাইয়া, নূতন মানদণ্ডের প্রবর্ত্তনা করিয়া সক্রেটিস এই মতবাদ প্রকাশ করিলেন। জ্ঞান বস্তুতন্ত্রী, না আত্মতন্ত্রী? সক্রেটিসের মতে আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

প্লেটোর মতে এই জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি পরিবর্ত্তনশীল, আর একটি নিত্য সত্তাসম্পন্ন। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞানও পরিবর্ত্তনশীল; তাই ইহারা ঠিক জ্ঞানের বিষয় নহে। Form বা Idea রূপে ও ভাবকূলি নিত্য ও সত্যকার সৎ-ধর্ম্মী। ইহারা সার্বিক। ইহাদের সমষ্টিই হইতেছে আত্যন্তিক সত্যের জগৎ। জড়-জগৎ সত্যকার সত্তাসম্পন্ন নয়। সেই আত্যন্তিক সত্যের জগৎ হইতে উদ্ভূত এই পরিবর্ত্তনশীল জড় জগৎ। সেই আত্যন্তিক সত্যের জগৎ-বিষয়ক জ্ঞানই সত্যকার জ্ঞান। এ্যারিষ্টটল বলেন, সার্বিক সত্য form বা concept—যাহা তাঁহার মতে তত্ত্বরূপ তাহা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি না—কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি মাত্র। তাহা তৎ-মাত্র হইলেও স্ব-তন্ত্র শুদ্ধ চিৎ-স্বরূপ এবং জড়ে ওতপ্রোত, তাহার সার সত্তা। তাঁহার মতে যাহা আমাদের জ্ঞেয় বস্তু তাহা এই দৃশ্যমান জগৎ। ইহাতে বোধ হয় তিনি সাধারণ Empiricist বা প্রত্যক্ষাপেক্ষবাদী ছিলেন। অবশ্য Apriorism, প্রত্যক্ষানপেক্ষবাদও তিনি তাঁর ন্যায় শাস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জগৎ অতিরিক্ত Prime-mover বলিয়া ঈশতত্ত্বকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

ইহার পরে আসে ইউরোপীয় অন্যান্য দর্শন। পাশ্চাত্য দর্শন জ্ঞানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

কাজেই তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—জ্ঞানের উদ্ভব হইতে হইলে কি কি প্রয়োজন, কতদূর ইহার সীমা এবং কি ভাবে, কি ধারায় জ্ঞান অর্জিত হয়।

প্রথমেই আসে Dogmatism। এই মতে জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিতে কোনরূপ বিচারের স্থান নাই। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন আমাদের মনোরাজ্যে জন্মকাল হইতেই কতকগুলি মূল ভাব (Theory of Innate Ideas—Plato.) আছে। ইহাদের আমরা জগৎ-কর্তার কাছে পাই এবং মানিয়া লই ও বিশ্বাস করি। অন্য একদল, যথা—রিড বলেন, কতকগুলি সহজসিদ্ধ জ্ঞানের বিষয় আছে—সেগুলি সৃষ্টি-কর্তার দান। অন্য সব জ্ঞান মনের অন্তর্নিহিত অথবা সহজসিদ্ধ ঐ ভাবগুলির অনুবর্তী। ইহা dogmatic rationalism, আবার কেহ, যথা—লক বলেন, আমাদের মন জন্মকালে যেন একটি পরিষ্কার রেখাহীন শ্লেটের মতো থাকে। পরে বস্তুর অনুভূতির দ্বারা উহা নিত্য নূতন ছাপ গ্রহণ করে। Dogmatic Empiricism এ মতের নাম প্রথমতঃ সাধারণভাবে Empiricism বা Experientialism-এর পর্যালোচনায় দেখা যায় বস্তুর দুইটি রূপ। একটি প্রকাশ রূপ উহা জগৎ প্রপঞ্চের-ব্যাপারগুলি অর্থাৎ যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। উহাদের নাম 'ফেনোমেনা'। এমতে উহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তাহাও আমাদের অনুভূতির দ্বারা লভ্য। এই অনুভূতি Sensation বা sense experience হইতে সমুদ্ভূত। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে অতীন্দ্রিয় সার্বিক জ্ঞানের সন্ধান পায়। আমাদের বৈচারিক ও নৈতিক জ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি এইরূপ অনুভূতিজ—(বেকন, লক, হবস)।

রীডের ইনটুইশনিসম্ মতও এই প্রকার। অবশ্য কিছু পার্থক্য আছে, তাহা এই রূপ···বস্তুকে আমরা যেরূপেই দেখি ঐরূপেই বস্তুর আত্যন্তিক সত্যতা। ইহার ভিত্তি ভগবৎ-দত্ত বিশ্বাস। Rationalism-কে শুদ্ধ প্রজ্ঞাবাদ ও Intuitionism-কে অন্তঃ-প্রজ্ঞাবাদ বলা যাইতে পারে। Empiricism-এর chastening influence (সংযত প্রভাব) এ-মতেই আছে। পরবর্তীকালে এই empiricism—প্রত্যক্ষ পেক্ষবাদ—বিপরীত রূপ ধারণ করে। হিউম প্রভৃতির এই মতবাদে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূতির রাজ্যের পারের কোন কিছু দান করিতে সক্ষম নহে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতেছে কতকগুলি অনুভূতির আগম বা উদ্ভব এবং উহাদের স্মৃতিতে ধরিয়া রাখা। তাই বস্তু বলিতে আমরা বুঝি কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। এই অনুভূতিতে স্মৃতিও জড়িত থাকে ভাবসমষ্টিরূপে। অতীতের অবদান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও এর মধ্যে থাকে। দিক্-বিশেষে ইহাদের অপর নাম সেনসেসানিসম্ বা এসোসিয়েসানিসম্। ইহার ফলে দাঁড়ায় প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজস্ব জ্ঞানের বিচার নিজের অনুভূতির দ্বারা ঠিক করিয়া লয় (রিলেটিভিসম্)। ইঁহারা বলেন সার্বিক সত্য, আত্যন্তিক সত্য কিছু জানা যায় না। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পারে জ্ঞানের কিছুই নাই। ভগবৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা কোন মতেই যায় না। কোঁতে, স্পেনসার ইঁহাদের এইরূপ মতবাদ—(Positivism, agnosticism)।

র‍্যাসেন্যালিজম্ মতে (যথা, ডেকার্টের) ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও অনুভূতির কোন অর্থই হয় না যদি তাহাদের পশ্চাতে প্রজ্ঞা না থাকে। ইহার কারণও দেখা যায় যে, পশুদের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি আছে তথাপি উহাদের জ্ঞান নাই—কারণ তাহারা নৈয়ায়িক চিন্তা করিতে অক্ষম। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির পারে যাইতে পারে এবং অনুভূতি যাহা হইতে উদ্ভূত তাহার কথাও বলিতে পারে—আর বলিতে পারে তাহার ভিতর কি রহস্য আছে, কি সত্য আছে। এই অনুভূতির পারের কথা হইতেছে আত্যন্তিক রাজ্যের কথা—যথা আত্ম-তত্ত্ব, অদ্বৈত-তত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব।

দিক্‌বিশেষে র‍্যাসেন্যালিজমের আরও কয়েকটি নাম আছে যথা—এ্যাপ্রায়োরিসম্, ট্রান্সেনডেনটালিসম্, স্পেকুলেটিভিসম্। এ্যাপ্রায়োরি মতবাদে অনুভূতির পূর্ব হইতে কতক জ্ঞান আমাদের থাকে। ট্রান্সেনডেনটাল মতবাদে দৃশ্যমান জগতের পারের কথা। স্পেকুলেটিভ মতবাদ হইতেছে সমস্ত কিছু সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী।

এমপিরিসিজম্ ও র‍্যাসেনালিজমের সামঞ্জস্য স্থাপন করেন লাইবনিজ। তিনি বলেন—জ্ঞান হইতেছে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিগুলিকে প্রজ্ঞার দ্বারা গোছানো।

ক্রিটিক্যাল ফিলোজফি—ইহা কাণ্টের মতবাদ (ক্রিটিক অফ্ পিওর রিজন্)। ইহার ভিতর এমপিরিসিজম্ ও র‍্যাসেন্যালিজম্ এই উভয়ই মিশ্রিত আছে। কাণ্টের মতে জ্ঞানের রাজ্যে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিরও প্রয়োজন আছে, আবার প্রজ্ঞারও প্রয়োজন। আমাদের এই জগৎ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাব গঠিত জগৎ। ইহাকে আমরা বুঝি যেন দুটি ছাঁচে ও কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা (Symbol)। ইহার পিছনে বস্তুর স্বরূপ (নুমেনন) রহিয়াছে। কাণ্টের নিজস্ব ভাষায় "things in themselves"—ইহা হইতে আবার দুইটি দল গঠিত হইল, একদল 'নিও ক্যাণ্টিয়' মতবাদ সৃষ্টি করিলেন ও বলিলেন আমাদের চিন্তার সহিত সত্যকার বস্তুরাজ্যের কোন ঐক্য নাই। অপর দলের মত আইডিয়ালিজম্। হেগেল প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। কন্তু জগৎ ভাবের-ই রূপায়ন। ভাবই রূপায়িত হইয়াছে বস্তুতে। এমতে ভাব ও স্বরূপ এক তত্ত্বে পরিণত হয়। হেগেলের জ্ঞানতত্ত্বের অথবা তত্ত্ব-প্রকাশের মূলসূত্র পাই সক্রেটিস্ হইতে। সক্রেটিস্ এইভাবে জ্ঞান অর্জনের উপায় স্থির করিয়াছিলেন। যে কোন একটি মতবাদের সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি করিতে হয় এবং উহার দ্বারাই (ডায়েলেটিক উপায়ে) জ্ঞান হয়। সক্রেটিসের এই ভাবটিকে হেগেল ব্যাপকভাবে গ্রহণ বা ব্যবহার করেন। তাঁহার মতে এই যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ আলোচনার দ্বারা জ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইহা শুধু আমাদের মধ্যেই আছে তাহা নয়—ইহা অদ্বৈত-তত্ত্বের ভিতরেও আছে। অদ্বৈতের ভিতরে যে বিরুদ্ধ তত্ত্বসমূহ বর্তমান আছে তাহাদের পরস্পরের মিলনকারী সেই অদ্বৈত-ই। তাঁহার শক্তি হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। ত্রিপাদ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ভাবের রূপায়ণে এই সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে—স্বীকৃতি, অস্বীকৃতি ও সমন্বয়। সেজন্য আমাদের জ্ঞানও এইরূপ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হইয়া থাকে।

এরও পূর্বের কথা—সাবজেকটিভ আইডিয়ালিজম্ বা সেন্টালিজম্ (বার্কলে)। লক বলেছেন, বস্তু হইতেছে প্রাইমারী (মুখ্য) এবং সেকেণ্ডারী (গৌণ) গুণাবলীর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু বার্কলে বলিলেন, এই সকল গুণ আমাদের কেবল মানস-সত্তায় অবস্থিত আছে। মন না থাকিলে ঐ গুণগুলির অস্তিত্বও আমরা জানিতে পারিতাম না। মন যদি জানিতে পারে তবেই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নেওয়া যায় (To be is to be perceived—Esse est percipi)। এছাড়া আমাদের আর একটি জ্ঞান হচ্ছে,—আমি যে আমাকে জানছি এই সম্বন্ধে জ্ঞান। আমি এবং আমার মনের ধারণা, এদুটির পার্থক্য বোধই তার প্রমাণ। এই চিন্তার মধ্যেই প্রমাণ হয় মনের সক্রিয় চৈতন্য সত্তার।

সাধারণভাবে জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও উপায় এই তিনটি। উপায় অর্থে যদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায়—অর্থাৎ অনুভূতি ধারণা ইত্যাদি। ইহাদের দ্বারাই আমাদের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহাদের সহিত যখন জ্ঞেয় বস্তুর ঐক্য দেখা যায় এবং তাহার সহিত থাকে আমাদের প্রতীতি তখন তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া ধরি। জ্ঞানকে কল্পনা বলা চলে না কারণ ইহার পশ্চাতে বস্তুর সত্তা রহিয়াছেন এবং সে বস্তুর সহিত আবার বস্তুর ভাবের বা সার্থিক সত্তার ঐক্য আছে। এই বস্তু অনুভূতির দ্বারা আমাদের মনের উপর জোর করিয়া ছাপ দিয়া যায় এবং তখনই জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু কল্পনা সম্পূর্ণভাবে আমাদের মনের দ্বারা গঠিত। এই বস্তু জগতের সহিত আমাদের ভাবের যে ঐক্য, ইহা কিরূপ ঐক্য? ইহার আত্যন্তিক সত্তার সহিত ঐক্য আছে? অথবা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির সহিত ঐক্য আছে? একদল বলেন ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির সহিত ইহার ঐক্য আছে, তাই ইহা আপেক্ষিক সত্য (এমপিরিসিজম্)। আর একদল বলেন, ইহা ব্যবহারিক সত্য—কারণ আমরা সত্য বলি তাহাকে, যাহা আমাদের কার্যকরী হয় (প্র্যাগমাটিজম্)। এই মতে উপলব্ধিকে প্রধান করা হয়। অপর একদল বলেন, এই সকল উপলব্ধি এক পরতত্ত্বের প্রকাশ মাত্র—তাহা আত্যন্তিক সত্য।

আমাদের জ্ঞান কিভাবে অর্জিত হয় এ সম্বন্ধে দর্শনে আর একটি মত এই যে, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বুদ্ধির দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়। এই ভাবে আমরা সমস্ত জ্ঞান অর্জন করি। এখন প্রশ্ন উঠে—জ্ঞান হইতে হইলে এই যে বাহির হইতে বস্তুর অভিঘাত এবং অন্তরে বুদ্ধির অভিঘাত হয়—ইহারা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে? উত্তরে স্পেনসার বলেন, ইহারা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের এ্যাপ্রায়োরী বা অনুভূতির পূর্বের যে জ্ঞান উহাও আমাদের পূর্বপুরুষের নিকট প্রাপ্ত জ্ঞান। সুতরাং তাহা এ্যাপস্টেরিয়োরি জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির জ্ঞান। এই মতে আমাদের মন বাহিরের অভিঘাত হইতে উদ্ভূত, ইহা স্বপ্রকাশ নহে। কিন্তু সকলেই একথা মানিয়া লন না। তাই ইহার বিপরীত মতবাদ হইয়াছে মন স্বপ্রকাশ এবং প্রজ্ঞা মনের একটি ধর্ম। তবে বাহিরের এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মন নিজেকে পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। প্রকৃত তত্ত্ব হইতেছে এই যে জ্ঞান বাহিরের বস্তু জগৎ দ্বারা প্রেরিত হয় ও অন্তর্জগতের প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রজ্ঞার কার্য্য হইতেছে আমাদের অনুভূতিকে কতকগুলি ভাব (ক্যাটিগরি) দ্বারা বোঝানো। আমাদের যাহা কিছু অনুভূতি হইতেছে সে সকল অনুভূতিকে আমরা কতকগুলি গুণযুক্ত ও কতকগুলি সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বুঝি ও আমরা সেইগুলিকেই বলি বস্তু। যেমন একটি ফুল—ইহার কতকগুলি গুণ আছে, ইহা আবার অপর বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত। এইরূপ প্রতিটি বস্তু গুণযুক্ত এবং সম্বন্ধযুক্ত। ইহাদের আবার স্বতন্ত্র সত্তাও আছে, স্বতন্ত্র গুণও আছে। আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকার জন্য ইহারা অন্য বস্তুর সত্তাকে প্রভাবিত করে দেশ ও কালকে আশ্রয় ক'রে। বস্তুকে বুঝিবার জন্য এই যে ভাবগুলি আছে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুখ্য এবং কতকগুলি গৌণ। যে ভাবগুলি আমরা বাক্যের ভিতর বা চিন্তার ভিতর ধরিয়া লই যথা—দেশ, কাল, গুণ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এবং বস্তু সত্তা (সাবস্ট্যান্স্)—ইহারা মুখ্য, এবং ইহা হইতেই গড়িয়া লওয়া যে ভাবগুলি, যেমন বস্তুর রং ইত্যাদি—সেগুলি গৌণ।

বস্তুসত্তা (সাবস্ট্যান্স্) :

এখন বস্তু বলিতে কি বুঝায়? দেশ ও কাল তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়া গিয়াছে। এখন দেখা যাউক সাবস্ট্যানস্ বা বস্তু তত্ত্ব। বস্তু হইতেছে তাহাই যাহা গুণধারক এবং আপন অস্তিত্ব সংরক্ষণশীল। সে নিজের অস্তিত্ব এমন ভাবে রক্ষা করে যে নানা অবস্থায় পড়িয়া ইহা পরিবর্তিত হইলেও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। মন একটি বস্তু। ইহারও গুণ নিজের অস্তিত্ব ধরিয়া রাখা এবং ইহা নিজেই নিজেকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান কি করিয়া আসে? আগে বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আসে, না মনের অস্তিত্ব দিয়া বুঝি বাহিরের বস্তুকে? অথবা দুটিই যুগপৎ ঘটিয়া থাকে? সাধারণত আমরা আমাদের আন্তর সত্তার দ্বারাই বাহিরের এই জগৎটিকে বুঝি। কিন্তু সর্ব্ব শেষ কথা বলিতে হইলে বলা যায়—একটি সত্তাই আছে। তাঁহারই একটি প্রকাশ অন্তরে মন বুদ্ধি ইত্যাদি রূপে, আর একটি এই বাহিরের বস্তুরূপে।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ :

পূর্বেই বলা হইয়াছে বস্তুকে বুঝিবার একটি ভাব হইতেছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। সৃষ্টির ইতিহাস একটি নিরন্তর পরিবর্ত্তন মাত্র। কিসে কি আকারে কি সূত্রে, কাহার প্রভাবে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়? কেহ কেহ বলেন প্রতি বস্তুর মধ্যে একটি পরিবর্ত্তনকারী শক্তি আছে। ইহাই তাহার এক বস্তু হইতে আর এক বস্তুতে সত্তান্তরের অথবা রূপান্তরের কারণ। অপর দল বলেন, এই রহস্য বুদ্ধির অগোচর, তবে ইহা প্রকৃতির এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম মাত্র (Uniformity of nature)

অন্য মতে (Ideal Realism) এই কার্য্য-কারণ রূপ পরিবর্ত্তন শিবমের দিকে পরিণতি মাত্র। আমাদের

নিকট যাহা বর্ত্তমানে কারণ ভাবে অস্ফুট হইয়া আছে, তাহাই একদিন স্ফুট শিবম্ পরিণত হইবে। আবার আমাদের ব্যষ্টি কার্য্য-কারণ তত্ত্ব সমষ্টি কার্য-কারণ তত্ত্বের অংশ মাত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনে সমস্ত জগতের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, ক্ষুদ্রগুলি সেই সমষ্টির অংশমাত্র। এই ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন সমষ্টিও অদ্বৈত শিবমের দিকে চলিতেছে।

কার্য্য-কারণের জ্ঞান কি ভাবে হয় :

রিয়ালিস্টগণ, জড়বাদী বা প্রকৃতিবাদীগণ বলেন, আণবিক শক্তি এক আধার হইতে অন্য আধারে সংক্রামিত হয়। সেন্সেসানিস্টগণ বলেন, শক্তি দেখা যায় না কিন্তু আমাদের অনুভব হয় যে, কতকগুলি ঘটনা অপর কতকগুলি ঘটনার পর ক্রমাগত ঘটিয়া যাইতেছে।

আইডিয়ালিস্টগণ বলেন সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ আছে, আর এই কারণ হইতেছে কোন উন্নততর আদর্শের জন্য পরিবর্ত্তন। শিবমের সৎ-স্বরূপে পরিণতিই এই কার্য-কারণের মূল তত্ত্ব।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় :

জ্ঞানের দুটি দিক—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। জড়বাদীদের মতে (মেটিরিয়ালিস্ট) জ্ঞেয় জড়ই। জড়ই সত্য বা চরম তত্ত্ব। জ্ঞাতা-মনের আবির্ভাব সহসা হইয়াছে। ভাববাদীগণ (Idealists) বলেন সত্য-সদ্রূপ যিনি, তিনি চৈতন্য-স্বরূপ তিনি পূর্ণ সাধীন এবং অনন্য। তাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজের সম্বন্ধেই সচেতন। তিনিই জ্ঞাতা, তাঁহারই জ্ঞান এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। সেই হিসাবে তিনি জ্ঞেয়।

জ্ঞানের রাজ্যে আরও দুইটি দিক আছে—একটি আত্যন্তিক জ্ঞান বা নিরপেক্ষ জ্ঞান, অপরটি আপেক্ষিক জ্ঞান। আপেক্ষিক বলিতে গেলে আমরা ইহাই বুঝি যে একটি সত্তা আর একটি সত্তার উপর নির্ভর করিতেছে এবং যাহার উপর নির্ভর করিতেছে তাহাই নিরপেক্ষ সত্য। কিন্তু যাঁহারই আপেক্ষিকতা তাঁহারই নিরপেক্ষিকতা। একমাত্র তিনিই অনন্য এবং স্বয়ং-পূর্ণ হওয়ায় তিনিই স্বাপেক্ষ বা স্বাধীন।

ফেনোমেনা ও ন্যুমেনান :

ইহাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। ফেনোমেনা অর্থাৎ যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অনুভূত হয় অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ। ন্যুমেনান—যাহা আমাদের প্রজ্ঞার দ্বারা অনুভূত। ভাববাদীদের মতবাদ ধরিলেই ইহার মীমাংসা হয়। এই উভয়ই সেই এক সত্তার দুইটি দিক। যাঁহারই প্রকাশ-তত্ত্ব, তাঁহারই স্বরূপ-তত্ত্ব—সসীম ও অসীম।

এম্পিরিসিস্টদের মতে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতিরিক্ত আমরা কিছু জানিতে পারি না। কিন্তু অসীম-তত্ত্ব আমাদের অনুভূতির বহির্ভূত। কাজেই অসীমকে বুঝাইতে হইলে নেতিবাদের আশ্রয় লইতে হইবে—(লক)। র‍্যাসনালিস্ট (ডেকার্টে, স্পিনোজা)। ইঁহাদের মতে সসীমকে যেমন 'অস্তি' বলা হয় তেমনি অসীমও 'নাস্তি' নহে। কারণ সসীমেরই একটি দিক এই অসীম তত্ত্ব—যেমন সীমার কথা বলিতে গেলে অসীমের কথা আপনি আমাদের মনে আসে। আইডিয়ালিস্টদের মতবাদে (হেগেল) অসীম তত্ত্বেরই প্রকাশ হইতেছে সীমাতে। আর সীমা-তত্ত্ব নির্ভর করিতেছে সেই অসীমের উপর। অদ্বৈত প্রজ্ঞানে সীমা ও অসীমের মিলন ঘটিয়াছে।

এতদিন দর্শনের জ্ঞান-তত্ত্ব এইভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গীও যাইতেছে বদলাইয়া। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী যেন সব কিছুই অধিকতর সূক্ষ্ম ও আরও জটিলভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহার সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে পড়িয়া দর্শনও যেন আরও সূক্ষ্ম জটিল রূপ ধারণ করিতেছে ও করিবে। জ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধেও এই একই কথা। জ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক যে কতকগুলি মতবাদ আসিয়াছে তাহা যেন বুদ্ধির

ধরাছোঁয়ার বাহিরে। কিছু বুঝিয়া কিছু ধরিয়া লওয়া ব্যতীত যেন উপায় নাই। আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে Lotze অন্যতম। হেগেলের মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি বলিয়াছেন—চিন্তা হইতেছে একেবারে আমাদের ব্যক্তিগত মানসিক ব্যাপার। কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে সত্যকে প্রতিবিম্বিত করা অর্থাৎ সত্য যেমনটি আছে তেমনটি ধরিয়া দেওয়া বা ঠিক সত্যটিকে নির্দেশ করা চিন্তার কার্য্য নহে। উহা বস্তুর সত্যকার চিত্রটি আঁকিতে গিয়া বা প্রকাশ করিতে গিয়া নিজস্ব আইন কিছু রচনা এবং তাহার সহিত বস্তুর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে।

পারসেপশন্ বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি তাহা ছাড়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ গুণের অনুভূতি ছাড়া, ইহা আরও জটিল কিছু। আমাদের ইন্দ্রিয়ে যে অনুভূতি হইতেছে তাহা এবং যাহা আমরা অনুভব করি (সেনসাম) এই দুইটি পৃথক এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির গুণাবলী (সেনসা) ও জড় জগতের বস্তুর গুণাবলী ইহারাও পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। অনুভূতির কার্য্য হইতেছে ইন্দ্রিয়জ গুণগুলিকে (সেনসা) গ্রহণ এবং তাহাদের সম্বন্ধগুলিকে প্রত্যক্ষ করা বা বোঝা। বস্তুর যে সকল গুণ আমরা ইন্দ্রিয়পথে অনুভব করি তাহা যদি যোগ করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বস্তুর মধ্যে সত্যকার যে গুণ আছে তাহা অপেক্ষা আমাদের অনুভূত গুণগুলির সমষ্টি কম এবং ভিন্ন। তাহা ছাড়া এই অনুভূত গুণাবলী অভিন্নশীল নহে। ইহা কেবলমাত্র আমাদের মানসক্রিয়ার কতকগুলি ফলমাত্র।

এইরূপে সেনসেশান বলিতে যাহা বুঝি, তাহাকেই ইঁহারা একটি জটিল তত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন এবং নূতন নামকরণ করিয়াছেন, সেনসাম। আমরা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিবামাত্র যে ঘটনাটি ঘটিয়া গেল তাহা কি? তাহাকে জড়জগতের বস্তু বলা চলে না—কারণ মাধ্যাকর্ষণ বা ঐ প্রকার জড়-জগতের নিয়মাবলী ইহাদের উপর খাটে না। আবার মনোরাজ্যের ব্যাপার ইহারা নয়—কারণ মনের চিন্তা, ইচ্ছা, বোধ ইহাদের উপর খাটে না। আবার জড়জগতের কার্য্য ধারায় যাহা ঘটিয়া থাকে—যথা একটি জড়বস্তুর সঙ্গে অপর জড়বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই একটি পৃথক বস্তুর সৃষ্টি হয়, ইহারা সেরূপ ভাবে সৃষ্ট নহে। আবার মানস রাজ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেও যে পৃথক ভাব বা অবস্থান্তর জাতীয় একটা কিছুর সৃষ্টি হয় ইহারা সেরূপভাবেও সৃষ্ট নয়। কারণ মানসরাজ্যে প্রতিক্রিয়ার ফলে যে গুণাবলীর সৃষ্টি হইতেছে তাহা ইহার গুণাবলী হইতে পৃথক। কাজেই ইহারা এমন একটা কিছু, যাহা জড়-জগৎ ও মনোজগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছে।

এইভাবে আমাদের অনুভূতির নিরূপণের ভিতর একটা ভ্রান্তি, একটা সংশয়, একটা অনিশ্চয়তা অসম্পূর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিচারে আসল বস্তু হইতে অনুভূত গুণগুলি যেহেতু ভিন্ন সেই হেতু অনুভূতির মাঝে একটা জন্য কিছু আসিয়া পড়িতেছে, তাহা নহে।

আমাদের জ্ঞানের এই ক্ষুদ্রতার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইব যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিই। ইহার কারণ হইতেছে আমাদের সসীম মন সেই অখণ্ড অসীমের অংশ মাত্র—যাহাকে আমরা রিয়্যাল বা আত্যন্তিক সত্য বলি। আর এই সসীম মন সেই অসীম সত্যের সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত মাত্র।

চিন্তার মাঝে আর একটি ব্যাপার আছে তাহা সময়ের হিসাব। কিন্তু সার্ব্বিক সত্যের ব্যাপারে সময়ের হিসাব আসে না—কারণ সার্ব্বিক সত্য প্রায় সর্ব্বকালেই একরূপ। এই সত্যের নিরিখ 'অণ্ড' নহে, আমাদের স্থূল অনুভূতিতে যাহার অস্তিত্ব আছে, সত্য তাহা হইতে ব্যাপক এবং বৃহত্তর। কারণ সকল স্থূল সত্যই অভিন্নশীল নহে—অভিন্নশীল ছিল বা হইবে তাহাও নহে। ইহাদিগকে সার্বসিসটেন্স্ বলে।

কোহিয়ারেন্স্ এবং করেসপনডেন্স্ ঃ

কোহিয়ারেন্স্ এবং করেসপনডেন্স্ ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি? করেসপনডেন্স্ বলিতে আমরা বুঝি

একটি বস্তুর সহিত আমাদের জ্ঞানের ঐক্য। কিন্তু আধুনিক মতবাদ বলিতেছে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে এই সকল ব্যষ্টি সত্য-জ্ঞানের অর্থাৎ আমাদের সত্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার সহিত ব্যষ্টি আত্যন্তিকের মিলনই করেসপনডেন্স্ থিওরি নহে। বরং সমষ্টি সত্যজ্ঞানের সহিত সমষ্টি আত্যন্তিকের মিলনই আদর্শ করেসপনডেন্স্। এমতে খণ্ড খণ্ড সত্য-জ্ঞান অখণ্ড সত্য-জ্ঞানের প্রকাশ পথে অখণ্ড সত্যরূপ পরিণতির দিকে চলিয়াছে। এই পরিণতি অসীম, অনন্ত, অখণ্ড। তাই খণ্ড সত্য-জ্ঞানের সহিত অখণ্ডের মিলনই কোহিয়ারেন্স্। খণ্ড সত্য-জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত অখণ্ডের সহিত মিল খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ উহাকে ঠিক সত্য বলিয়া ধরা হইবে না। এখন আমরা যদি সত্য-জ্ঞানের সহিত অভিজ্ঞকে (এক্সপিরিয়েন্স্) জড়াইয়া ফেলি তাহা হইলেও কোহিয়ারেন্স্ ঠিক হইবে না। তবে বলা যাইতে পারে যে, খণ্ড সত্য-জ্ঞানের সহিত অখণ্ড অসীম অনন্তের মিলন সাধনে তাহার ব্যাপকতর প্রকাশে ব্যষ্টি প্রকাশ যদি মিলিত হয়, তবে আমরা আমাদের খণ্ড সত্য-জ্ঞানের সহিত অখণ্ড অসীম অনন্ত সত্যের মিলন সহকারে নিশ্চয়তার সহিত চলিতে পারি।

আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে রাসেল অন্যতম। আধুনিক জ্ঞান-তত্ত্বের ভিতর ইঁহারও কিছু নূতন অবদান আছে। ইনি বলেন,—আমাদের দর্শন ব্যাপারে আমরা দৃশ্য বস্তুটিকে সকল সময় দৃষ্টি কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই রাখিতে চেষ্টা করি। একটি মুদ্রাকে একটু ধারে রাখিয়া যদি ছবি তোলা হয় তাহা হইলে যেমন তাহার গোল স্বরূপটির একটু পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তেমনি আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে সত্যকার মুদ্রাটি দেখিবার বেলা এইরূপই ঘটে। কিন্তু, তথাপি আমরা মুদ্রাটিকে সম্পূর্ণ গোল ছাড়া আর কোনরূপ দেখি না, সে যতই ধারে থাকুক না কেন।

জ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি করিয়া হয় এ সম্বন্ধে রাসেল বলেন,—জ্ঞান হইতেছে আমাদের পারিপার্শ্বিকের প্রতি প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ আমাদের চারিপার্শ্বের অবস্থা বা বস্তু ক্রমাগত আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে—তাহার প্রতি আমাদের নিকট হইতে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হইতেছে তাহাই জ্ঞান।

জ্ঞানের ভিতর চারিটি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। (১) আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাহিরে একটি ঘটনা ঘটিয়া থাকে। (২) ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে সেই ঘটনা আঘাত করে। (৩) সেই ঘটনার আগমনে মস্তিষ্কে একটি ব্যাপার ঘটে। (৪) এসবেরই অনুবর্তী একটি কিছু মস্তিষ্ক হইতে আবার ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ফিরিয়া আসে। তখনই আমাদের জ্ঞানের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

আসলে জড়বস্তু বলিতে আমরা যাহা দেখি, তাহা শুধু দেশকালের বৈদ্যুতিক স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে। মন ইহার নাগাল পায় না—ধরিবার জন্য অগ্রসর হয় মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই স্পন্দন মস্তিষ্কে যাইয়া একটা ব্যাপার ঘটায়—তাই রাসেল বলেন, বাহিরে যে ঘটনাগুলি আমরা ঘটিতে দেখিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের মস্তিষ্ক কেন্দ্রে ঘটিতেছে। আমরা যাহা দেখি তাহা কতকগুলি সেন্স্ ডেটা মাত্র (যেমন রং ইত্যাদি)। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হইতেছে একটি বস্তুর আবির্ভাব যেখানে মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়কর্ম্ম রহিয়াছে। বস্তু তাহাই যাহার আবির্ভাব ঘটিতেছে একটি স্থানে এবং কালে—যে স্থানে মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেখানে যে সকল আবির্ভাব ঘটিতেছে তাহাদের যোগফল মন।

রাসেল আরও বলেন—মন বা জড় কেহই সত্য নহে। সত্য হইতেছে নিউট্রাল ষ্টাফ বা সৃষ্টির আদিমতত্ত্ব। মন ও জড় তাহা হইতে উদ্ভূত। পার্থক্য কেবল তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গুছাইয়া লইবার ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। রাসেলের মতে আমাদের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে আমাদের ভাষা। ভাষা জাগতিক ঘটনাগুলি বেশই প্রকাশ করিতে পারে কিন্তু অন্য বিষয়, যথা—অনুভূতির ব্যাপার, মানস ব্যাপার ইত্যাদি প্রকাশ করিতে গেলে সে জব্দ হইয়া পড়ে।

মাশ্যাল আর্বান-এর মতে জ্ঞানতত্ত্ব মূল্য তত্ত্বের মধ্যেই পড়ে। জ্ঞান তত্ত্বের ভিতর আমাদের জানিবার ইচ্ছারূপ প্রয়োজনীয়তা নিহিত রহিয়াছে এবং ইহা জীবনের এক কল্যাণকর বস্তু। জ্ঞানের এই প্রয়োজনীয়তা রিয়েলিজম্ বা

বস্তুবাদে ও আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ বা ভাববাদেও রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা আমাদের লইয়া যাইতেছে এই দুইয়ের উর্দ্ধে পরতত্ত্বে। এই পরতত্ত্বেই আমাদের সব প্রয়োজন পূর্ণ। অতএব এই পরতত্ত্বই আমাদের পরম প্রয়োজন, পরম মূল্য—ভারতীয় দর্শনের 'পরমার্থ'। মার্শাল আর্বান বলেন—থিলোজফিয়া পেরেনিস্‌ বা পরদর্শন রিয়ালিজম, আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ইহাতে দুইটি স্বতঃসিদ্ধ কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। (১) আদিতে একটি পদার্থ আছে। (২) এই 'অস্তি' বা 'সৎ' পদার্থ আমরা জানিতে পারি। জ্ঞান-তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখিলে পরদর্শন, বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে অবস্থিত।

বার্গশঁ'র মতে জ্ঞানের প্রকৃত যন্ত্র হইতেছে আদিম সহজাত প্রবৃত্তি। বুদ্ধি এই নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-প্রবাহ বা এলান ভাইট্যালকে কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রহণ করিতেছে এবং জড়-জগৎরূপে তাহাকে দর্শন করিতেছে। অনন্তকালকেও সে দেখিতেছে খণ্ড খণ্ড করিয়া। কাজেই বুদ্ধিজ জ্ঞান আপেক্ষিক। ইহা ভিতরের জ্ঞান দান করিতে পারে না এবং ইহা অগ্রগতিশীল নহে। আমরা যদি আমাদের এই আদিম বৃত্তিকে (ইনস্টিন্‌ক্ট) স্বার্থহীন করিয়া অসীমতায় পরিণত করিতে পারি তাহা হইলে ইহাই ইনটুইশন বা বোধিতে পরিণত হইবে এবং সত্য-জ্ঞান দান করিবে।

জেম্‌স্‌-এর মতে আমাদের বেশীর ভাগ প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ও ভাবের প্রণালী প্রাণীজগতের খেলা ও স্বতঃ উৎসারিত অনুভূতির বিচিত্রতা হইতে উদ্ভূত। এগুলি থাকিয়া যায় যেহেতু তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে (Pragmatic) অধ্যাপক ডিউয়ী বলেন,—নিম্নস্তরের জীবদের পারিপার্শ্বিকের প্রতি যে প্রত্যাভিঘাত ও যাহা অনুভূতি-মূলক, মানুষের মধ্যে তাহা উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া পড়ে এবং চিন্তাতে পরিণত হয়। প্রজ্ঞা আমাদের পারিপার্শ্বিকের সহিত অভিঘাতে গৌণ ভাবে উদ্ভূত হয়। প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির কার্য্য পারিপার্শ্বিক বস্তুর প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা নহে—ইহার কার্য্য হইতেছে পারিপার্শ্বিকের সহিত আমাদের অধিকতর লাভজনক ও কার্য্যকারী সম্বন্ধ স্থাপন করা।

হোয়াইটহেড বলেন, চৈতন্য ও জড়কে পৃথক করা, দেহ ও মনকে ভিন্ন করা, প্রকৃতি ও আত্মাকে পৃথক করা—এ সমস্তই ভুল। সৃষ্টি এক এবং অখণ্ড। প্রতিটি সৃষ্ট পদার্থ অনুভব করিতে পারে এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে—তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়। পরস্পরের ভিতর এই সচেতনতা বা প্রিহেনশন্‌ কোথাও পরস্পরকে কাছে টানিয়া লয় কোথাও বা দূরে ঠেলিয়া দেয়। এইখানে হোয়াইটহেড আনিয়াছেন 'ইহা' (ইট) তত্ত্ব। এই 'ইহা' তত্ত্ব হইতেছে প্রতি বস্তুর 'সাবজেকটীভ এম'। এই 'ইহাই' প্রিহেনশন ঠিক করিয়া দেয় যাহার দ্বারা বস্তুর আকাঠন কার্য্যে আকর্ষণ এবং বর্জন ঘটিয়া থাকে। ইহা যেন শ্রীঠাকুরের তিনি তত্ত্বের মতই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই 'তিনি' তত্ত্বেই আমাদের জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। ইহার উর্দ্ধে আমাদের গতি অচল। কারণ সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টির উর্দ্ধে সর্ব্বত্রই তিনি অনন্তস্বরূপ—তাই জ্ঞানও অনন্ত। "তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, আরো কত কি" (শ্রীশ্রীঠাকুর)। এই "আরো কত কি" তত্ত্ব যে কি আমাদের বুদ্ধিতে তাহার এতটুকু আভাসও পাওয়া যায় না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের 'তিনি' তত্ত্বেই আমাদের জ্ঞানের পরিসমাপ্তি করিতে হইবে। এই তত্ত্বেরই ঠিক মত উপলব্ধি হইলে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় সব একাকার হইয়া যায় এবং তৎপূর্ব্বে উপলব্ধি যত হইবে অনন্তের পথ ও দ্বার তত্তই বিস্তৃততর ও গভীরতর হইতে থাকিবে।

মানুষের অহংকার যতক্ষণ আছে এবং তিনিই যখন জ্ঞানময় তপস্যার দ্বারা তাহার মনে জ্ঞানের বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছেন, ততক্ষণ সে জ্ঞানের জন্য ছুটিয়া বেড়াইবেই। কিন্তু প্রত্যেকটি জ্ঞানের পশ্চাতে যদি মানুষ তাঁহাকেই ধরিয়া থাকে, প্রত্যেকটি জ্ঞানের জন্য তাঁহাকেই প্রার্থনা জানায়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি জ্ঞানই সেই চরম জ্ঞানলাভের এক একটি ধাপ হইয়া উঠিবে এবং একদিন তাঁহাতেই যাইয়া মিলিত হইবে—যাহা হইতে জ্ঞানের সুরু তাঁহাতেই হইবে সমাপ্তি।

শেষ কথা পাইব বেদছন্দা মুখে। এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে জ্ঞানতত্ত্বের এক নূতন রূপ—আমাদের জ্ঞান

হইতেছে সম্বন্ধবাদী—আন্তর ব্যষ্টির সঙ্গে বহির্ব্যষ্টির সম্বন্ধ। কিন্তু আন্তরব্যষ্টি আন্তরসমষ্টির সঙ্গে ও বহির্ব্যষ্টি বহিঃসমষ্টির সঙ্গে অচ্ছেদে যুক্ত, তাই জ্ঞান আন্তঃ-বহিঃ ব্যষ্টি-সমষ্টি সম্বন্ধবাদী। এই জ্ঞান হিরণ্যগর্ভের জ্ঞানের (cosmicmind-এর) আংশিক প্রকাশ মাত্র।

জ্ঞানই প্রেম ! প্রেমের জন্যই, বিলাসের জন্যই তিনি বহু হয়েছেন। নিজেকে নিজের কাছে অচেনা করেছেন—আবার প্রেমেই নিজেকে নিজে জানেন, চিনে নেন। এই চেনা বা জানাই জ্ঞান। তাই সব জ্ঞানের রাজ্যে প্রেম থাকা দরকার—তবেই জ্ঞান পূর্ণ হয় সার্থক হয়। ...(বেদছন্দা)।

বেদান্ত দর্শন (ডাঃ রমা চৌধুরী), ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা (ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত), ভারত দর্শনসার (প্রোঃ উমেশ ভট্টাচার্য্য), ন্যায়দর্শন (সুখময় ভট্টাচার্য্য), সরল সাংখ্যযোগ (হরিহরানন্দ), পাতঞ্জল যোগদর্শন (হরিহরানন্দ), উপনিষদ (গম্ভীরানন্দ), গ্রীকদর্শন, Zeller—সুব্রত রায়চৌধুরী, Stephen—Metaphysics ; Twentieth century philosophy—Runes ; Joad ; Philosophy ; Philosophical Aspects—Russel ; Outline of philosophy ; Indian philosophy—Radhakrishnan—এই গ্রন্থসমূহের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।

আর কিছু চাইনেকো আমি

শান্তশীল দাশ

তোমাকে দেখিনি আমি, তবু 'তুমি নেই'
এ কথাতো ভাবতে পারি না।
কেউ যদি বলে, তুমি নেই,
তুমি এক অলীক কল্পনা—
মনের গোপন কোণে কী এক অস্পষ্ট ব্যথা
জাগে সেই কথা শুনে।
অনেক অনেক ক্ষণ সেই কথা এ মনের মাঝে
গুণ গুণ করা বাজে ; তারপর
ধীরে ধীরে ধীরে সে-সুর মিলিয়ে যায়।
আমার সে-বেদনার রেখা
থাকে নাকো আর এতটুকু।
আমি সুস্থ হয়ে উঠি ; ফিরে পাই
সেই প্রসন্নতা।

তোমাকে দেখিনি আমি ; তবু 'তুমি আছ'
এই কথা অন্তরে অন্তরে
গোপন ঐশ্বর্য হয়ে বাস করে একান্ত নিভৃতে।
যখনি সন্দেহ জাগে, তখনি বেদনা—
পেয়ে হারাবার ব্যথা সারা মন ছায়।

'তুমি আছ' এই কথা দিবসে নিশীথে,
কর্মে অবসরে আর নিদ্রা জাগরণে
উচ্চারিত হোক নিত্য আমার সত্তায়—
আর কিছু চাইনেকো আমি।

উত্তরণ

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পবননন্দন মহাবীর হনুমান
দিবারাত্র অবিরাম
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম ·
ভাবেতে বিভোর এই নাম গেয়ে যান।
আকস্মিক কোন প্রয়োজন মিটাবার আশে
আসিয়া সকাশে
এক ব্যক্তি মহাবীরকে শুধান—
আজি কি বার, কোন্ নক্ষত্র, কিবা আজ তিথি ?
প্রশ্নের উত্তরে
কহেন বিস্ময়ের সুরে—
ও কথা শুধায়োনা মোরে
সব কিছুর ঘটেছে বিস্মৃতি।
অহর্নিশি অষ্টপ্রহর
প্রভুর কৃপায় একসুর মনে বাঁধে ঘর
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম
কণ্ঠ হ'তে উসারিত মধুক্ষরা নাম।
খুঁটিনাটি জানার কুতূহল
করে নাকো মন চঞ্চল।
প্রভুর প্রসাদে বুঝেছে এই দাস
ধরে প্রতি শ্বাস
স্মরণ যখন হয় রাম জয় রাম
তখন অশুভ যত
অচিরেই হয় অপগত
বিধি কভু হন নাকো বাম।
তাই শ্রীরাম জয় রাম ছাড়া
কিছু নাহি জানি
অন্য কিছু জানিবার প্রয়োজন আছে
সে কথাও আমি নাহি মানি।
আজ বিজ্ঞানের নবীন তথ্য আবিষ্কৃত
মহাবীরের বাণী সমর্থিত।
যখন মানুষ মহাকাশে যায়
পার হয়ে পৃথিবীর সীমারেখা
অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দিন, রাত
কারো সাথেই হয় নাকো দেখা।
শুধু এক অতলান্ত অন্ধকারে
সংখ্যাহীন গ্রহতারা কক্ষপথে ঘোরে।
তখন মহাকাশচারীর মন চলে যায়
অন্য এক লোকে
যবনিকার অন্তরালে কি রহস্য লুকিয়ে আছে
দর্শনের শক্তি আসে চোখে।
বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কর্মযোজনা বিশাল
যার তিথির নিগড় নেথায় তুচ্ছ জঞ্জাল।
অখণ্ড আনন্দ যজ্ঞে সসীম, অল্প, খণ্ডের
গণ্ডী ক'রে অতিক্রম
মহান্, বৃহৎ, পূর্ণের টানে হয় সে ধাবিত।
আর দ্রুত, অতি দ্রুত
এক অক্ষয় উৎস হ'তে ঝরা অবিরত
কৃপার অমিয় বারি তারে করে গো সিঞ্চিত।
জানা, শোনা, বোঝা সব পিছে পড়ে থাকে।
কোন অজানা প্রবল শক্তি করে আবর্তিত তাকে।
অবিশ্বাস্য তাহার প্রভাব
মন হ'তে লোপ পায় সকল হিসাব
অপরাস্থিতি হ'তে তার হয়ে উত্তরণ
হয় পরম প্রতিষ্ঠায় তার নিশ্চিত স্থাপন ॥

আশ্বিন, মণিমন্দির ১৩৯০

বিশ্বকাপে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের মূল কথা

মাণিকবনের প্রিয় সাথীরা,

শ্রীসত্যানন্দ-প্রীতি-শুভেচ্ছা সকলে নিও।

আনন্দটা এক অদ্ভুত জিনিস ভাই! বিশেষ ক'রে যে আনন্দ সকলে পেয়েছে সেই আনন্দের কথাটা পরস্পর পরস্পরকে বলতে না পারলে আনন্দটা যেন পুরোপুরি উপভোগ করাই হয় না। আর সে আনন্দের সঙ্গে যদি নিজের দেশের মান-সম্মান জড়িয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এবার প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপ জয়ের ফলে সারা ভারতে যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল তার কথাই বলছি। তোমরা দেখনি—আমি দেখেছিলাম। ঠিক এই রকম আনন্দের জোয়ার বয়েছিল সেদিন সারা দেশে। সে আজ ৩৬ বছর আগের কথা। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট। সেও ঠিক রাত ১২টার সময়। ভারত তখন স্বাধীন হ'ল। ঘরে ঘরে আনন্দের শংখধ্বনি হতে লাগল। লক্ষ কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠল। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা পত্ পত্ ক'রে নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে উড়তে লাগল সব বাড়ীর ও প্রতিষ্ঠানের মাথায় মাথায়। রাস্তায় রাস্তায় সারারাত চলেছিল আনন্দ-মিছিল। ২৫শে জুন '৮৩ রাত ১২টায় ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের সুসংবাদে দেশবাসীর বুকে আবার যেন ঠিক তেমনি আনন্দের পরশ লেগেছিল। কারো চোখে ঘুম ছিল না। গভীর রাত পর্যন্ত এই আনন্দের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল ও দেশের উদ্দেশ্যে নানা জয়ধ্বনি আর পট্‌কা ফাটানোর সোচ্চার উচ্ছাসের মধ্য দিয়ে। কোথাও কোথাও বিজয় মিছিলও বের হয়েছে। ক্রিকেটে ভারতের মান যখন ধুলোয় লুটোচ্ছিল ঠিক তখনই ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জিতে নিজেদের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল বলে প্রমাণ ক'রে সারা বিশ্বের অভিনন্দন পেল। দুনিয়ার তাবৎ ক্রিকেট প্রেমিক মানুষ আজ ভারতকে সেলাম জানাচ্ছে। দেশের পক্ষে এ যে কত বড় গৌরবের বিষয়, আনন্দের বিষয়, সে কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে!

কিন্তু এখনও যেন বিশ্বাস হয় না! এমনই এক অঘটন ঘটাল ভারত। এমনই এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! কেউ ভাবতে পারেনি এমনটি ঘটতে পারে। কি ক'রে ভাববে বলো? বিশ্বকাপে খেলতে যাবার আগে পাকিস্তানের কাছে টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত যাচ্ছে-তাই ভাবে। তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজেও ৬-টা টেস্ট সিরিজ খুইয়ে এলো। প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রথম সুরু হয় ইংল্যাণ্ডে ১৯৭৫ সনে। প্রতি ৪ বছর অন্তর খেলাটা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা হয়েছে ১৯৭৯-তে। এই দুটো প্রতিযোগিতাতেও ভারত যোগ দিয়েছিল। একমাত্র ইষ্ট আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ জেতা ছাড়া গত দু'বারের সব খেলাতে ভারত হেরে গিয়েছিল। কাজেই এ-হ্যানো ভারতীয় দলের কাছে বিশ্বকাপ জয়ের আশা করা স্বপ্ন দেখার মতই অবাস্তব মনে হয়েছে সকলের কাছে। তাই ফাইনালের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। সেমি ফাইনালের অনেক আগেই বিদায় নিতে হবে ভারতকে এটাই ছিল সবার ধারণা। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। সকলের সব হিসেব গরমিল ক'রে দিয়ে ভারত অঘটনই ঘটাল। যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে হেরে এসেছে, প্রথমে তাকেই হারাল। এই হ'ল ভারতের প্রথম চমক্। জিম্বাবোয়েকে দু'বার হারাল। জিম্বাবোয়ের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের খেলায় ভারত তো প্রায় হারতে বসেছিল। ১৭ রাণে ৫টা উইকেট পড়ে গিয়েছিল। কপিল এসে হাল ধরল। ১৪টা ৪ আর ৭টা ৬ মেশান ১৭৫ রাণের এক অসাধারণ ইনিংস খেলে ভারতকে

জিতিয়ে দিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ফিল্ডিং খেলায় ভারত হারল। অষ্ট্রেলিয়ার কাছেও ভারত হারল। ক্রিকেট সমালোচকেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন—তাঁদের মনের ভাবটা হ'ল, হুঁ হুঁ বাবা, কি বলেছিলাম, ভারত কখন জিততে পারে? আমরাও ভেবেছিলাম এবার বোধ হয় সুরু হ'ল ভারতের সেই পুরনো রোগ—হারার পালা। ফিল্ডিং খেলায় ভারত হারাল অষ্ট্রেলিয়াকে। ভারতের দ্বিতীয় চমক্। ক্রিকেট পণ্ডিতরা ভারতকে তখনও কোন পাত্তা দিলেন না। ভাবলেন ওটা ফুকে কোন রকমে জিতে গেছে—বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেছে। এরপর 'A' গ্রুপের দুর্ধর্ষ ইংল্যাণ্ডকে যখন ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই শুইয়ে দিল ভারত, তখন সমালোচকেরা গম্ভীর হলেন। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। আর কোন্ মুখে বলবেন তাঁরা যে, ভারত ফুকে জিতে গেছে! ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব ইংল্যাণ্ডের মুখোমুখী হওয়ার আগের দিনই বলেছিল সগর্বে "ক্রিকেট খেলা কাকে বলে ইংল্যাণ্ডকে তা দেখিয়ে দেব।" আর তা দেখিয়ে দিয়ে সমালোচকদের মুখ সেলাই ক'রে দিয়েছে কপিলদেবের দল। ইংল্যাণ্ড গো হারান হেরে গেল ভারতের কাছে। কোথায় গেল মহাবীর ডেভিড গাওয়ার, এ্যালান ল্যাম্ব, কোথায় গেল ভয়ঙ্কর উইলিস, বথাম, ডিলি! দারুন অনুপ্রাণিত ভারতের সংহত যৌথ শক্তির কাছে সব যেন কড়ের খড়কুটোর মত উড়ে গেল। ভারত ফাইনালে উঠল। এই প্রথম। এ হ'ল ভারতের তৃতীয় চমক্। কিন্তু এবার তো বাঘের সঙ্গে লড়াই। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বাঘ। গত দু'বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান। এবারও বিশ্বকাপ জিতে হ্যাট্রিক ক'রে এক দুর্লঙ্ঘ্য দুর্লভ বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করার আশায় তারা মরিয়া। এবারের প্রতিযোগিতার ফিল্ডিং খেলায় ভারত ওদের কাছে হেরে যাওয়ায় ভারত সম্বন্ধে ওদের মনে বেশ একটু হাল্কা ভাব জেগেছিল। তাই ফাইনালে সেই ভারতকে বিপক্ষে পেয়ে ওরা মনে মনে বেশ খুশী হয়েছিল। ভেবেছিল এক ফুয়ে উড়িয়ে দেবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড টসে জিতেই ভারতকে ব্যাট করতে পাঠালেন। প্রথমেই আউট হলেন আমাদের সুনীল গাভাস্কার মাত্র ২ রাণে। ১১১ রাণের মধ্যে ভারতের ৬টা উইকেট পড়ে গেল। শ্রীকান্ত, মহীন্দর অমরনাথ, যশপাল, কপিলদেব ও কীর্তি আজাদ প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছে। তখন মনে হয়েছিল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই তৃতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হতে চলেছে। হ্যাট্রিক বিজয় ওদের সুনিশ্চিত। এরপর বিন্নি চলে গেল। পাতিল গেল। মদনলালও আউট। ভারতের রাণ তখন ৯ উইকেটে মাত্র ১১১। এইরকম রনের মুখেও শেষ জুটি কিরমানি আর সন্ধু সাহসের সঙ্গে লড়ল কিছুক্ষণ। তারা ২২টা মূল্যবান রাণ দিল ভারতকে। ফলে ভারতের রাণটা কিছু ভদ্রস্থ হ'ল। ১৮৩ রাণে সকলে আউট হয়ে গেল। সকলেই জানে দুর্দ্ধর্ষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কাছে এই সামান্য রাণটুকু কিছুই নয়—বিশেষ ক'রে যে দলে রাণ-মেশিন ভিভ রিচার্ডস, অধিনায়ক লয়েডের মত সব ব্যাট্সম্যানরা রয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজরাও ঠিক তাই ভেবেছিল। মনে করেছিল পিটিয়ে মাত্র কয়েকটা উইকেট খুইয়ে অনুকূল রাণ তুলে নেবে অনায়াসে। সেই মনোভাব নিয়েই ওরা খেলতে নামলো। ভিভ রিচার্ডস তো নেমেই মদনকে এমন পিটোতে সুরু করল যে, মনে হ'ল রিচার্ডস বোধ হয় ৩০ ওভারেই খেলা শেষ করতে চাইছে। জানে না মদনলাল যত মার খায় তত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মদনলালই নিল রিচার্ডসকে ৩৩ রানের মাথায়। রিচার্ডসের ক্যাচটা কপিল ধরেছিল। মাত্র ১৮৩ রাণের সামান্য পুঁজির প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারতীয় দল যে ফিল্ডিং-য়ে বোলিং-য়ে সবেতেই এমন অনুপ্রাণিত হয়ে, সকলেই এমন মন প্রাণ এক ক'রে লড়বে, কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না, এ শুধু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কেন কেউই ভাবতে পারেনি। যাইহোক, রিচার্ডসের পর ল্যারী গোম্স্ গেল, লয়েডও চলে গেল। ৬৬ রাণে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ শিবিরে তখন হাহি হাহি রব। দেখা গেল চাপের মুখে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভেঙে পড়ে। তাই হল। এরপর দুজো আর মার্শাল খানিকটা মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। ওরা আউট হতেই মাত্র ১৪০ রাণে সব শেষ। মদনলাল ১১ রাণে ৩টি আর অমরনাথ ১২ রাণে ৩টি উইকেট নিয়েছে। এরা

কেউ বিশ্বের নামী সেরা বোলার নয়, কিন্তু কি অসাধারণ বোলিং করলো আজ। অমরনাথ ম্যান অব্ দা ম্যাচ নির্বাচিত হলেন। ভারত ৪৩ রাণে জিতে বিশ্বকাপ ছিনিয়ে নিল। ভারত চমক দিল বিশ্বকে। সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল ভারতের এই অসাধারণ অবিস্মরণীয় জয়ে। খেলার শেষে লণ্ডনে সেদিন ভারতীয়দের কি সম্মান! ওখানকার সব দেশের মানুষ এমনকি ইংরেজরাও যে কোন ভারতীয়কে পথে দেখেছে তারই সঙ্গে করমর্দন (হ্যাণ্ডশেক) ক'রে অভিনন্দন জানিয়েছে।

কিন্তু এমন অঘটন ভারত কি ভাবে ঘটাল? এর মূল রহস্য কোথায়? জিম্বাবোয়েকে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে দু'বার হারাল। অষ্ট্রেলিয়াকে হারাল। ইংল্যাণ্ডকেও হারাল। এতগুলি শক্তিশালী দলকে একের পর এক হারান কি কাকতালিয় ঘটনা? তালেগোলে ঘটে গেছে? তাহলে শোনো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের এক কালের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাট্সম্যান স্যার গ্যারী সোবার্স এই জয় সম্পর্কে কি বলেছেন। তিনি বলেছেন,—"ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় অঘটন। তবু এই জয়লাভ আগাগোড়া ভারতের প্রাপ্য ছিল। ভারত প্রমাণ ক'রে দিয়েছে তাদের এই জয়লাভ নিছক আকস্মিক ঘটনা নয়। ভারতের খেলার মধ্যে একটা সঙ্গতি ছিল এবং বিশ্বকাপের শেষে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রতিযোগিতায় তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ দল।" এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, ভারত হঠাৎ একটা কিছু ক'রে ফেলেছে নয়, আগাগোড়া রীতি মত ভাল খেলেই ভারত জয়ের মুকুট পরেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে। আর এই জয়ের মূল রহস্যটি আমাদের অধিনায়ক কপিলদেবের মন্তব্যে ফুটে উঠেছে খুব স্পষ্টভাবে। কপিল বলেছেন— "খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের মধ্যে এমনই এক আত্মবিশ্বাস জেগেছিল যা আমরা আগে কখনও অনুভব করিনি।" এই—এইটাই হল জয়ের মূল কারণ—কপিলদেব যা বললেন—"আত্মবিশ্বাস"। বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যে যে গভীর আত্মবিশ্বাস জেগেছিল সেটাই ছিল এই অঘটনের মূল রহস্য। অধিনায়ক হিসেবে কপিলদেবের এখানেই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, তিনি নিজের মধ্যে তো বটেই, দলেরও প্রত্যেকের মধ্যেই এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই ১১ জন খেলোয়াড়ই এক মন এক প্রাণ হয়ে খেলতে পেরেছিল। আর তারই ফলে দলের সহজ শক্তি এমন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেল যে ক্রিকেট দুনিয়াকে তা কাঁপিয়ে দিল।

আগামী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তান টেষ্ট সিরিজে ভারত যদি এই আত্মবিশ্বাস দেখাতে পারে তো সেখানেও সাফল্য সুনিশ্চিত। আশা করি, ভারত তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ লড়বে।

এই খেলা আমাদের একটা মূল্যবান শিক্ষা দিল। তা হ'ল—আত্মবিশ্বাস। নিজের ওপর, নিজের ক্ষমতার ওপর, শক্তির ওপর যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে সব কাজেই সফল হওয়া যায়। এই শিক্ষাই সোচ্চারে ঘোষিত হ'ল ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়ের মধ্য দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে আমাদের বারবার সচেতন করেছেন। বলেছেন, "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।" পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সব কিছু করিতে পারো। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ হয়।" "অতএব আত্মবিশ্বাসী হও।" "সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা করো।" "নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে—এইটি জানো এবং ঐ শক্তি অভিব্যক্ত কর।" অর্থাৎ প্রকাশ করো, জাগিয়ে তোলো। আত্মবিশ্বাসের অভাবেই আজ আমাদের সব দিকে এমন দুর্গতি। দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার মহা আবির্ভাব লগ্নে মার চরণে আমাদের তাই একান্ত প্রার্থনা—তিনি কৃপা ক'রে আমাদের ভেতর এই আত্মবিশ্বাস জাগাবার প্রেরণা দিন, জাগিয়ে দিন। জয় মা। জয় ঠাকুর।

—:০:—

তোমাদের—বন্ধু মহুর

উভয়লিঙ্গ 'নির্বাণ'

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

('শূন্য'-নির্বাণ বনাম 'ব্রহ্ম'-নির্বাণ)

বৌদ্ধনির্বাণ ও ব্রহ্মনির্বাণ ঃ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বৌদ্ধ-'নির্বাণ' ও বেদান্তদর্শনের 'ব্রহ্মনির্বাণ' সমার্থবাচক। শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা এ-বিষয়ে কিছু অনুশীলন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভাবতেও কষ্ট হয় যে, সমাক্ সম্বুদ্ধ তথাগত বুদ্ধদেবকে আমরা দশাবতারের মধ্যে স্থান দিয়েও, তাঁর প্রচারিত 'সনাতন'-ধর্মকে ভারত থেকে নির্বাসিত করেছিলাম। 'অহিংসা'র ধর্মকে আমরা হিংসার দ্বারা বহিষ্কার করেছিলাম। অথচ আচার্য শঙ্করকে আমরা 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ' বলে বরণ করে নিয়েছিলাম, যদিও শঙ্করের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ ভিত্তিক শারীরক ভাষ্যের প্রতিপাদিত নির্বিশেষ ব্রহ্মনির্বাণের সঙ্গে বুদ্ধের শূন্যবাদ ভিত্তিক নির্বাণ মুক্তির কোনো যুক্তিসহ প্রভেদ প্রতিপাদন করা যায় না। গীতার সংজ্ঞায় যা 'ব্রাহ্মী-স্থিতি' তারই অপর নাম বৌদ্ধদর্শনের সংজ্ঞার 'ব্রহ্মবিহার'।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।

(গীতা, ২/৭২)

এই 'ব্রহ্মনির্বাণ', কে লাভ করেন,—তা তার পূর্ব শ্লোকেই বলা হয়েছে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

(গীতা, ২/৭১)

এই শান্তির পূর্ণতায় ভূমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়—যাকে গীতা বলেছেন—"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্" (গীতা ৬/২১)। এবং "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ (গীতা, ৬/২২) ঐ অবস্থায় "দুঃখ সংযোগ বিয়োগ" তো হয়ই উপরন্তু "সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শং অত্যন্তং সুখমশ্নুতে"। কিন্তু এই অসমোর্ধ্ব অত্যন্ত সুখকর ব্রহ্মানন্দের সাধনার উপায় বলতে গিয়ে গীতা বলেছেন ঃ—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ

—(গীতা, ৬/২৫)

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে—এই "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—ইহা শূন্যধ্যান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই 'শূন্য ও পূর্ণ' উভয়ই এক অনির্বচনীয় অবস্থার দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র—যার অর্থে কোনো ভেদ প্রতীতি হয় না, কেবল বলিবার বা বুঝাইবার ভঙ্গীর ভেদমাত্র প্রতীতি হয়। বুদ্ধ শূন্যকে বলেছেন "শূন্যং শূন্যং সর্বলক্ষণম্ সর্বলক্ষণম্" অর্থাৎ সমস্তই এক শূন্যে পর্যবসিত,—সমস্তই স্বলক্ষণ অর্থাৎ আপন আপন বিশিষ্ট লক্ষণে পরিচিত হয়।

সমস্তই 'ক্ষণিকং ক্ষণিকং—দুঃখং দুঃখং' হলেও দুঃখাতীত অবস্থা একমাত্র শূন্য। বিচার করলে দেখা যায় যে, শূন্য, নির্বাণ, মুক্তি ও কৈবল্য—একই অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধের নির্বাণ এক 'শূন্য' বা অভাব পদার্থ,—বেদান্তের নির্বাণ বা ব্রহ্মনির্বাণ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ভাবপদার্থ। আনন্দ রূপং অমৃতং যদ্বিভাতি।"

সুষুপ্তিতে 'ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্' অবস্থায় কেবল 'সুখমহমস্বাপ্সম্' রূপ প্রতীতি মাত্র থাকে,—এই সুষুপ্তিও শূন্যের প্রতীক, কৈবল্যের বা নির্বাণেরও প্রতীক। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—দর্শন-দৃশ্য-দ্রষ্টা এই ত্রিপুটীর লয় হয়। যা থাকে, সেই স্মৃতি বা প্রতীতি, অনির্বচনীয়। এ-অবস্থায় সদর্থক ও নঞর্থকের ভেদ লোপ পায়। তাই গীতায় বলা হয়েছে,—

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥

(গীতা, ১৩/১২)

তাহাকে সৎ (ভাব পদার্থ) বা অসৎ (অভাব পদার্থ) এই দুইয়ের কোনোটির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তবে তখন সকল ভেদ বিভেদ সূচক সকল বিশেষণ-ই এক বিশেষ্যে একীকৃত হয়—"পল্লসামর্ণব ইব" (মহিম্নস্তোত্রম্), গীতা বলেন,—(১৩।৩১) "যদাভূত পৃথক্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥" এই 'একস্থ' হওয়াকে শূন্যই বা পূর্ণই যাহাই বলা হোক তাহা—সেই একমাত্র 'কেবল' অবস্থা বা কৈবল্যকেই বুঝায়। সাংখ্যও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করেছেন, বলেছেন,—"বিশুদ্ধং 'কেবলম্' উৎপদ্যতে জ্ঞানম্।" এ-অবস্থায় নানার বা বহুত্ব থাকে না। বেদান্তের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়। তখন,—"নাস্তি, নাস্তি, নাহম্ ইত্যপরিশেষম্ অবিপর্যয়াদুৎপদ্যতে বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম্"—অর্থাৎ অহংতা অস্মিতা-মমতা দূর হলে অবিদ্যাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান—'কেবল জ্ঞান' বা কৈবল্যের উদয় হয়।

যজ্ঞ ও হিংসা : মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনি বললেন,—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাম্" অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডই প্রধান আর সব অপ্রধান বা অনর্থক। উত্তর মীমাংসা ও উপনিষদ্‌সার গীতা বললেন যাঁরা "ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে" তাঁরা "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" (৯।২১), পুনরায় জন্মমৃত্যুর গতাগতি চক্রপথে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হন। কিন্তু যজ্ঞবাদীরা এই যজ্ঞের সঙ্গে পশুবধে এমনভাবে মেতে উঠলেন যে সম্ভূতির পুত্র রাজা রন্তিদেবের যজ্ঞনিহত পশুদের চর্ম হতে যে রসরক্ত ক্লেদ নির্গত হত,—তা থেকে একটা নদী উৎপন্ন হয়,—যার নাম চর্মণ্বতী (চম্বল)। তাঁর গৃহে এত অতিথি সমাগম হত যে প্রত্যহ বহু সহস্র পশু বধ করতে হত। শাস্ত্রের মধ্যেও লৌকিক প্রভাব পড়ে, তাই বিধান হয়ে গেল—"যজ্ঞে বধঃ=অবধঃ" অর্থাৎ যজ্ঞে যে বধ করা হয় তা হিংসাত্মক বধ নয়,—সেই বলিপ্রদত্ত জীবের আত্মার সদ্‌গতি হয়।

বুদ্ধের আবির্ভাব কাল : এইভাবে স্বর্গ কামনার তথা পুণ্য কামনার যখন তৎকালীন ব্রাহ্মণ পুরোহিত যাজ্ঞিকগণ পশুহিংসার নিষ্ঠুরতায় উন্মত্ত, তখন শাক্য রাজবেশে আবির্ভূত হলেন—শান্ত মন্ত্রে অনন্তপুণ্য করুণাঘন তথাগত বুদ্ধ, স্বীয় তপস্যায় ধরণীতলকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্য। তাঁর অমৃতবাণীর দ্বারা মানবহৃদয়ের মধুনিষ্যন্দী প্রেমপদ্ম বিকশিত করবার জন্য,—গীতার প্রতিশ্রুতি পালন করতে—ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে তিনি অবতীর্ণ হলেন।

বর্ণের গণ্ডিতে বহুধা-বিভক্ত ভারতবর্ষ সেদিন মানবতা বোধে জাগ্রত হয়ে স্বীকার করেছে সকল মানুষকেই। তাই তাঁর বাণী ও ধর্ম অবাধে প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে—তিব্বত, চীন, সিংহল, মোঙ্গল, ব্রহ্মদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এমনকি সুদূর জাপান পর্যন্ত।

বিশেষস্থানে স্তূপ-চৈত্যাদি নির্মাণ করে মন্ত্র পড়ে আগুনে ঘি পুড়িয়ে পশু বধ করে নানা বিচিত্র বিধানে যখন মানুষ ঊর্ধ্বগতি সন্ধান করছিল—দিশেহারা হয়ে,—তখনই বুদ্ধ এলেন তাঁর—বিশ্বমৈত্রী, অহিংসা, নিঃস্বার্থ প্রেম ও তৃষ্ণা (বা 'তন্হা') ক্ষয় দ্বারা মুক্তির উপায় প্রদর্শন করতে।

বুদ্ধের উপদেশ : তিনি শীলসাধনা ও মৈত্রীভাবনা দ্বারা ব্রহ্মবিহারের পথ নির্দেশ করে খাঁচার পাখিকে মুক্তাকাশে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। 'মাতা যথা নিজং পুত্তং' মা যেমন নিজের পুত্রকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন তেমনি অপরিমেয় মৈত্রী ও করুণা সমস্ত জগতের প্রতি, এমন কি শত্রুদের প্রতিও—আপন অন্তরে জন্মাইতে এবং তাহাই আমাদের নিত্যকার ব্যবহারে প্রয়োগ করতে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

ধ্যানপঞ্চক : তিনি পাঁচ প্রকার ধ্যান উপদেশ করেছেন :

১। বিবেক বিচারের ধ্যান দ্বারা অপ্রমত্ত চিত্তে আপনাকে সকল আপাতমনোরম ক্ষণিক বিষয়সুখের 'তন্হা' বা তৃষ্ণা থেকে মুক্ত করা এবং 'আত্মৌপম্যেন'—নিজের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবকে সাম্যদৃষ্টিতে দর্শন করা (গীতা ৬/৩২)।

(ধম্মপদ অপ্পমাদ বগ্‌গো—৭)

২। করুণার ধ্যান—'আর্তিং প্রপদ্যোঽখিল দুঃখভাজাম্,' অখিল জনের দুঃখের অংশ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করা ও তাদের দুঃখলাঘবের জন্য চেষ্টা করা।

(শ্রীমদ্‌ভাগবত—৯/২১/১২)

৩। প্রেমের ধ্যান—সকলের প্রতি মৈত্রী ও প্রীতিবশঙ্গ, —সকলম তর্পণের মত,—'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু'—

ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হোক্, এইরূপ ভাব জন্মানো।

৪। শান্তির ধ্যান,—সকল দ্বন্দ্ব—ভালোমন্দ সুখ দুঃখ, নিন্দাস্তুতি জয়-পরাজয় থেকে আপনাকে 'স্থিতঃ প্রজ্ঞস্য হিমবানিবাচলঃ—অচলপ্রতিষ্ঠ করে মনকে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত শান্ত স্থির রাখা। 'আপূর্যমানমচল প্রতিষ্ঠং—(গীতা—২/৭০) অবস্থা।

৫। আনন্দ ধ্যান—সকলের সুখে সুখী হয়ে নিস্বার্থ নিরাসক্তভাবে পরার্থপরতার উচ্চতর আনন্দ অনুভব করা।

ধম্মপদে বুদ্ধ বলেছেন,—

নত্থি রাগ সমো অগ্‌গি নত্থি দোষ সমো গহো
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তণ্হা সমা নদী।

অর্থাৎ আসক্তির সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের মত হিংস্র গ্রাসকারী জন্তু নাই,—মোহের মত জাল নাই, তৃষ্ণার সমান দুস্তর নদী নাই,—তৃষ্ণা হতেই শোক-ভয়, আসক্তির উন্মূলনই দুঃখত্রাণের চাবিকাঠি (গীতা—৩/৩৭)।

মানব মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান প্রজ্ঞা। শুধু তথ্য বা তত্ত্বজ্ঞান নয় সারাজীবনের সর্বাঙ্গীণ সংযম ইহার সাধনা এবং সদ্‌ধর্মের আচরণ ;—যথা দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য ও ধ্যান ইহার লাভের উপায়। (গীতা—৪/৩৩-৩৮)।

এই মহামানবের সমগ্র জীবনে,—মহাভিনিষ্ক্রমণ থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত,—একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মানবের দুঃখত্রয় উপশমের জন্য নির্বাণলাভের উপায় নির্দেশ করা। তাঁর সংকল্প ছিল,—

'আমি যেন,—অনাথগণের নাথ, যাত্রিগণের পথপ্রদর্শক, পারঙ্গামিগণের নৌকা, তরণেচ্ছুগণের সেতু, দীপার্থিগণের দীপ, শয্যার্থিগণের শয্যা এবং দাসার্থিগণের দাস হই'। ('বুদ্ধের চরিত'—পৃঃ ১৮ শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত)।

ধম্মপদে বুদ্ধ বলেছেন—পঞ্চস্কন্ধের মত পাপ নাই,—বিশ্বাসই পরম আত্মীয় এবং 'নির্বাণং পরমং সুখম্' (ধম্মপদ, সুখবগ্‌গো ২০৩, ২০৪ সূত্র)।

'পঞ্চস্কন্ধ' পারিভাষিক শব্দ—তার অর্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধের সংস্কার যখন মুক্ত হয়ে, এবং ধর্ম প্রীতি রস পান করেই 'নির্বাণ' সুখ পাওয়া যায় (ধম্মপীতি রসং পিবং') এই সূত্রকে তিনি বলেছেন 'অমতোগধং—অমৃতাবগাধং বা গাঢ় অমৃত।

ধম্মপদ, বুদ্ধ বগ্‌গো ১৯০-১৯২ সূত্রে, বলা হয়েছে,—যদি কেহ বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সঙ্ঘের শরণ লয়,—এবং চারিটি আর্যসত্য (যথা : দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের অতিক্রম, ও দুঃখোপশমের অষ্টাঙ্গ মার্গ)-কে সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দেখে তবে ইহাই নিরাপদ আশ্রয়,—ইহাই উত্তম আশ্রয়, ইহা অবলম্বন করিলে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ('ধম্মপদ'—ভিক্ষু শীলভদ্র, চতুর্থ সংস্করণ, ১২১ পৃঃ)।

অট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং বা অষ্টাঙ্গ মার্গ যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত বা ব্যবসায়,—সম্যক্ আজীব বা উত্তম জীবিকা,—সম্যক্ ব্যায়াম বা উত্তম চেষ্টা,—সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—অর্থাৎ ধ্যান এই আর্টটিকে অষ্টাঙ্গ মার্গ বলা হয়।

ব্রাহ্মণ বগ্‌গে—(ধম্মপদ ৪১১ সূত্র), 'অম তো গধং (= অমৃতাবগাধং গাঢ়ামৃতং অর্হৎপদমিত্যর্থঃ) যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন,—যিনি তৃষ্ণা জয় করেছেন ও সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করে অমৃত পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলি। তাঁহার কৃত ব্রাহ্মণের এই সংজ্ঞা আজও সর্ববাদিসম্মত সন্দেহ নাই। তিনি 'জাতি ব্রাহ্মণ' বা জন্মগত ব্রাহ্মণকে—বলেছেন ভো-বাদী—অর্থাৎ হে মহাশয় 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ কথনশীল। (ধম্মপদ ৪১৯ সূত্রে) তিনি অকিঞ্চন, অনাদান, ধ্যানসমাধিরত, অবিদ্যাতীত, শীলবান্, তৃষ্ণাহীন, ভয়শূন্য, পাপমুক্ত, শান্ত, প্রসন্ন, চতুরার্যসত্যে প্রতিষ্ঠিত গম্ভীরব্রত মারজিৎ মহর্ষিকে সুগতভুক্ত এবং ব্রাহ্মণ বলেছেন,—'তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।'

বুদ্ধের একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ জীবসেবা,—এবং আধ্যাত্মিক স্তরে ব্রহ্মবিহার-এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে স্মরণীয় গীতা-র ৬ অ/২৯, ৩১, ও ৩২ শ্লোকগুলি,—সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি,—ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।' 'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ, সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে। 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন,—সুখং বা যদি বা দুঃখং স

যোগী পরমো মতঃ।' তুলনা করলে দেখা যাবে বুদ্ধের 'ব্রহ্ম বিহার' গীতার উপরি-উক্ত শ্লোকগুলি এবং ঈশোপনিষদের ৬ এবং ৭শ্লোক,—একই সত্যের, একই তত্ত্বের জ্ঞাপক,—কেবল ভাষার পরিচ্ছদে বিভিন্নরূপে প্রকাশ মাত্র।

এই উপলব্ধি না থাকলে বুদ্ধের জীবসেবা—বর্তমান কল্পযুগের একটা প্রাণহীন চাকা ঘোরানো প্রথা মাত্রে পর্যবসিত হ'ত।

আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির উপদেশ বুদ্ধের বাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ বা প্রাধান্য পায়নি কিন্তু তাই বলে আত্মা বা ব্রহ্মের স্বীকৃতি নাই একথা সমীচীন বলে মনে হয় না। না হলে স্কন্ধদের তাঁর 'ব্রাহ্মণ ক্যুগ'-র নাম এবং তত্ত্বকথাগুলি ভিত্তিহীন হয়ে পড়ত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞার ভিন্নতা নিবন্ধন ভ্রান্তি বা ভেদ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়।

আত্মা ও অনাত্মা :—বেদান্ত যে অর্থে 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করেন বৌদ্ধদর্শন সে অর্থে করেন না। মিলিন্দ-পঞ্হের নাগসেন-মিলিন্দার কথোপকথনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিলিন্দা প্রশ্ন করলেন, (নাগসেনকে)—"নাগসেন কে?" নাগসেন উত্তর দিলেন,—"শরীর, চিত্তাদির সমষ্টিই নাগসেন।" বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত পুদ্গলাত্মক-দেহাভিমানী জীবকে আত্মা বলেন। বেদান্ত তাহাকে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ সমন্বিত অবিদ্যোপহিত জীবাত্মা বলেন। রক্ত মাংসের দেহ (পুদ্গল)-রূপ পুত্তলিকায় আত্মবোধ বা আত্মাভিমান-অবিদ্যার সৃষ্টি। বেদান্তের আত্মা শুদ্ধবুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ 'অদ্বয় ব্রহ্ম'—বা ব্রহ্মের চিৎকণ বা স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ, গীতার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫/৭) তাই ব্রহ্মাত্মা বলেন "অহমেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্।"

বৌদ্ধেরা বলেন 'তৃষ্ণা' বা 'তহা' ক্ষয় হলে তবে 'নির্বাণ' হয়,—গীতাও তাই বলেন—নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ (৬/১৮) 'শান্তিং নির্বাণপরমাং' (৬/১৫) লাভ করেন (৫/২৪-২৫-২৬) —যাঁরা অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, কাম ক্রোধ বিমুক্ত এবং সর্বভূতহিতে রত হ'য়ে, শান্তি পাবার এই পথে, এই ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রহ্মবিহার যদি অন্তিমকালেও লাভ করেন তাহলে তাঁদের ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি হয় (গীতা ২/৭২)।

সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে গীতার ব্রহ্মনির্বাণ, সাংখ্যের কৈবল্য এবং বৌদ্ধের নির্বাণ একই জীবন্মুক্ত অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। বাচক বিভিন্ন হলেও বাচ্যার্থ এক এবং অভিন্ন।

বৌদ্ধেরা যাকে পঞ্চস্কন্ধের অতীত অনাত্মবোধ,—নির্বাণ বা অসঙ্খত ধাতুরূপ অনন্ত অনুদ্দেশ্য অসীম অগাধ অনিমিত্ত অপ্রণিহিত অমৃতময় শূন্য, বলেন,—তাহাই বেদান্তের 'ব্রহ্মনির্বাণ, 'সর্বভূত হিতেরত' আনন্দময় প্রসন্নাত্মার অবস্থা।

মাণ্ডুক্য শ্রুতি তাকেই বলেছেন,—"অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" ইহার ইঙ্গিত আরও পাওয়া যায়—

অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবসি।

(বরাহ পুরাণ ৪/১৮)

উত্তর গীতা (মহাভার)-য় বলা হয়েছে,—

সর্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত কর্মণাং॥ (১০)

সত্ত্বরজস্তমোবর্জিত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মই 'ত্রিশূন্য'।

ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্
সর্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥ (ঐ ৩৩)
শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (ঐ ৩৪)

তাই আমি শূন্যবাদ সম্বন্ধে 'তথাগত বোধিসত্ত্ব' কবিতায় বলেছি,—

"শূন্যবাদ নহে শূন্য,—অগাধ অমৃত করি পান
প্রেম-মৈত্রী-করুণার তথাগত মহামহীয়ান্,—
অনির্বচনীয় তত্ত্ব, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-জ্ঞান-একাকারে
মিলাইলে সে-অতলে কি রহিল কে বলিতে পারে?"

তাঁর উপদেশের সারমর্ম আমি সংক্ষেপে বলেছি,—

"প্রেমমূর্তি তুমি তপোধনে !
ক্ষমা ক্ষেম সাধনায় পরিপূর্ণ করিলে ভুবন।
মন্ত্রে তন্ত্রে যাগযজ্ঞে পশুরক্তে মুক্তি নাহি হয়
'আত্মদীপ' হও সবে সুখতৃষ্ণা 'তৃষ্ণা' কর ক্ষয়
এই মহামন্ত্র তব,—বাসনার নির্বাণে 'নির্বাণ,'
উন্মুক্ত আকাশে মুক্তি মুক্তপক্ষ পক্ষীর সমান।"

শূন্য ধ্যানের কথা উল্লেখ করেছি। 'শূন্য' যোগীরও পরম ধ্যেয় পদার্থ। শূন্য প্রত্যক্ষ হলে 'ত্রিপুটী'র নাশ হয়, —যুষ্মদ-অস্মদ্ প্রত্যয় তিরোহিত হয়, অস্তি-নাস্তি বলিবার কেহ থাকে না,—এখানে অস্তি নাস্তির সমন্বয়। "নসৎ তন্নাসদুচ্যতে" (গীতা, ১৩।১২) ভাব ও অভাবেরও সমন্বয়। বুদ্ধদেব শূন্যের বর্ণনা করতে অক্ষম হয়ে বলেছেন,— "অনক্ষরস্য ধর্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা" ? শ্রুতিও তাই বলেছেন,—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। বৌদ্ধদর্শনে এই পদার্থটিকে—'অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত ও অবিজ্ঞপ্তিক" বলা হয়েছে। (ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, 'মধ্যমক', ভিক্ষু শীলভদ্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়)।

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্য সুভূতিকে বলেছেন এই শূন্যতা 'গম্ভীর',—অক্ষর 'অপ্রমেয়', 'অগাধ'। বৌদ্ধাচার্য শান্তিদেব বলেছেন 'শূন্যতা'-দুঃখ-শমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্ ?"

বুদ্ধদেব বলেছেন—সুভূতিকে,—
"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্",
"শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রমেয়মিতি"।
"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপি তে"।
এবং, শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য, শূন্যং বহির্গতম্
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্ ॥

অর্থাৎ—"আধ্যাত্মিক জগৎ শূন্য বলিয়া দেখ, বাহ্য জগৎ শূন্য বলিয়া দেখ,—যিনি শূন্যতা ভাবনা করিবেন তিনি নিজেকেও শূন্য বলিয়া ভাবিবেন। শূন্যবাদ—'শুষ্ক' এবং 'কেবল',—কিন্তু ইহা শুষ্ক নয়, ইহা যোগী এবং দার্শনিকের শিরোরত্ন মানব চিন্তার আকাশবৎ সর্বোচ্চ এবং সর্বব্যাপী বিশ্রাম স্থান। তবে শাণ্ডিল্য নারদ আদি ভক্ত্যাচার্যগণ-এর চেয়েও উচ্চতর স্থান দেন ভক্তিলভ্য আনন্দের পঞ্চম পুরুষার্থকে, কিন্তু তার প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

নির্বাণের স্বরূপ —এই নির্বাণ বা শূন্য, ফাঁকা বা vacuum পদার্থ নয়, তাও মিলিন্দ পঞ্হ ও ধম্মপদে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে 'একান্ত সুখং' 'পরম্ সুখং' 'অমৃতাবগাহম্' বা একান্ত অগাধ গভীর আনন্দময় অবস্থা বলা হয়েছে।

সুতরাং মায়িক বা প্রাকৃত গুণের যে ঔপাধিক শূন্যতা তাই আবার অপরদিকে অপ্রাকৃত অলৌকিক অনির্বচনীয় পরম সুখ বা আনন্দের পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ একই অবস্থা একদিকে শূন্য, অপরদিকে পূর্ণ শব্দের বাচ্য। কবি টেনিসনের ভাষায় :

Rain—Rain and Sun a rainbow on the lea
Truth is this to me and that to thee.

একই প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে কেউ দেখছেন রামধনু ইন্দ্রধনু-রূপে আর কেউ বা বিজ্ঞানের চোখে জলীয় বাষ্পের পুঞ্জে শুভ্র আলোকের প্রতিসরণের ফলে—তাকে সপ্তবর্ণের কালী-রূপে দেখছেন।

স্বয়ং বুদ্ধ সুভূতিকে বলেছেন যে যাহা শূন্য তাহাই অক্ষয়, অপরিমেয়, অগাধ, 'অসঙ্খ্যেয়' অসীম। শ্রুতি বলেছেন "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" অস্থূলং অনণু অহ্রস্বং, অদীর্ঘং ইত্যাদি।

আকাশতত্ত্ব ॥ এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয় বেদান্তের আকাশ-তত্ত্ব। আকাশকে আমরা শূন্যও বলি অনন্তও বলি। তাই আকাশ ব্রহ্মেরও পর্যায় বিশেষ। 'পরমং ব্যোমন্'—বলেছেন শ্রুতি। ভগবান বুদ্ধও বলেছেন—অপ্রমেয়মিতি বা অসংখ্যেয়মিতি বা, অক্ষয়মিতি বা, শূন্যমিতি বা……অভাব ইতি বা বিরাগ ইতি বা নিরোধ ইতি বা নির্বাণমিতি বা। সুতরাং এই সমস্ত বচন একই বস্তু বা অবস্তুকে, একই ভাব বা অভাব পদার্থকে একই বাচ্য বা অবাচ্য তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে। এই শূন্যকে অমিতা বা অসীম, পনীতা বা সর্বোত্তম, লোকুত্তরা বা লোকোত্তর বা অলৌকিক প্রভৃতি বিশেষণেও বিশিষ্ট করা হয়েছে।

সাধনোপায় : এই অবস্থা প্রাপ্তির সাধনোপায়ও

বিজ্ঞানসম্মত। চিকিৎসা বিজ্ঞান যেরূপ চতুর্ব্যূহ ইহার সাধনাও সেইরূপ। যথা :—রোগের নিদান বা হেতুভূত উপাদান, রোগ বিজ্ঞান বা রোগের স্বরূপ, রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা এবং তার পরে আরোগ্য বা অনাময় অবস্থা লাভ।

অপরপক্ষে দুঃখের হেতু, দুঃখের স্বরূপ জ্ঞান, দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় এবং সর্বশেষে কৈবল্য (সাংখ্যে) নির্বাণ বা শূন্যাবস্থা (বৌদ্ধদর্শনে) অথবা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ (বেদান্ত দর্শনে) নামে ইহাই বর্ণিত হয়েছে বিবিধ দর্শনে।

শূন্যধ্যান। অনির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্তা এবং "অচিন্ত্যাক্ষরব্যাপকাব্যক্তত্ব"-রূপে। **জ্ঞান সংকলিনী** তন্ত্রে এই শূন্য ধ্যানকেই প্রকৃত ধ্যান বলা হয়েছে :—

"ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ"—অর্থাৎ সাকার সগুণ চিন্তা প্রকৃত ধ্যান নয়, "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ" —মনের সংকল্প শূন্য অবস্থাই প্রকৃত ধ্যান।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রেও তাই বলা হয়েছে :

শূন্যন্তু সচ্চিদানন্দং নিঃশেষং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।

চিত্ত যখন বিষয়সংস্কারহীন ও সর্বপ্রকার বিশেষত্বহীন হয়ে শূন্যাকার ধারণ করে,—তখন সেই নিঃশেষ নির্বিশেষ জ্ঞানের অবস্থারই নাম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

যোগবাশিষ্ঠ বলেছেন,—

সর্বচিন্মাত্রসা শুদ্ধস্য শূন্যস্য চ কিমন্তরম্।
বচ্চাত্তরং তদ্বিদ্বদ্ধো বিদন্ত্যেতি ন বাগ্‌গতিম্॥

শুদ্ধ চৈতন্য ও শূন্য (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বিষয় না থাকার যাহাকে শূন্য বলা হয়) কোনো পার্থক্য যদি থাকে তো তা সাধকের অনুভূতিসাপেক্ষ, বাক্যের দ্বারা তা কল্পনা করা যায় না।

শূন্য ও পূর্ণ। বরাহ পুরাণ (৪/১৮) দৃষ্টান্ত দিয়ে সমন্বয় করেন যে এই শূন্য ও পূর্ণ একই :—"অক্ষ শূন্যো ... ইবার্ণবে।" পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

সাধকের নির্বিকল্প অদ্বৈত তত্ত্ব অবস্থানের সময় তাঁর আকাশস্থ কুম্ভের মত তাঁর ভিতর বাহির দুই-ই শূন্য এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত কুম্ভের মত তাঁর ভিতর বাহির দুই-ই পূর্ণ। অর্থাৎ তিনি যুগপৎ শূন্য এবং পূর্ণ। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'র সঙ্গে ইহা তুলনীয়।

ভাষার ভেঁয়ালি বা Jugglery of words :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন, সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনা দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়,তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র। কিন্তু সেই-ই মুক্তি।"

"প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন, এবং মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন স্মরণ করো ... যে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে ... এই পদ্ধতিকে তো কোনো ক্রমেই শূন্যতা লাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিল লাভের পদ্ধতি এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মা লাভের পদ্ধতি।"

"এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি ... এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।" (—রবীন্দ্রনাথ)

'নির্বাণ'কে পাওয়া যায় না : বৌদ্ধদর্শন বলেন, কোনো লব্ধ বস্তুর মত নির্বাণকে পাওয়া যায় না। ছাড়া কোনো বস্তু বিশেষ নহে,—অন্ধকার না থাকলে আলো অব্যক্ত, মুক্তিও অব্যক্ত, নির্বাণও অব্যক্ত।

নির্বাণং নির্বৃতি র্বস্তুং নির্বাণঞ্চ ন লভ্যতে
অপ্রবৃত্তেষু ধর্মেষু যথা পশ্চাৎ তথা পুরা।

মুক্তি বা নির্বাণের স্বভাবই এই যে ইহা প্রাপ্তি নয়, নির্বৃতি বা আবরণ উন্মোচন এবং তার ফলে শান্তি। তার কোন বস্তু নাই,—নিমিত্ত নাই। যাহা অপ্রবৃত্ত স্বভাব

তাকে পাওয়া বা তার সামীপ্য লাভ কিরূপে সম্ভব? স্বরূপতঃ তা নিবৃত্তি মাত্র,—তার পূর্বে পশ্চাৎ আদি কোন সম্বন্ধ নাই,—তা স্ব-স্বরূপে অব্যক্ত।

নির্বাণ, সদর্থক ও নঞর্থক: নির্বাণের দুটি দিক আছে: একটি প্রজ্বলিত অগ্নি বা প্রদীপ নির্বাণের মত (নঞর্থক) তৃষ্ণা-মোহের ক্ষয়ে 'ক্ষয়' ও 'দুঃখ' স্তরের পরিসমাপ্তি এবং তখন কৃতকর্মের 'বীজ' ভর্জিত (ভাজা) বা কথিত (সিদ্ধ) হওয়ায় তা আর ফলপ্রদ হয় না। পুনর্জন্মও হয় না।

ইহা জড়ভরতের মত নিষ্ক্রিয় জীবন মাত্র বুঝায় না। বুদ্ধ আনুমানিক ৩৫ বৎসর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েও দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল নিরলস ভাবে কর্মময় নিষ্কাম নিরাসক্ত জীবন যাপন করে গেছেন।

'সদর্থক' দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্বাণকে পরিপূর্ণ কল্যাণ, মঙ্গল ও শান্তিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা বলা যায়।

মূল পালি সাহিত্যে তথাগত বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নির্বাণ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এইরূপ,—'ভবনিরোধো নির্বাণং (জন্মান্তর নিবৃত্তি),—সব্ব গন্থপ্পমোচনং (সকল গ্রন্থি বা বন্ধন থেকে মুক্তি) তাহা বিপ্পহানেন নিব্বানং (তৃষ্ণা বা বাসনার বিনাশেই মুক্তি) রাগক্খয়ো দোষক্খয়ো মোহক্খয়ো নিব্বানং—এবং পঞ্চস্কন্ধের নিরোধেই নির্বাণ ('ভারত কোষ'—৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬-৭)। এগুলি সব নঞর্থক বা অভাব বাচক।

সদর্থক বা ভাব বাচক,—'অমতোগধং' (ধম্মপদ ১০০ সূত্র) বা পরম সুখময় অগাধ অমৃতময় অবস্থাও বলা হয়েছে।

ওল্ডেনবার্গ, টমাস,-ওয়াল্ডস্ লিড্‌স্‌—ম্যাক্স্ মূলর প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও 'নির্বাণ'কে একান্ত নঞর্থক বা 'annihilation' বলেন নি,—উচ্ছেদক নির্বাণকেই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে "মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম" বলেছেন এবং অধিকাংশ মনস্বী দার্শনিক যা সমর্থন করেছেন বুদ্ধের সেই 'নির্বাণ' যে উচ্ছেদ বা উচ্ছেদক সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

—:০:—

পূজা

শ্রীশান্তিময় মণ্ডল

পূজার বেদীতে সাজাইয়া দিই যাহা,
নিজের বলিতে কোনটিই নহে তাহা।
যেটুকু যতের উচ্ছার তুলে দিই—
দিয়েছ যা তুমি, তাই দিয়ে প্রতিটিই।
হৃদয়ের পাতে দিয়েছ যা কিছু তুলে,
করি নিবেদন তোমারি চরণ-মূলে।
নিজের বলিতে নয় সে একটি কণা,
তোমার দানেই করি তব উপাসনা।

যে প্রদীপ জ্বালি, তোমারি শিখার জ্বালা,
ফোটাও যে ফুল, তাই দিয়ে গাঁথি মালা।
অশ্রু হাসিতে ফোটালে যে ফুল রাশি,
সেই ফুলমালা স'পিয়াছি ভালবাসি।
ভালবাসাটিও নয় সে নিজের নয়,
জাগায়েছ বলে জেগেছে হৃদয়ময়।
সার ভক্তিটি ফলেছে এ বুকে তায়,
তোমার পূজায় দিয়েছি তোমার পায়।

মনের বিচিত্র ক্ষমতা

শ্রীরাখালকৃষ্ণ আচার্য

মানব মনের এমন কতকগুলি ক্ষমতা আছে যা সত্যিই বিস্ময়কর। সেগুলি অনেক সময় স্বাভাবিকের গণ্ডি পেরিয়ে যায় এবং প্রচলিত বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মনের এমন একটি ক্ষমতার বিবরণ সম্প্রতি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি ইউরোপের কোন একটি দেশের। একটি ঘরের আসবাবপত্র বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণে ছাড়া ঘরময় নড়াচড়া করত এবং কোন কোন বস্তু ভার শূন্য অবস্থায় ঘরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা এর কারণ অনুসন্ধান করে বললেন যে, ঐ বাড়ীর একটি ছোট মেয়ের মনের শক্তির প্রভাবে ঐসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। মনের বাহ্য বস্তু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে। পরা-মনোবিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন "মনোপ্রভাব" বা সাইকো-কাইনেসিস্। সংক্ষেপে PK.

প্রশ্ন এই যে, মনের কি এমন কোন ক্ষমতা আছে যা দিয়ে বাহ্য বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে মনের শক্তি অনেক সময় বাহ্যবস্তুর উপর কার্যকরী হতে পারে।

মনের শক্তির সাহায্যে ধাবমান দ্রব্য থামানো বা রূপান্তরিত করা যায়, তার প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন জুলিয়ান আইজ্যাক (অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটের ছাত্র) ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত বৃটেনের সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় পরা-মনোবিজ্ঞান শাখায়। তিনি একটা ব্যাগ ভর্তি থামানো ধাতব তার, পাত, ছুরি, চামচ রড প্রভৃতি সভায় প্রদর্শন করেন যা মনের শক্তির সাহায্যে থামানো হয়েছে।

মনের এই বিচিত্র শক্তি "মনোপ্রভাব" এর কথা ও কাহিনী বহুদিন হল শোনা গেলেও এর বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল অল্পদিন হল। মনের এই বিচিত্র ক্ষমতার উদাহরণ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা উল্লেখ করেছেন যাঁদের কথা কোনমতেই অবিশ্বাস করা চলে না। অনুরূপ একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি বোস্টন শহরে তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী অতিথি ছিলেন। সেখানে তাঁর ডাক্তার বন্ধুর একটি মোটা ভারী কাঠের টেবিল ছিল। ডাক্তার বন্ধু সেটা স্পর্শ করতেই সেটা থেকে একটা শব্দ হল এবং ঐ ভারী টেবিলটি (যা তিন চারজন লোক ছাড়া নড়ানো যায় না) ঘরময় দ্রুতবেগে নড়াচড়া করতে লাগল। কেন এমন হয় ডাক্তার বন্ধুটি জানতেন না। তাছাড়া তিনি বিদেহীতত্ত্ব বা স্পিরিচুয়ালিজমে বিশ্বাসী ছিলেন না বা এমন ধরণের ব্যাপার নিয়ে চর্চা করতেন না। অথচ যখনই তিনি ঐ টেবিল স্পর্শ করতেন তখনই ঐ ধরণের ব্যাপার সংঘটিত হত।

পরা-মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত গবেষক ডঃ রাইন এমন ধরণের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেমন—প্রচণ্ড শব্দ ক'রে কাঠের মোটা টেবিল ফেটে যাওয়া, ভারী মোটা কাচের দোরাত ভেঙ্গে যাওয়া, শক্ত স্টিলের ছুরি দু'টুকরো হয়ে যাওয়া প্রভৃতি।

মনের শক্তির প্রভাবে ফটোগ্রাফের প্লেটে চিন্তা-চিত্র মুদ্রিত করার পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক তোমোকিচি ফুকুরাই। তিনি ১৯৫০ সালে তাঁর লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Clairvoyance and Thoughtgraphy নামক পুস্তকে তাঁর গবেষণার বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন।

মনের এই অদ্ভুত ক্ষমতা গবেষণাগারে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে আনার

চেষ্টা করেছিলেন আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রাইন প্রমুখ গবেষকগণ। লুডো খেলার ছক্কা ছিল এদের গবেষণার প্রধান উপকরণ। মনের শক্তি লুডোর ছক্কার পতন নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিনা তাই নিয়ে তাঁরা নানাভাবে সুদীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা ক'রে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে মানব মনের এমন পরিমাপযোগ্য শক্তি আছে যা জড়বস্তুর উপর সরাসরি হোক, বা অধিকই হোক প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে এবং জড়বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। "পি, কে—টেস্ট" নামে পরিচিত এই পরীক্ষাগুলির তাঁরা একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষাতেও মনোপ্রভাব বা পি কে এর—সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়বাদের কুক্ষিগত। তাই মানব ব্যক্তিত্বের জড় অংশ ছাড়া অ-জড় কোন কিছুর অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, মানুষের অ-জড় অংশের দিকে আলোকপাত করে পরামনোবিজ্ঞান মানব মনের ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আবিষ্কার ক'রে মানুষকে তার নিজ আধ্যাত্মিক সত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের সাহায্যে। এই কারণে পরা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়।

—:•:—

দীনের ভক্তি দান

শ্রীশান্তনু কুমার চৌধুরী

সত্যই আনন্দ তুমি সত্যানন্দ নাম
সর্ব অগ্রেই—তোমারে আমি—করিগো প্রণাম।

তুমি বুদ্ধ তুমি খ্রীষ্ট তুমি আল্লা নিমাই
তোমা মাঝেই দুর্গা কালী
সবে খুঁজে পাই,

তুমিই পুরুষ তুমি প্রকৃতি
আলো কালো রূপ তোমারই দ্যুতি,
রামকৃষ্ণ তুমিই প্রভু
তুমিই সীতারাম।

তুমিই তটে তুমিই পটে তুমিই জলে স্থলে
তুমিই প্রভু সসীম অসীম ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে,

তুমিই তরু তৃণ লতায়
তুমিই কুঁড়ি—ফুল আর পাতায়,

রূপে রূপে অরূপ রূপে তুমি যে অভিরাম
আমার
তুমি যে অভিরাম!
পথের ধুলোর মাঝেও আমি তোমায় খুঁজে পাই
তিন ভুবনের মাঝে গো প্রভু কোথায় তুমি নাই!
একতারা তাই বাজিয়ে হাতে
সুর তুলি সুর
পথে পথে,
তোমার গানই গাই গো আমি তোমার গানই গাই,
আমি নাম জপি তাই মনে মনে তোমার অবিরাম।
তুমি যে আমার ঘর বাহিরে মনে যেতে অভিরাম।
"ভাবমুখেতে" ভাব ঘরের মোর
গাঁথা যে মালা খান,
পাঠিয়ে দিলাম অর্ঘ্য রূপেই
দীনের ভক্তি দান।

—:•:—

বর্তমান যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য

শ্রীমৎ সর্বেশানন্দ শাস্ত্রী বেদান্ত আচার্য্য

শিক্ষা কাহাকে বলে—"অধ্যাপকঃ বালকং শিক্ষতে"। এই বাক্যে ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী শিক্ষ ধাতুর লটের প্রথম পুরুষের একবচন প্রদত্ত হইয়াছে। এই শিক্ষ ধাতু হইতেই স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শিক্ষ ধাতুর অর্থ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সুতরাং শিক্ষা শব্দের অর্থ গুরুমুখে শ্রুত বা উচ্চারিত বিদ্যার অভ্যাস দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান বা বিদ্যা। "গুরুমুখোচ্চারণাদুচ্চারণম্ অধ্যয়নং শিক্ষা ইতি স্তেয়ম্"।

"অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি"—ইত্যাদি বাক্যে যে শিক্ষা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ ষড় বেদাঙ্গের অন্যতম শিক্ষা শাস্ত্র বা উচ্চারণ বোধক বেদাঙ্গ গ্রন্থ বিশেষ "বর্ণস্বরাদ্যুচ্চারণপ্রকারো যত্রোপদিশ্যতে সা শিক্ষা" তথা ৈ তৈত্তিরীয়া উপনিষদারম্ভে সমামনন্তি শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রাবলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্ত শীক্ষাধ্যায়ঃ॥ তৈঃ উপঃ ১।১।১ (শাঙ্কর ভাষ্য) শিক্ষা শিক্ষতে অনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণম্ লক্ষণম্। শিক্ষন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ। শিক্ষৈব শীক্ষা। দৈর্ঘং ছান্দসম্। তাং শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামো বিস্পষ্টম্ যা সমন্তাৎ কথয়িস্যামঃ। ··তত্র বর্ণোঽকারাদি স্বর উদাত্তাদিঃ, মাত্রা হ্রস্বাদ্যাঃ, বলং প্রযত্ন বিশেষ, সাম কর্ণানাং মধ্যমবৃত্তোচ্চারণং সমতা, সন্তানঃ সন্ততিঃ সংহিতা ইত্যর্থম্। এষহি শিক্ষিতব্যোঽর্থঃ। শিক্ষা যস্মিন্ অধ্যায়ে সোঽয়ং শীক্ষাধ্যায় ইত্যেবমুক্তঃ উদিতঃ উক্ত ইত্যুপসংহারার্থঃ। বৈদিক পরাম্পরায় এই বিদ্যা শিক্ষ ধাতুতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

শিক্ষার বিভাগ—(১) ভৌতিক বিদ্যা (২) আধ্যাত্মিক বা ব্রহ্মবিদ্যা। জন্ম মাত্র বালকের প্রায় সকল বিষয়েই অজ্ঞতা থাকে। বয়সের বৃদ্ধিতে মন যখন বিচার পূর্বক বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় সেই সময়েই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার উপদেশ প্রাপ্ত বিষয়ের অভ্যাসাদির দ্বারা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

ভারতীয় ভাবনায় বাহ্যিক জগৎ পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পঞ্চভূতের সৃষ্টি বলিয়া ভৌতিক এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মনবুদ্ধি এবং তদুপহিত চৈতন্য অন্তর আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বিচারিত হয় বলিয়া আধ্যাত্মিক।

সুতরাং শিক্ষা প্রণালীও এইভাবে বিষয় ভেদে দুই প্রকার—(১) ভূত-বিজ্ঞান বিষয়ক ভৌতিক শিক্ষা, যেমন—পদার্থ, রসায়ন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষা। (২) আধ্যাত্ম বিজ্ঞান বিষয়ক ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা। ভারতীয় ভাবধারানুযায়ী এই ভূত বিজ্ঞানাদিকে 'অপরা বিদ্যা' বলা হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যাকে 'পরাবিদ্যা' বলা হয়। ইহা অথর্ব বেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে। যথা—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি-পরাচৈবাপরা চ"। (মুঃ উঃ ১।১।৪-৫)

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বা বেদঃ শিক্ষা, কল্পো, ব্যাকরণম্ নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

মনুস্মৃতিতে শিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে আচার্য লক্ষণ কর্ন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে"। পরা ও অপরা বৈদিক বিদ্যা কর্ণত্রয়েই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া জানা যায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য বা মূল্য প্রয়োজন—কোনও বিষয় নিজে সম্যক বুঝিতে হইলে অথবা অপর কাহাকেও বুঝাইতে হইলে তৎ বিষয়ক অজ্ঞান দূর করা আবশ্যক অর্থাৎ তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। যাবতীয় বস্তু বিষয়ক অজ্ঞান নাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন।

এই অজ্ঞান এক, না বহু ? এই হইলে উহার নিবৃত্তির দ্বারাই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে। বহু স্বীকার করিলে অনন্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। শ্রোত অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ মূল অজ্ঞান এক এবং কার্য অজ্ঞান বহু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং সর্বব্যাপক এবং সর্বাধিষ্ঠান যে ব্রহ্মতত্ত্ব (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম) তদ্বিষয়ক এক মূল অজ্ঞান নাশ হইলেই, মুণ্ডক উপনিষদে অঙ্গিরস ঋষির নিকট শৌনক ঋষির—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি,সেই এক বিখ্যাত প্রশ্নের এবং ছান্দোগ্যের আরুণি ঋষির শ্বেতকেতুর প্রতি—"যে নাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম-বিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতমিতি আদেশমপ্রাক্ষ্যঃ ?" এই আদেশ বিষয়ক প্রশ্নের জবাব স্বরূপ—অদ্বিতে ব্রহ্মতত্ত্ব একবার প্রকাশিত আছে তাহা অনুভূত হয়। সকল বিষয়ের অধিষ্ঠানই ব্রহ্ম হওয়ায় এবং বিষয়ান্তরের অভাবে অনুভব কর্তা যে অজ্ঞানী জীব তাহার অজ্ঞানের নাশের অবধি ভূত যে অবস্থান্তর প্রাপ্তি তাহাতে যে পূর্বানুভূত অনুভবের বিষয়—"নানাবিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতিনী" বিচিত্র জগতের স্থলে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' রূপে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম-এর সহিত অভিন্নরূপে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। ইহাতেই সকল শিক্ষার পর্যবসান এবং জীবের কৃতকৃত্যতা। যে বিদ্যার দ্বারা জীব বিষয়ক এবং জগৎ বিষয়ক সকল প্রকার আকাংখার আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং বস্তু স্বরূপের প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণতার অনুভব হয় তাহাই—আত্মবিদ্যা। সেই আত্মবিদ্যা প্রাপ্তির সাধনই গুরুমুখী বিদ্যার অভ্যাস। সেই অভ্যাসই শিক্ষা।

শিক্ষার অবান্তর প্রয়োজন—বিদ্যা অভ্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য জীব-জগৎকে নিজ স্বরূপে অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করা। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে শিক্ষা গ্রহণকালে সদাচার ব্যবহারাদির শিক্ষা এবং ব্রহ্মচর্যাদি পালন দ্বারা বিদ্যার্থীর মর্যাদা জ্ঞানের দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্রবান পুরুষই বিদ্যাগ্রহণ ও ধারণে সমর্থ হয়। এইরূপে আদর্শ চরিত্রবান বিনীত যোগ্য বিদ্বান পুরুষ দেশের এবং দশের কল্যাণের কারণ হয়। সমাজের এই প্রকার আদর্শ জ্ঞানীয় পুরুষের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইলে সামাজিক সুশৃংখলা প্রতিষ্ঠিত থাকে। কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক সকল প্রকার জ্ঞান লাভের জন্য চরিত্র গঠন করা প্রথম কর্তব্য। শিক্ষা গ্রহণকালে গুরু বিদ্যার্থীকে সমাজ-রাষ্ট্রের ভাবী কর্ণধারগণকে এইভাবে সুগঠিত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষার অবান্তর প্রয়োজন শিক্ষা দ্বারা নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিয়া সুসমাজ এবং সুরাষ্ট্রের সংস্থাপন এবং পরিচালন ও পরিবর্ত্তন।

কালের ভেদে শিক্ষার ভেদ—প্রজার সামগ্রীক কল্যাণের জন্যই শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইহার দ্বারা শাসক সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। পূর্বকালে ভারতীয় সাহিত্যানুযায়ী সত্যাদি যুগে অধ্যাত্ম প্রধান সামাজিক দৃষ্টি ছিল। সুতরাং ভোগ প্রবৃত্তিকে সমাজে প্রাধান্য দেওয়া হইত না। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ভোগ প্রধান সমাজে ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন ও সমবণ্টনাদির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতরাং সমাজে ব্যবহারিক ভৌতিক বিষয়াদির প্রাধান্যে তদনুকূল শিক্ষাদির প্রচলন মুখ্যরূপে হইয়া থাকে। বিচারে, ইহাতে পশুজীবনের সমতুল হওয়ায় এবং শান্তি ও তৃপ্তি বা পরমানন্দ প্রাপ্তি না হওয়ায় পূর্ণত্ব লাভ হয় না। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এ সকল তো পশুদের সঙ্গে সাধারণ বিষয়। আর এইভাবে পশুজীবন যাপনের দ্বারা নিজের প্রয়োজন নিবৃত্তি না হওয়ায় অপূর্ণ জীবন যাপনে দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হয় না এবং দুঃখ না গেলে সুখের স্বাভাবিক পরিপূর্ণরূপ প্রকাশ পায় না। বর্তমানের ভোগমুখী সামাজিক শিক্ষা দ্বারা জীবের নিজের বিষয়ে এবং জগতের বিষয়ে অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। সুতরাং সম্পূর্ণ জ্ঞান না হওয়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্যই মুখ্যতঃ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আধ্যাত্ম বিজ্ঞান বিষয়ে কোনও দেশ, কোন কাল বা কোনও বস্তু বিশেষের ব্যবধান নাই। ব্রহ্মসূত্রের 'অপশূদ্র' অধিকরণে ব্রহ্মজ্ঞানে সকলের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভই একমাত্র শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া জীব নিজেকে কৃতকৃত্য করিয়া সমাজের এবং রাষ্ট্রের আদর্শ প্রতিমা হইয়া নিজের, দেশের ও দশের কল্যাণের কারণ হইতে পারে।

উপরি উক্ত বিষয়ের সম্যক্ বিচার করিয়া মনে হয় যে শান্তি ও আনন্দ ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের মুখ্য লক্ষ্য, ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমার্থ জ্ঞান ব্যতিরিক্ত যাহা লভ্য নয়, যাহা মানব সাধারণের পক্ষে সর্বদেশে সর্বকালে এবং সর্বাবস্থাতেই একমাত্র কল্যাণপ্রদ, তাহাকে বাদ দিয়া বা গৌণরূপে রাখিয়া যে শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে তাহাতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে। "ন জাতুকাম কামানাং"-- । ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জানা যায় কামনার তৃপ্তি কামনার বিষয়ের ভোগের দ্বারা হয় না। সুতরাং সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয় বর্তমান যুগেও শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যকে অব্যাহত রাখিয়া এবং সদাচারাদির দ্বারা চরিত্র গঠন প্রভৃতি গৌণ উদ্দেশ্যকে যথাযথ রাখিয়া ভারতীয় ভাবধারাকেই বর্তমান যুগের অবস্থানুযায়ী সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কাল অনুযায়ী স্মার্ত-ব্যবস্থাদি শিক্ষার যে পরিবর্তন সনাতন সমাজে স্বীকৃতই আছে সেইভাবে ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সকল দিক রক্ষিত হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

পরমারাধ্য পরম গুরুদেব স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বলিতেন—"বেটা, গুরুজীর কাছ থেকে সেই শিক্ষা বা জ্ঞানোপদেশ চেয়ে নিবি। যে শিক্ষা বা জ্ঞানের দ্বারা তোর ইহলোকে শান্তি ও পরাগতি লাভ হবে।"

ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হইলে পরস্পরে বিদ্বেষ ও হানাহানি ইত্যাদি থাকিবে না। শান্তিও আনন্দের রাজা হইবে। এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রাপ্তিই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

—:০:—

ঝাড়ুদার

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

হিংসা দ্বেষ গর্ব্বহীন, হে বীর ! মুক্তপুরুষ।
উষাকালে দেখা দাও, নিবারিতে দুর্গন্ধ কলুষ ॥

কে বলে তোমায় হেয়, কে বলে তোমায় ঘৃণা,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি যে মহান্।
হতে পার লোকচক্ষে, অস্পৃশ্য অশুচি,
অলক্ষ্যে তুমি যে গো চির নিষ্ঠাবান্ ॥

সেবাব্রত ধর্ম্ম ল'য়ে, যের সদা পথে পথে,
নিজ কর্ম্ম করিতে সাধন।
এক মনে কর কাজ, নাহি ঘৃণা নাহি লাজ,
আপন কর্ত্তব্যে রাখ নিজেরে মগন ॥

শুচির দেবতারূপে, অশুচিরে লয় করি,
জ্বাল তব পৌরুষ পাবক্।
হৃদয় জ্যোতির দিপ্ত পরশে, খুলে দাও সত্যের পথ,
হে সাধক্ !
মার্জ্জনি ঘর্ষণে দেব, মুক্ত কর,
যত কিছু পাপের গ্লানিমা।

পার না কি খুলে দিতে, অন্তরের রুদ্ধ দ্বার,
ঘুচায়ে মনের কালিমা ?
নিরন্তর আবিলতাময় যে মোদের অন্তর-কন্দর
মুক্ত ক'রে পার না কি ফুটাতে কমল,
ভেদ করি হৃদয় গহ্বর ?
বিহগ কূজন সাথে, মিশায়ে ভৈরবী সুরে,
কর মুখর শান্ত ধরণীরে।
যেন সুরপুরে হ'তে আসে, বিদায়-সম্ভাষণ গীত,
জানাতে কিত যামিনীরে ॥

সেই সুরে ভেঙ্গে দাও, জর্জ্জরিত মানসের
নিবিড় অবসাদ্।
উন্নত চলার পথ, ক'রে নিষ্কণ্টক্,
লভিতে দাও তারে সাদ্ ॥

জ্বালিয়া নির্ম্মল দীপ্, যে দিন সেই পথের,
দেখাবে সন্ধান্।
নাহি র'বে অমোঘ ডোর, সংসারের মোহ ঘোর,
সব জ্বালার হবে অবসান ॥

মনের গহনে

অধ্যাপক গৌরবরণ কপাট

'ভাবমুখে' পত্রিকায় কিছু একটা লেখা দেবার জোর তাগিদ এসেছে—কিন্তু বিষয়বস্তু ঠিক কি ধরনের হবে তেমন কোন ইঙ্গিত পাইনি। আজকাল লিখতে বসলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি—খালি খালি মনে হয়, আমার কলম দিয়ে যা বেরিয়ে আসবে, অনেক আগেই সে সব লেখা হ'য়ে গিয়েছে। তা ছাড়া 'ভাবরাজ্যের' ছোট বড় কোন খবরই আমি জানি না। মা যে আমাকে একেবারে 'অভাবের' সংসারে রেখে দিয়েছেন। অবশ্য বলতে বাধা নেই, আমি কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করতে শিখেছি। এ বিদ্যেটা যে কার কাছে কিভাবে শিখলাম সঠিক বলতে পারব না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যার কাছে এ কৌশলটি আয়ত্ত ক'রেছি, তিনি আমার আসল মা নন, সৎমা হ'লেও হ'তে পারেন। এখন যাক সে কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনের আশ্রমবাসীরা আমার খুবই আপন জন—তাই সম্প্রতি এখানে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু ক'রে দিয়েছি। ভরসা রাখি, এ'রাই হয়ত একদিন আমাকে 'ভাবরাজ্যে' প্রবেশ করার পাসপোর্ট পাইয়ে দিতে পারবেন। ইতিমধ্যে বরং মনোরাজ্যের কিছু কিছু খবর যা অতিকষ্টে সংগ্রহ ক'রতে পেরেছি তার কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা করি—ঠিক যেমন দূরের বদলে ঘোলের পরিবেশন।

মনের ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করার জন্য আধুনিক মনোবিদ্যায় যে কয়টি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের একটির নাম মনঃসমীক্ষণ। মহামতি সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। মানুষের মন সম্পর্কে তিনি এমন অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন যা শুধু বিস্ময়কর নয়, রহস্যজনকও বটে। মনঃসমীক্ষণের একটা মস্ত বড় অবদান, যে মানুষ তার মনের বেশীরভাগ খবর জানে না—নিজের কাছে সে যেন অনেকটা প্রতিবেশীর মত। ভেবে দেখুন, এরকম একটা অদ্ভুত তত্ত্বকথা, সভ্যজগতের পণ্ডিতমানীরা কি ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেন? ফ্রয়েড বলেছেন, যে মন নিয়ে আমরা দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাই বা বাস্তবের সাথে সঙ্গতি বিধান করি, সেটাই আমাদের সম্পূর্ণ মন নয়—সেটা আমাদের চেতন মন। তারই অন্তরালে আছে একটি বিরাট নিভৃত অন্তঃপুর—যেখানে চেতন মনের জারিজুরি একেবারেই খাটে না। মনঃসমীক্ষণের ভাষায় তার নাম দেওয়া হয়েছে নির্জ্ঞান মন। আবার চেতন ও নির্জ্ঞানের মাঝখানে র'য়েছে এক অতন্দ্র প্রহরী যাকে ফাঁকি দিয়ে চেতনমনের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তাই নির্জ্ঞান মনের খোঁজ খবর আমরা বড় একটা পাই না—যেমন নাকি সাগরের তীরে ব'সে থাকলে কেবল তরঙ্গের খেলাই দেখা যায় কিন্তু সামুদ্রিক জীবজন্তুদের গতিবিধি বড় একটা নজরে পড়ে না। তবে সমুদ্রের তল দেশের খোঁজ খবর ডুবুরীরা কিছু কিছু জানতে পারে—মনঃসমীক্ষকেরা ঠিক যেন মানস সাগরের ডুবুরী। মনের গহনে প্রবেশ ক'রে তাঁরা অনেক গোপন তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করেন।

মনের গঠন সম্বন্ধে অনুরূপ ভাবধারা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন অতি সুন্দরভাবে। প্রসঙ্গতঃ তাঁর 'চাবি' কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্যের মতন
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রাখিলা সজ্জা নানামতো অতিথির তরে;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।

মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে, বাহিরে আকাশ তাই দুলায় আকুল ক'রে হাওয়া
বলিয়াছে "খুলে দাও"। উপায় জানি না খুলিবারে। সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসা যাওয়া।"

ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান মনে যে সব বাসনা-কামনা বাসা বেঁধে র'য়েছে তারা কিন্তু বড়ই অশান্ত এবং যথেষ্ট শক্তিশালী। ঠিক যেন এক অদৃশ্য শক্তির মত তারা চেতন মনের কাজকর্মকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আমরা অনেক সময় ভাবি এক রকম, বলি এক রকম, আবার কাজের বেলায় আর এক রকম। নিজের মধ্যে এই যে বিরোধ—এই যে দ্বন্দ্ব, তার মূলে ঘাটি কি তবে এই নির্জ্ঞান মন? আমাদের সব কাজই যে জ্ঞাত ইচ্ছানুসারে হয় না। অনেক কাজের নিয়ামক যে নির্জ্ঞানিস্থিত কামনা, আধুনিক মনঃসমীক্ষণ তার অনেকখানি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়ে দিয়েছে।

বাস্তবিক কি বিচিত্র এই মানুষের মন—মনের গতিপথকে যদি একটা রেখা দিয়ে প্রকাশ করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে সেটি একটা সরলরেখা হবে না। যাকে মাঝে এমন আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে সে চলে এবং ঘন ঘন দিক পরিবর্ত্তন করে যে, একটা বিশেষ সময়ের পরে সে কোন্ দিকে মোড় ফিরবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না—এমন কি অনুমান করাও শক্ত। একটি বাষ্পীয়বাহী ইঞ্জিনের গতিপথের থেকে এইখানেই বোধ করি তার লক্ষণীয় পার্থক্য। আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা ছিলেন এক একজন দিক্‌পাল, শাস্ত্র বিশারদ এবং সুপণ্ডিত। কিন্তু নিজেদের মনের গতিকে সরলরেখায় টেনে রাখতে তাঁরাও কি ব্যর্থ হন নি সময় বিশেষে? এই দেখুন না, ঠাকুর রামকৃষ্ণ যথার্থ অবতার কিনা তা যাচাই করার জন্য কত বড় বড় পণ্ডিত এলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে। যথাসময়ে বিচার সভার সিদ্ধান্ত একবাক্যে ঘোষিত হ'ল যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে অবতারের সব লক্ষণই পুরো মাত্রায় প্রকটিত। তারপরের ঘটনা কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত—গুরুর বিশ্বাসের কাছে পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে পণ্ডিতেরা রওনা দিলেন যে যার দেশে। আর পরশমণি পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। আচ্ছা এই সব শাস্ত্রজ্ঞানীরা কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ একজন যুগাবতার? অন্ততঃ তাদের পরবর্তী আচরণ নিশ্চয়ই তা প্রমাণ করে না। মনে পড়ে যায় সেই গোষ্পদিনীর গল্প যে কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাসে পায়ে হেঁটে নদী পার হ'য়ে গেল কিন্তু পুঁথিপড়া পণ্ডিতমশাই নদীর জলে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। আমার এই ব্যক্তিগত জীবনে কত জনকেই ত' দেখলাম যাদের অনেকেরই আচরণ রীতিমত বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্মম অপবাদ দিয়ে এক সময়ে যার কাছ থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। পরবর্ত্তীকালে দেখি তারই করুণাধারায় সঞ্জীবিত হ'য়েছে কত অনাথ আতুর এবং দুস্থ পরিজন। সর্বক্ষণের ভোগী মানুষ কিসের প্রেরণায় জনসেবায় বিলিয়ে দেয় নিজেকে একেবারে নিঃশেষ ক'রে? অনাচার এবং অসদাচরণের দরুন যে একদিন নিঃস্বত্বে কুড়িয়ে নিয়েছে নিন্দে মন্দ আর অখ্যাতি কোন্ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে সে আবার উন্নীত হ'ল পূজনীয় পর্য্যায়ে? অনেককেই বলতে শোনা যায় যে, অমুক মানুষটা যে এমন হ'তে পারে তা আর কে ভাবতে পেরেছে। বাস্তবিক সংসারে যে কেবল বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে তা নয়,—একই মানুষ সময় বিশেষে যে কত বিভিন্ন রকম হ'তে পারে তা আমাদের হিসাব নিকাশের বাইরে। সামান্য একটা মুহূর্ত বা ঘটনাচক্র সমগ্র জীবনকেও অতিক্রম করতে পারে। একই মানুষের মধ্যে পরস্পর বিপরীত প্রবৃত্তিগুলি যে কিভাবে বসবাস ক'রে থাকে এবং কেনই বা তার মনের গহনে একটা চিরন্তন অন্তর্বিরোধিতা বিরাজমান, মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বের মধ্যে তার কিছুটা হদিস পাওয়া যায়।

যে দুটি পরস্পর বিপরীত প্রবৃত্তি আমাদের মনোজীবনকে পরিচালিত ক'রে ফ্রয়েড তাদের একটির নাম দিয়েছেন 'জীবন প্রবৃত্তি' আর দ্বিতীয়টিকে বলা হ'য়েছে 'মরণ প্রবৃত্তি'। ফ্রয়েডের ধারণা একদিকে মানুষের মধ্যে যেমন বাঁচার বা আত্মরক্ষার চেষ্টা থাকে, ঠিক তেমনই আবার পাশাপাশি র'য়েছে তার মরার ইচ্ছা বা আত্মধ্বংসের চেষ্টা। প্রথমটি মানুষকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায় এবং অপরটি তাকে মরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, এই দুই বিপরীত শক্তির প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাঁচার ইচ্ছা যে মানুষের মধ্যে অতিমাত্রায়

পরিস্ফুট সেখানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নিমজ্জমান ব্যক্তি ভুল অবলম্বন ক'রেও বাঁচতে চায়—বাঁচার তাগিদেইত' তার এত দৌড় ঝাঁপ—এত আকুলি বিকুলি—এত কাকুতি মিনতি—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে" এই বাসনার অভিব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ক'রে চোখে পড়ে। কিন্তু তাই ব'লে তার মরার ইচ্ছা কি অনুরূপভাবে ক্রিয়াশীল? আচ্ছা, মানুষ কি তবে আত্মহত্যা করে এই প্রবৃত্তির তাড়নায়? মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও যে উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দেয় সে কি তবে মরণ প্রবৃত্তির উন্মাদনায়? ফ্রয়েডের মতে এই যে আত্মহত্যা বা আত্মনির্যাতনের প্রচেষ্টা এগুলি হ'ল মরণ প্রবৃত্তিরই অন্তর্মুখী বিকাশ আর আমাদের সবরকম মারণাত্মক আচরণগুলি (যেমন নাকি নিষ্ঠুরতা, আক্রমণ ধর্মিতা প্রভৃতি) মরণ প্রবৃত্তিরই বহির্মুখী প্রকাশ। ফ্রয়েডের এই অভিনব পরিকল্পনায়, জীবন প্রবৃত্তির আওতার কাছও অন্তর্ভুক্ত। জীবন প্রবৃত্তি হ'ল জীবের সৃষ্টি ও স্থিতি দুইয়েরই মূল উৎস—অর্থাৎ এ যেন একাধারে আমাদের ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু—আর অন্যদিকে মরণ প্রবৃত্তি বোধ করি প্রলয়ের প্রতীক মহেশ্বর। তাই জীবন সায়াহ্নে এসে মাঝে মাঝে কেবল একটা প্রশ্নই জাগে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর অনুক্ষণ কাঁধ মিলিয়ে মানুষকে যে কোন্ ঠিকানায় বয়ে নিয়ে চলেছে কারা তার যথাযথ সন্ধান দিতে পারবেন? যাঁরা 'ভাবরাজ্যে' প্রবেশ করতে পেরেছেন শুধু তাঁরাই কি?

—:০:—

অব্যর্থ

সুধেন্দু মল্লিক

আমি যদি বলি এসো তো এখানে
　　তুমি গিয়ে ঠিক বসবে ওখানে
বাতিটা জ্বলকে বলেই তুমি
　　আঁধার চাইবে কে আর না জানে!
আমি যদি বলি পারবো না আর
　　তখনি বাধাবে হাজার কামেলা
এবং সে সব সামলাতে আমি,
　　এই তো তোমার বাঁধা ধরা খেলা।
যদি বলি নীল আকাশই তো ভালো
　　তুমি আনো মেঘ ঝর বিদ্যুৎ
ভাঙলে গড়বে, গড়লে ভাঙবে
　　চালটি তোমার নিপাট নিখুঁত।

পথে যাই যদি ঘরে ধরে আনো
　　ঘরে ঢুকি যদি সব খিল খোলো
বসলে ছোটাও ছুটলে শোয়াও
　　এতো দেখি মহা মুস্কিল হলো।
বাহাদুরি করে ভর্ৎসনা খাই
　　পরাজয়ে করো অসীম আদর
হাসলে কাঁদাও কাঁদলে হাসাও
　　কোথা হতে পাও এতোখানি জোর?
পকেট যখন বাজে ঝমঝম
　　তখন তোমার পড়েই না মনে
নিঃসম্বল হলেই হাজির
　　ফরমাস রাজপুত্র ধরণে।

পাগল হলাম নাকি শেষে, নাকি
　　পাগল ছিলাম হলাম ভালো
বিড়বিড় করি, চোখের মধ্যে
　　যুগপৎ দোলে আলো ও কালো।
লিখতে লিখতে ভাব কেড়ে নাও
　　সময় দাওনা ভাবিয়ে লেখার
দুহাতে ছড়াও লুকোনো শব্দ
　　ভাবছো মজাটি তোমার একার।

অব্যর্থ জব্দ মন্ত্রটি জানি
　　মিথ্যের জুজু, ভেবেছো তাই না?
আধুনিক কবি একটু এসোতো—
　　ছুটে কে পালায় বলতে চাই না।

—২০৫—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপ্রসঙ্গ

[শ্রীম-এর Diary অবলম্বনে]—'গুপ্ত'

[মাষ্টার ম'শায়—'শ্রীম'র ডায়েরী' একটি অমূল্য ভাণ্ডার। এর পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে নানা মণি-মাণিক্যের ঝলমলী ঝর্ণাছটা। এই 'ডায়েরী' হ'তেই সৃষ্টি হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। মনুষ্যজাতিকে যা' সঠিক মুক্তিপথের সন্ধান দিচ্ছে। 'ডায়েরী'র কিছু কিছু অংশ এখনও অপ্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে মাষ্টার ম'শায় কিভাবে তাঁর 'কথামৃতে'র ডায়েরী লিখে রাখতেন, তারই কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। এই অংশগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে কত পবিত্র ভাবঘন বিষয়। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি পাঠ করলে মন এক চৈতন্যরাজ্যে পাড়ি দেয়; শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব সমুদ্রে অবগাহন ক'রে দেহ মন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। 'মাষ্টার ম'শায়'—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পৌত্র শ্রীযুক্ত অনিল গুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত ভক্ত ভগবানের সেই সব দিব্য প্রসঙ্গের একটু অংশ আসুন সকল ভক্তগণ মিলে আস্বাদন ক'রে দিব্য আনন্দ লাভ করি।]

সংগ্রাহক :—গোলোক সেন।

আজ বুধবার, আশ্বিন কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ২০শে কার্ত্তিক ১২৯২, (৪র্থা নভেম্বর, ১৮৮৫) ঠাকুর অসুস্থ। কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে রহিয়াছেন, ডাক্তার সরকার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন। কোন কারণ বশতঃ ডাক্তারের অভিমান হইয়াছে। সেই কারণে তিনি দুইদিন আসেন নাই। গতকাল ৩রা নভেম্বর বিকালে ভূপতিকে ডাক্তারের কাছে পাঠান হইয়াছিল। ডাক্তার তাঁহাকে শুধু Direction দিয়াছিলেন। এই সংবাদে ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে গিরীশ, মাষ্টার, ভূপতি প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মধ্যে কি হল—ভাত খাওয়া হয় নাই।.....না, গিরিশ ঘোষ যাবে। ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, গিরিশ ও নরেন্দ্র ডাক্তার সরকারের কাছে যাবে। এবং বলিলেন, রাজ বৈদ্যের পর হাতুড়ে..... (মাষ্টারকে)—বলবে মুণ্ডি পায়েসের পর ডাঁটা চচ্চড়ি। সাত্ত্বিক আহার না হলে ধ্যান হয় না।

ঠাকুরের এত পীড়া তার মধ্যে ভক্তদের কিসে উন্নতি হয় সেই চিন্তাই সব সময়ে করেন। তার উপর এমন কি ডাক্তার সরকার সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তার অবধি নাই। এখন সকাল ১০-৩০ মিঃ। ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত ও কথা কহিতেছেন—

ডাক্তার সরকার—আমি এই তিনটিকে পেয়েছিলাম, Sympathy—তা আমায় একবার আসতেও বললে না—গিরিশ ঘোষ আমায় জোর করে বললে, ভাব কাটারি দিয়ে জোর করে কাটলে তবে স্নিগ্ধ জল বের হয়।

মাষ্টার ১২-১৫ মিঃ সময়ে উপরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। মাষ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(Interposing a good word for মাষ্টার)—দেখ না চোখ—তুমি তো দেখে বুঝতে পার—

ডাক্তার সরকার—তা না দেখালে হবে কেনো গো ভালোবাসা.....

[বিনোদিনী (actress)]

"আমার তাঁর উপর ভক্তি আছে—বল কি। ঠিক চৈতন্য—Mr. Kerforma ঠিক গোপী...

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি কেটে কুটে দেখেছেন সব এক (ঠাকুর affected, tears) ইনি কি এক একটি কথা বলেন.....

গিরীশ—আমি তাদের বড় ভালোবাসি—তাদের যামো হলে আমার.....

[God Vision]

ডাক্তার সরকার—তাঁর আজ্ঞা বই কিছু করি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে পেয়ে তারপর কর—

ডাক্তার সরকার—তাঁকে ধরে' তবে করছি—

গিরীশ—কি Directly.....

ডাক্তার সরকার—Directly.....

গিরীশ—তবে কেন তাঁকে বলেন না, কর্ম কমাতে.....

ডাক্তার সরকার—তিনি সব দিয়েছেন, করে নিতে হবে.....

[বিজ্ঞান]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি শুনা, না দেখা, না খাওয়া—

ডাক্তার সরকার—খাওয়া—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে ভাল—

ডাক্তার সরকার—তাঁর আলো রয়েছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আলো পাঁচ প্রকার— ১। সংসারীর প্রদীপের আলো। ২। ভক্তের চাঁদের আলো। ৩। ঈশ্বর কোটির সোর আলো প্রভৃতি

ডাক্তার সরকার—(Steggard)—

[ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশির টিকিট একেবারে—ভাগলপুর প্রভৃতি। ভাগলপুর দিয়ে যেতে হয় জানে—

ডাক্তার সরকার—কিছু দেখে গেলেও কেমন জানা হয়.....ও ও চাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ হলে তার ঐশ্বর্য জানতে পারবে

ডাক্তার সরকার—ঐ দিয়েই তো তাঁকে জানা.....

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু Dispensary.....

[হরিবল্লভ বসু]

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ডাক্তারের প্রতি) এদের বলেছিলাম জিজ্ঞাসা কর, Vision-এ তোমাকে দেখেছিলাম ও হরিবল্লভকে—তোমার আনন্দ লাভ হয় নি—দেখেছ না খেয়েছ

ডাক্তার সরকার—খেয়েছি

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার লক্ষণ

[শাস্ত্র ও অভিমানশূন্য]

ডাক্তার সরকার—অভিমান, (গিরিশের প্রতি)—অভিমান না থাকলে তোমার থিয়েটার চলে .....

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) তেরপল—বড় ছিম আসে

ডাক্তার সরকার—গিরিশ ঘোষ বলে যাওনি কেন, শুধু নি এলুম.....

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি বীরভক্ত—ভূতের মধ্যে ইনি ভক্ত—ও কি বলবে—ভয় পেয়ে ছিল—আর পেতেই পারে—তুমি অতো এসে আর এলে না একেবারেই—

বেলা ৩টা বাজিয়াছে, ডাক্তার আগেই চলিয়া গিয়াছেন, ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ডাক্তারের সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(মাষ্টারের প্রতি) আমরা কত কি খতাচ্ছিলাম, মাছ সুতা ছিঁড়ে যাবে—এখন দেখছি কাটা বিঁধেছে

মাষ্টার—ডাঙ্গায় উঠেছে·····

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আশ্চর্য্য ! কি দৈব বেলা—

মাষ্টার—দৈবি বৈকি !

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ফকিরের প্রতি) হরিবল্লভ আর নিন্দা করে ?

ফকির—শুনিনি·····

মাষ্টার—নিন্দা করবে—এখন নেশা লেগে যাবে আসতে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রেম করকে টানতে ইচ্ছা হয়েছিল—তা দেখলুম লজ্জা করে এখানে আসতে, গিরীশ ঘোষকে ঠেস বলেছিলাম —তা বলেছিল আমরা হাকিম মানুষ ওদের সঙ্গে আলাপ নাই।

মাষ্টার—আমার বোধ হয় বিদ্যাসাগরও তাই আসব বলে আর এলেন না, মনে ভাবলেন আমি গেলে পাছে লোকে কিছু বলে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আশ্চর্য্য ! ডাক্তার দেখলে না একেবারে অত নত, তোমার পায়ে ধরলে দেখলে—

মাষ্টার—আপনি বলেছেন ঈশ্বরের শক্তি থাকলে, অহংকার যখন যায় একেবারে

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ।

[credit to whom]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তি হলো কি যারা যার তাদের উপর—

মাষ্টার—আপনার উপর—, বলে তাদের উপর—

সন্ধ্যা হইল, ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে, অনেকে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ঘরে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(মাষ্টারের প্রতি) এখন সব কর্ম ফেলে একটু ঈশ্বর চিন্তা (ধ্যান) কর।

—:০:—

তুমি শেষ সর্বাশ্রয়

নিবারণ চক্রবর্ত্তী

আশার মায়া-মোহ জালে মুক্তি আমার চাই
মুক্তি নিয়ে শান্তিতে আর বাঁচার পথ নাই।

সংসারের পাকচক্রে
স্বস্তিহীন বৃথা ঘুরে
হাহাকারে হৃদয় ভরে ঠাকুর কোথা যাই !

তুমি শেষ সর্বাশ্রয় যুগের অবতার
সব হারিয়ে তোমার নাম—জপমালা সার।
কেউ আর এখন নয় আপন
(নিত্য) ব্যথার জ্বালা শোকের দাহন
শান্তি সুধায় অবগাহন
তোমার চরণতীর্থে চাই।

ঈশ্বর, জীব এবং সংসার সম্পর্কে ভগবান আদি শঙ্করাচার্যের চিন্তাধারা

লেখক—জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী ভারতীকৃষ্ণতীর্থজী মহারাজ

অনুবাদ : শ্রীপুষ্পিত মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৩)

সমন্বয়াত্মক পদ্ধতি : এই পদ্ধতি পূর্বে অপেক্ষা অনেক সরল এবং সুগম, অতএব সাধারণ লোকেদের জন্যও বেশী উপযুক্ত। এটী হচ্ছে সেই পদ্ধতি যার দ্বারা আমরা আত্মার স্বরূপই শুধু নয়, এও জানতে পারি যে, এ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে এই পদ্ধতিটি বোঝানো হয়েছে। এখানে মহর্ষি ভৃগু যখন বালক ছিলেন) পিতার কাছে গিয়ে ওই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেন যা নিয়ে আমরাও ভাবছি। বরুণদেব এর উত্তর স্বয়ং বের করার জন্য ভৃগুকে অত্যন্ত সাধারণ এক সংকেত বলে দেন। সেই সংকেতটা হচ্ছে এই—যার থেকে সব পদার্থ সৃষ্ট হয়, যার দ্বারা ওদের ধারণ হয় এবং যাতে তারা অন্তে মিশে যায়—এই তিন পদার্থ পৃথক পৃথক নয়, একই আর তা হচ্ছে ঈশ্বর। বরুণের এই উপদেশের ভিতরের তত্ত্বের ব্যাপকতা প্রমাণ করার জন্য বহু উদাহরণ আমাদের আশেপাশের বাস্তব জগত থেকে দেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃক্ষ মাটি থেকে জন্মায়, তারই ওপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে এবং পড়ে গিয়ে এতেই আবার মিশে যায়।

এরচেয়ে কিছু স্থূল কিন্তু বেশী প্রচলিত উদাহরণ মাছের ক্ষেত্রে রয়েছে। সাধারণতঃ সবাই জানেন যে, মাছের প্রকৃতির অনুকূল তত্ত্ব হচ্ছে জল, কিন্তু আসুন আমরা এমন এক ব্যক্তির কল্পনা করি যে এই তত্ত্বকে জানে না, সে দৈবাৎ কোন নদী কিম্বা পুকুরের ধারে অস্থির এবং ছটফট করছে এমন একটা মাছ দেখতে পেলো। সে ভাবলো তার নিজের যাতে আরাম হয় সেরকম করালে হয়ত মাছটারও সমস্ত বাধা দূর হয়ে যাবে। সে মাছটাকে তুলে ঠান্ডা হাওয়ায় রেখে দিল কিন্তু দেখল যে মাছটা তবুও ছটফট করছে, তখন এই ব্যক্তি তাকে ঘরে নিয়ে এল এবং নিজের কোমল শয্যায় শুইয়ে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখল যে মাছটা ছটফটই করছে ও তার অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে। এইভাবে মাছটাকে আরাম দেওয়ার সব প্রচেষ্টাই যখন বিফল হয়ে গেল তখন সেই ব্যক্তি মাছটাকে পুকুর কিম্বা নদীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সে তাকে আরাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে জলে ছেড়ে দিল এবং দেখতে পেল যে মাছটার সমস্ত ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেছে এবং খুশী হয়ে সাঁতরাতে থাকে। এই ব্যক্তির স্বাভাবিক নির্ণয় কি হবে এবং কি হওয়া উচিত? নিশ্চিতভাবেই সে এই সিদ্ধান্তে আসবে এবং আদাই উচিত যে মাছের প্রকৃতির অনুকূল তত্ত্ব জল এবং তাতে যাওয়ার জন্যই সে এতক্ষণ লাফাঝাঁপা করেছে, ছটফট করেছে, যার বাইরে সে বেরিয়ে এসেছিল এবং যার দ্বারা পূর্বে তার লালন পালন হোত।

এ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে যাকে আমরা নিরন্তই খুঁজছি এবং যাকে ছাড়া আমরা কখনো বস্তুতঃ সুখী হতে পারি না, সেইই আমাদের বাস্তবিক স্বরূপ অথবা প্রাকৃতিক তত্ত্ব, সংক্ষেপে সমন্বয়াত্মক পদ্ধতির স্বরূপ এটাই। এই পদ্ধতি দ্বারাও সম্পূর্ণ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই দুইটি তথা অন্য সহায়ক পদ্ধতি সমূহের উপযোগ ক'রে আমরা আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ এবং লক্ষণ বিষয়ে এরপর চিন্তা করতে শুরু করব।

সনাতন অস্তিত্ব : আমাদের শাস্ত্রানুসারে আত্মার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে সৎ অথবা ত্রিকালাবাধ্য অস্তিত্ব (সনাতন অস্তিত্ব)। আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটা দৃষ্টি দ্বারা এর মনন করতে পারি।

মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি : আমরা সকলেই মৃত্যুর বিষয়ে চর্চা ক'রে থাকি এবং বলে থাকি 'অমুক মারা গ্যাছে' কিন্তু বাস্তবিক আমরা মৃত্যুর অর্থ কি বুঝি? আত্মার লক্ষণ পূর্বের ন্যায় স্মরণে রাখা উচিত যে আত্মা হচ্ছে সেই পদার্থ যার ইঙ্গিত আমরা সবাই 'অহং' পদ দ্বারা ক'রে থাকি। এখন দ্যাখা উচিত যে 'অহং' পদ এবং 'মারা গ্যাছে' ক্রিয়ার বাস্তবিক উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের রূপে সম্পর্কিত হওয়ার কিঞ্চিৎমাত্র সম্ভাবনা আছে কি? কখনো না। ডাক্তার বৈদ্য রোগীর নাড়ী দেখে বলে থাকেন যে সে মারা গ্যাছে অথবা রোগী নিজেই শঙ্কিত অথবা ভীত যে 'আমি মারা যাবো'। কিন্তু মৃত্যুর বাস্তবিক মানসিক অথবা মনোবৈজ্ঞানিক অনুভূতি কখনো হয়ই না, সেটা একেবারেই অসম্ভব। 'অহং' এবং 'মৃত্যু' উভয় শব্দ একইসঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে না। সেই অবস্থাতেও যখন মানুষ বলে থাকে যে, 'আমি মারা যাচ্ছি' এবং অপূর্ণ বর্তমানকালের প্রয়োগে জানা যায় যে তার অভিপ্রায় ভবিষ্যৎকালের সঙ্গে জড়িত এবং সে ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধেই ইঙ্গিত বা উল্লেখ করছে, অতীত অথবা বর্তমানের বিষয়ে নয়।

এ ব্যাপারে আমি নিদ্রার উল্লেখ করব, যাকে অস্থায়ী বা স্বল্প মৃত্যু বলতে পারেন।

বাস্তবে মৃত্যুকে বহুক্ষেত্র দীর্ঘ নিদ্রা বলা হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ মহাকবি কালিদাসের (রঘুবংশ—সর্গ ১২) প্রয়োগ দেখুন—ভগবান রামচন্দ্র দ্বারা নিদ্রাপ্রিয় কুম্ভকর্ণ বধের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

"অকালে বোধিতো ভ্রাতা প্রিয়স্বপ্নো বৃথাভবান্।
রামেষুভিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ॥"

অর্থাৎ—এরকম মনে হচ্ছিল যেন শ্রীরামের বাণ এই কথা বলে যে 'হে নিদ্রাপ্রিয়! তোমার ভাই তোমাকে অসময়েই বিনা প্রয়োজনে জাগিয়ে দিয়েছে। কুম্ভকর্ণকে দীর্ঘনিদ্রায় প্রেরিত করল'।

নিদ্রার ব্যাপারে মজার কথা হচ্ছে এই যে, আপনি বলতে পারেন—'আমি ঘুমোচ্ছিলাম, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি—আমার অত্যন্ত ঘুম পেয়েছে ইত্যাদি, কিন্তু একথা আপনি কদাপি বলতে পারেন না যে 'আমি ঘুমোচ্ছি।' আপনি যদি এ রকম বলেন তাহলে সেটাই এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে আপনি ঘুমোচ্ছেন না। এই রকম 'নিদ্রা' শব্দও আমি (অহং)'র সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে না, এটা স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব। এই অবস্থায় আমি'র সঙ্গে 'মৃত্যু' শব্দের প্রয়োগ তো আরো অসম্ভব। এর স্বাভাবিক পরিণাম এই পাওয়া যায় যে আত্মার সম্বন্ধে মৃত্যুর উল্লেখ হতে পারে না।

মাঝে মধ্যে এমন হয় যে মনের অদ্ভুত ব্যাপার দ্বারা আপনি স্বপ্ন দেখে থাকেন যে আপনি মারা গ্যাছেন এবং সকলে আপনার জন্য কাঁদছে ইত্যাদি। কিন্তু এ বিষয়ে আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে এই যে, এই কল্পিত মরণাবস্থাতেও আপনি সকলকে কাঁদতে দ্যাখেন এবং শুনে থাকেন, ইত্যাদি। এ দ্বারা এই স্পষ্ট হয় যে কাল্পনিক মৃত্যুর পরও জীবন বিদ্যমান থাকে। এ সব দৃষ্টান্তে এটাই প্রমাণিত হয় যে অমরত্ব আত্মার স্বাভাবিক গুণ।

বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ : আসুন, এখন আমরা সে উদাহরণটি স্মরণ করি যাতে কিছুক্ষণ আগেই মাছ এবং তার স্বভাবানুকূল তত্ত্ব (জল)'এর ব্যাপারে বলা হয়েছিল এবং সেই রহস্যের প্রয়োগ এখানেও করি। যদি জীবন এবং মরণ উভয়ই আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম হোত অর্থাৎ যদি মৃত্যুও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হোত, তাহলে আমরা তাকে আটকাতে এবং তার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা কেন করতাম? যেটা আমাদের কাছে সহজ এবং স্বাভাবিক তার হাত থেকে আমরা না বাঁচার চেষ্টা করে থাকি না করতে পারি। অন্য একটা উদাহরণ দেখুন, ধরুন অফিস যাওয়ার জন্য আপনাকে বিশেষ ধরণের পোশাক পরতে হয় এবং আপনি তাই পরেনও, কিন্তু অতি শীঘ্রই সেগুলি আপনার বিরক্তির কারণ হয়ে পড়ে এবং আপনি অস্বস্তি অনুভব করেন। আপনি বাস্তবিকই অস্থির হয়ে ভাবতে শুরু করেন যে কখন ঘরে পৌঁছবো এবং এই পোশাকগুলো খুলে ফেলব। এরকম কেন হয়? কেননা এটা আপনার ক্ষেত্রে

স্বাভাবিক নয়, কিন্তু এটা জোর করে আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এইজন্যই শীঘ্রই আপনি ওই পোশাকের জন্য অস্বস্তিবোধ করেন। নিষ্কর্ষ হচ্ছে এই যে, সেই বস্তুর ওপর আপনি বিরক্ত হয়ে পড়েন যেটা আপনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়; কিন্তু সর্বদা বেঁচে থাকার প্রশ্নেও কেউ ঘাবড়ায় না। এমন কি যখন শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, ইন্দ্রিয়সমূহ ঠিকভাবে নিজের কাজ করতে পারে না এবং বার্ধক্য এবং রোগ কষ্ট দিতে শুরু করে তখনও বেঁচে থাকার ইচ্ছা জেগে থাকে। এর কারণ হচ্ছে এটাই যে বেঁচে থাকাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক এবং মৃত্যুই অস্বাভাবিক। যদি মৃত্যু সত্যিই আমাদের ধর্ম হোত তাহলে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা কখনোই করতাম না। আমরা বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করি। এটাই এ কথার প্রমাণ যে জীবন আমাদের স্বভাব। জীবন এবং মৃত্যুর কথাটা বাদ দিয়ে, স্বাস্থ্য এবং রোগের ব্যাপারটাই দ্যাখা যাক। আমরা সুস্থতা কেন চাই এবং রোগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি? —এজন্য নয় কি যে সুস্থতাই আমাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং রোগ অস্বাভাবিক? না হলে আমরা রোগ নিবারণের চেষ্টা কেন ক'রে থাকি? এছাড়া এখানেও আমরা 'কেন'? এই প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি। যখন কোন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা তার অসুখ হয় তখন প্রত্যেক মানুষ তাকে 'কেন' (কারণ) জিগ্যেস করে। এই প্রশ্ন এবং তার উত্তরের প্রয়োজনীয়তাই একথা প্রমাণ করে যে রোগ, পীড়া এবং দুঃখ স্বাভাবিক নয়, এইজন্য তার কারণ খোঁজার দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন মানুষ পূর্ণ সুস্থ থাকে তখন কেউ তাকে জিগ্যেস করে না যে তুমি কেন সুস্থ আছো? এটা অন্য স্পষ্ট প্রমাণ যে সুস্থতাটাই স্বাভাবিক এবং এজন্য তার কারণ জানার প্রয়োজন পড়ে না। যখন স্বাস্থ্য এবং রোগের ক্ষেত্রে একথা তখন জীবন এবং মৃত্যুর ব্যাপারে একথা অধিক সত্য, অর্থাৎ জীবন স্বাভাবিক। মৃত্যু স্বাভাবিক এইজন্য এই দৃষ্টিকোণ থেকেও এই নিষ্পত্তি হয় যে আত্মা সনাতন।

যুক্তিশাস্ত্রীয় প্রমাণ : প্রফেসর রুস্কী দ্বারা রচিত রসায়ন শাস্ত্রের প্রারম্ভিক বই'এর প্রথম অধ্যায়েই এটা বলা হয়েছে যে, যখন জ্বলে তখন মোমবাতির কিছুই নষ্ট হয় না। এটা পড়ে আপনার এই উত্তরই দিতে ইচ্ছা হবে যে নিজের পয়সা ও মোমবাতি খরচা করে কোন্ দুঃখে ওই প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে একমত হতে যাবো। কিন্তু উনি আপনার কথার এইভাবে সমাধান করবেন যে যখন মোমবাতি জ্বলে তখন তার উপাদান হাইড্রোজেন এবং কার্বন নামক দ্রব্য বাইরে বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় এবং তার অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে ক্রমশঃ জলীয় বাষ্প এবং কার্বনডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে দ্রব্যের বিনাশ হয় না, কেবল তার স্থান, রূপ এবং নাম পরিবর্তিত হয়। এইরকম ছুতোর যখন চেয়ার বা বেঞ্চ তৈরী করে তখন সে নূতন কোন পদার্থ সৃষ্টি করেনা কিন্তু বাজার অথবা জঙ্গল থেকে ঈপ্সিত কাঠ নিয়ে আসে, প্রয়োজন মত টুকরো টুকরো ক'রে কাটে, সঠিক নিয়মে তাকে রাখে এবং বাঞ্ছিত আকার দেয়, এইভাবে এখানেও কোন নূতন জিনিষ পাওয়া যায় না কিন্তু কেবল স্থান এবং আকার এবং তদনুসারে নাম পরিবর্তন হয়। পৃথিবীতে কোনও পদার্থের নূতন সৃষ্টি অথবা নাশ হয় না। এই সিদ্ধান্তকে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে 'পদার্থের অনশ্বরতা', পদার্থের অনুপাদান্ত, শক্তির নিত্যতা ইত্যাদি সব বড় বড় গুরু গম্ভীর শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে আর এই আধুনিক সিদ্ধান্ত যাকে বিজ্ঞানের নামে পদার্থ বিজ্ঞানে শেখানো হয়ে থাকে। প্রাচীন ভগবদ্গীতার একটা সুন্দর শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" "যা কখনো ছিল না সেটা কখনো সৃষ্টি হয় না এবং যা আছে তার কখনো অভাব হতে পারে না।"

এবার আমরা পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের এই বাস্তবিক সিদ্ধান্তের প্রয়োগ সেই সমস্যার ওপর করব যার চিন্তা আমরা করছি। যখন কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে 'জন্ম নেওয়ার আগে আমি ছিলাম কিনা? এবং মৃত্যুর পরে আমি থাকবো কিনা?' তখন আমি সবসময় তাকে এইই বলি যে আপনার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি

আপনাকে একটা প্রারম্ভিক প্রশ্ন করতে চাই যে 'আপনি এসময় বিদ্যমান কিনা? আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জড়িত। কেউই এটা বলবে না বা বলতে পারে না যে আমি এসময় বিদ্যমান নই'। অতএব আমার উত্তর হচ্ছে এই যে, যদি আপনি এই সময় বিদ্যমান তাহলে আপনি অবশ্যই পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, কেননা যা পূর্বে ছিল না তার এখন আর নূতন সৃষ্টি হতে পারে না। এই রকম যদি আপনি এ সময়ে বর্ত্তমান তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে সবসময় বর্ত্তমান থাকবেন, কেননা যে বাস্তি এ সময় বর্ত্তমান তার অভাব হতে পারে না। অবশ্যই যেমন মোমবাতির কার্বন এবং হাইড্রোজেনে আর চেয়ার এবং টেবিলের কাঠে স্থান, আকার এবং নামের পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে, সেই রকমই আপনার ভেতরেও পরিবর্ত্তন হতে থাকবে, কিন্তু আপনার অভাব কখনো হতে পারে না। এই বিবেচনের দ্বারা প্রায় সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং মননের এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায় সত্যকার জিজ্ঞাসুদের সমাধান হয়ে যায় যে আত্মা সনাতন এবং হওয়াও উচিত। এরজন্য কারো দর্শন (অথবা ভৌত বিজ্ঞান) পড়ার দরকার নেই।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

প্রচরণিকা

গৌরী ধর্মপাল

আচরণে চলি নে কো
হাঁটি হাঁটি পা
চরণে চরণে চলি
প্রচরণিকা।

চরণ যেখানে পড়ে
কাঁটা হোক্, ফুল
সেই তো তীর্থ যারা
পসী সমতুল।

চলব চলব আমি
দেখি চরাচর
চলে কিনা, টলে কিনা
হোক নশ্বর।

দেখি জটা খুলে নট
রাজ নাচে কিনা
অটবী কেবট বাঁধি
কার কারবালা।

বল্লুযোগিনী রাগে
বাজে কিনা তার
আনন্দী ভাঙে কিনা
রসচুক্কার।

আচারে পাই নি শেষ
সিংহিকা হাঁ-র
তাই এখন চরণে চরণ ফেলি
প্রচরণিকার।

প্রচরণিকা—প্রথমে স্বপ্রকৃতি, পরে মহাপ্রকৃতি। কেবট—গর্ত, বাঁধিকা—গাছের সারি। অটবী কেবট বাঁধিকা—সুন্দরে ভয়ঙ্করে মেশা সংসার অরণ্য। সিংহিকা হাঁ—সমাজ সংসার জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। তার—(১) নটরাজের। (২) তন্ত্রী।

অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য—উড্‌রফের দীক্ষা

শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তন্ত্র সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচারকালে উড্‌রফ বলেন—"তন্ত্র শাস্ত্রে এমন কতকগুলি সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান সাধকের আহরণের জন্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে যা এ জীবনে অর্জিত ক'রে, সাধক পরবর্ত্তী জীবনে উত্তরিত হ'লে সেই জীবনের সাধনে পাথেয় আগে হতেই সংগ্রহ ক'রে রাখতে পারে।" জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ সমবায়ে তন্ত্রকে সাধন ধর্ম "মন্ত্র শাস্ত্র"ও বলে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভই তন্ত্রের চরম ও পরম লক্ষ্য। তন্ত্র সকল মানুষকেই এই সাধনে নির্দেশ দেয় যে সাধক প্রবৃত্তির পথে সাধন কালে সাধন সৌকর্য্যে ক্রমিক নিবৃত্তির ঊর্দ্ধগতি পথে উন্নীত হইলে, চরম স্থিতিতে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধ্য। তন্ত্র শাস্ত্র সুবিস্তৃপূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধন পদ্ধতির বিধি ও বিধান নির্দেশ করিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির প্রামাণিক উপযোগিতা, ব্যক্ত করিয়াছে। উড্‌রফ, বলেন "তান্ত্রিক সাধনা শব্দ দুটি শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণ সাধনার যে কোন আচারে সাধনাকে বোঝায়। [মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থের ২ পাতায় উড্‌রফের মত সমর্থন করেন।] উড্‌রফের মতে শঙ্করাচার্য যেমন একদিকে বৈদিক ধর্ম সংস্কার ও প্রচারের যুগোপযোগী প্রবক্তা অপরদিকে তান্ত্রিক ধর্মের সংস্কার ও প্রচারেও যুগোপযোগী প্রবক্তা।

শঙ্করাচার্য এই নির্দ্দেশ দেন যে, কোন শঙ্করপন্থী দীক্ষা গ্রহণকালে প্রথমেই তাহাকে "শ্রী" চক্রে শক্তি সাধনা শিক্ষা করিতেই হইবে। জীবদেহে পরমাত্মা যেমন বিশুদ্ধ চিৎ শক্তি, শাস্ত্রদেহেও তন্ত্র মন্ত্রময়ী চিৎশক্তি। জীবাত্মার যেমন সগুণ মনঃ শক্তির প্রক্রিয়া সকল নিত্য প্রবহমান, বেদ ও তন্ত্রে সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণে সাধকের আধার ও অধিকারানুরূপ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে জ্ঞানময় শক্তিপুঞ্জ।[২২ক]

২২(ক)। উড্‌রফ, শক্তি ও শাক্ত, ১২৯ প্রাসঙ্গিক সারাংশের অনুবাদ।

উড্‌রফের ১৯০৫ হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত তন্ত্রগ্রন্থগুলির সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক আর্থার জেমস জন কার্সিন ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় "আগম ও তাহার ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন—

"অনুবাদক (উড্‌রফ) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবার এই গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তন্ত্র অনুসৃত তথাকথিত অভিচার ক্রিয়া ও কামলালসা চরিতার্থ অনুষ্ঠানাদির অন্তরালে ঐ শাস্ত্র অতি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করে ও ঐ তত্ত্বোপলব্ধি ক'রে সত্য লাভের জন্য সাধনোপায়ও নির্দেশ করে।" যদি কেহ সত্য সত্যই তন্ত্রশাস্ত্রবিদ ছাত্র হইতে চান, তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে আসিবেন যে, উড্‌রফ একটি মহৎ ও চিরস্মরণীয় কাজ করিয়াছেন মূল তন্ত্রগ্রন্থাদির ইংরাজি অনুবাদ করিয়া উড্‌রফ শুধু তন্ত্র গ্রন্থাদির ইংরাজি টীকা টীপ্পনী সহ অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থনা করিলেও তাঁহার অবদান কালজয়ী, এই কারণে যে, প্রাচ্যের তথাকথিত ঘৃণিত ধর্মশাস্ত্র মূল সংস্কৃত হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থনা করিয়া অনুবাদক তাঁহার নিঃস্বার্থ ধর্ম প্রচারক সুলভ প্রবণতাকে বিচারক সুলভ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহার খ্যাতি ভারত ছাড়াইয়া বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছে।

'শক্তি ও শাক্ত' গ্রন্থে উড্‌রফের অনূদিত তিব্বতীয়তন্ত্র, চীনাতন্ত্র ও তা'ও তন্ত্রের সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক ভ্যান-ম্যানেন বলিতেছেন—তিব্বতীয় তন্ত্র নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তন্ত্র শাস্ত্রের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। অনেকের ধারণা যে, তিব্বতী তন্ত্র হইতে ভারতীয় তন্ত্রের উদ্ভব। ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে ঐ মত গ্রহণীয় নয়। চীনাতন্ত্র ও তা'ও তন্ত্র সম্বন্ধে উড্‌রফই প্রথম "চীনাচার", "বশিষ্ঠ ও বুদ্ধ" ও "মতম্ রুত্র" (Matam Rutra)

এই তিনটি প্রবন্ধে জগতের কাছে ঐ গুপ্ত শাস্ত্রের রহস্য উদঘাটন করেন। ('শক্তি ও শাক্ত' গ্রন্থের নবম ও একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

উড্‌রফের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতবাদ "শাক্তাদ্বৈতবাদ।" ঐ বাদ মায়াবাদী বেদান্তের ও আগমিক বা তান্ত্রিক বেদান্তের মধ্যে আপাত বৈষম্যকে সূক্ষ্ম সমন্বয়ে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শঙ্করাচার্যের পরমার্থিক তত্ত্ব একমাত্র যোগসমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আগমবাদী তন্ত্র সাধক জগৎ সত্য জ্ঞানে স্বীকার ক'রে আপাত দৃষ্টিতে দ্বৈতভাবে ভাবিত। সাধক নিজে সত্য, তাহার পূজা সত্য, পূজার উপচার সত্য ও পূজ্যও সত্য। এক কথায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এই তিনে এক ও সেই একই সত্য। সাধক ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া সংসার বা সগুণ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ও সেই দৃষ্টিতেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করে। অদ্বৈত মায়াবাদী বৈদান্তিক প্রথমেই ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সৃষ্টিকে বলে মায়া অর্থে মিথ্যা। অদ্বৈত যোগমার্গী ও অদ্বৈত তন্ত্র যোগী সাধক দু'জনেই বলে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" তন্ত্র বলে যোগ ও ভোগের সাম্যে মুক্তি। শুধু যোগেই বা ভোগেই মুক্তি নয়। উড্‌রফ বলেন, "বিশ্ব স্রষ্টা যদি সত্য হ'ন, তবে সৃষ্টির কারণও সত্য। বিশ্ব-সৃষ্টি কারকের চৈতন্যশক্তি সত্য ও ত্রিগুণাতীত ব'লে, ঐ শক্তিকে ব্রহ্মশক্তি বলা হয়।" উড্‌রফ এবার বলছেন "It therefore, does away with Chidabhas, for if real conscious sakti is the Cause of the world, then there is no need of Unreal Consciousness chidabhas which Mayabad is driven to posit to secure absolute purity of Bramha consciousness." "চিদাভাব" নিষ্প্রয়োজন, কারণ চৈতন্যশক্তি[২৩] বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ যখন, তখন অচিৎ শক্তির (চিদাভাবের) কোন প্রয়োজন নাই। মায়াবাদী চিদাভাবের আশ্রয় নেন ব্রহ্ম চৈতন্যকে পরমশুদ্ধ বলে নির্দেশ করবার জন্য।" "সারপেন্ট পাওয়ার" গ্রন্থের মুখবন্ধে উড্‌রফ শক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—

"যাহা কিছু বিশ্বে প্রকাশমান সবই শক্তি—মন, প্রাণ ও জড় বস্তু। শক্তির কেহ ধারক থাকিবেই, তিনি শক্তিমান। শক্তি ছাড়া শক্তিমান হইবে শক্তিহীন শব। শক্তিমান হইবে শক্তির আধার শক্তি সমবেতো বলিয়া নচেৎ নহে। শক্তিমান তন্ত্র মতে যুগলবদ্ধ শিব শক্তি, বিশ্বের পরা জননী। ঐ শক্তি ও শক্তিমান স্ব স্বরূপে একই সত্তা। শিব ও শক্তি সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী যুগলবদ্ধ রূপেই পূর্ণ এক। সৎ অর্থাৎ হওয়া নিত্য "Is-ness"-কে তাহার কোন বিশিষ্ট রূপসংস্থান হইতে পৃথক করা যায় না। হওয়া বা জন্ম লওয়া মানেই চৈতন্য যুক্ত হওয়া। চরমে সৎ-চিৎ-আনন্দ পূর্ণ এবং ঐ মুক্ত অসীম সৎ বা Being বা সত্তাই আনন্দ বা Bliss। সৎ-চিৎ-আনন্দ প্রত্যেকটি স্ব স্বরূপে চরম সৃষ্টিধর্মী সত্য। সৎ-চিৎ-আনন্দ নামে ও রূপে মনে ও জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মুক্ত ও অসীম সৎ-চিৎ-আনন্দকে সসসী সৎ-চিৎ-আনন্দে সৃষ্টির যাহা কিছুকে সীমিত করেছে। এই সসীম ও অসীম সৎ-চিৎ-আনন্দের সমবায়ে বিশ্বরূপ।'[২৪]

শাক্ত দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাকালে উড্‌রফ বলিতেছেন—তন্ত্র শাস্ত্র সংসার বন্ধনকে সত্য ব'লে স্বীকার করে বলেই, সংসার মুক্তিও সত্য। আত্মার শক্তির দুইটি রূপ – বিদ্যাশক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি ও অবিদ্যা বা মায়াশক্তি। আত্মাই তার বিদ্যাশক্তিকে তারই অবিদ্যা শক্তির দ্বারা আবৃত করে রাখে। ব্রহ্মশক্তির স্বরূপ এই দুই শক্তির সমবায়ে। ব্রহ্মের বিশ্বলীলা শক্তিকে অবিদ্যা বা মায়াশক্তি বলা হয়। মায়া অর্থে "মিয়তের"—সীমিত বা পরিমিত শক্তি কিন্তু চির চঞ্চল। শাক্তাদ্বৈতবাদ ব্রহ্মের ঐ দুই শক্তিকে সমান ভাবে বিশ্বাস করে ব'লে উহা "লীলাবাদী"। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন দীলিপ রায়কে 'You know Dilip, I am a Tantrick and believe in Lilabad and not a Mayabadi'[২৫]

জান দীলিপ, আমি তান্ত্রিক, লীলাবাদে বিশ্বাসী, মায়াবাদী নই।

উড্‌রফ বলেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য সত্যজ্ঞানে শাক্তাদ্বৈতবাদী তন্ত্র সাধক ঐ স্বীকৃতি ভিত্তিক

(২০) শক্তি ও শাক্ত ২৩৭

(২৪) সারপেন্ট পাওয়ার ২৬-২৭, বাংলা তর্জমা।

(২৫) Aming the Great 206

মানসিকতা সাধন কালে যখন সমাক উপলব্ধি করে তখন সিদ্ধি করায়ত্ত ও সাধকের সত্তা মিথ্যা জ্ঞান ঘুচিয়া গিয়া আত্মচৈতন্যালোকে অখণ্ড প্রেমাস্পন্দনানুভূত রসাস্বাদনই তাহার মুক্তি।"[২৬]

উড্‌রফ তাঁহার তন্ত্র গ্রন্থগুলিতে দেখাইয়াছেন যে, মর্কট সাধকেরা তন্ত্র সাধনায় লিপ্ত হইয়া শাস্ত্র কথিত ও স্বকল্পিত কদর্য আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সহজাত বাভিচার বৃত্তি চরিতার্থ মানসে সাধনার শুচিতাকে এমন ভাবে হনন করে যে সাধনার উচ্চ লক্ষ্য একেবারে ভুলিয়া বসে। খুবই দুঃখের বিষয় যে, যাহারা তন্ত্রশাস্ত্র ও সাধনা বিষয়ে বিরুদ্ধ ও বিকৃত সমালোচনা করে তাহারা যথার্থই মর্কট সাধক। তাহারা তাহাদের সমভাবাপন্নদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকল্পিত শাস্ত্র ও সাধনাবিধি শাস্ত্র নির্দেশিত বলিয়া প্রতিপন্ন করাইয়া লইয়া শাস্ত্র ও সাধনাকে রোমান পাইলেটের মত কটূক্তি ও দোষারোপ করিয়া ভারতের প্রাচীনতম আর্যশাস্ত্রকে অজ্ঞান কুশিক্ষার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া চলিয়াছে।

অভিচার ক্রিয়া ও চক্র যাহার জন্য তথাকথিত পণ্ডিতগণ তন্ত্রশাস্ত্রকে হেয় প্রমাণ করিতে ব্যগ্রহস্ত, উডরফ বলিতেছেন যে, তাঁহারা শাস্ত্র পড়েননি বা পড়িয়া তাহার অর্থ সমাক উপলব্ধি করিবার মত যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নি। শাস্ত্র নির্দেশিত কঠোর কৃচ্ছতাপূর্ণ সাধন পথে সদ্‌গুরুর আশ্রয় ও নিরন্তর তাহার নির্দেশ না লইয়া সাধক যদি সাধনায় রত হয়, তবে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি বা প্রাণ নাশেরও সম্ভাবনা আছে।

উড্‌রফ বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন তাঁহার 'শক্তি ও শাক্ত' গ্রন্থের শাক্ত সাধনায় পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার অংশে যে, সাধারণ জনগণেরও তথাকথিত ইংরাজি শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবে পরিপুষ্ট ভারতীয় ও পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতদের তন্ত্রতত্ত্ব ও শক্তি সাধনা সম্বন্ধে ভুল, বিকৃত ও কদর্য ধারণা চলিয়া আসিতেছে ও সেই ধারণাকে দূরিকরণের জন্যই তন্ত্র তত্ত্ব ও শক্তি সাধনার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন মানসে তিনি ঐ শাস্ত্র যুক্তি সমন্বিত বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা মূল সংস্কৃত, বাংলা ও তিব্বতী ভাষায় লেখা আকর তন্ত্র গ্রন্থাদির ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া তাহার টীকা, টীপ্পনী ও ভাষ্য সহ গ্রন্থ করিয়াছেন।

তান্ত্রিক আকর গ্রন্থের (Tantric texts-গ্রন্থের খণ্ড) প্রথম খণ্ডে উড্‌রফ সর্বাগ্রে বিরচিত ইংরাজি অনুবাদে, তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকালীন বলেন "তন্ত্রশাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ গূঢ় রহস্যময় অর্থে ব্যবহৃত। প্রত্যেকটি সংস্কৃত বর্ণ ও পদের একটি গূঢ় ও গভীর রহস্যময় অর্থ আছে, প্রতিটি বর্ণের বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশেষ স্পন্দনাত্মক শক্তি rythmic vibratory force আছে, প্রতি বর্ণের বা পদের সূক্ষ্ম অর্থ আছে ও আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত শব্দ জ্ঞান সম্ভূত কোন বর্ণ বা পদের অর্থ তান্ত্রিক অভিধান স্বীকার করে না। উড্‌রফ কয়েকটি তান্ত্রিক অভিধান গ্রন্থ ও গ্রন্থাংশের তালিকা দিয়াছেন—

(১) তান্ত্রিক মূল সূত্র—১ম খণ্ড, (২) মন্ত্র বিধান বিজ্ঞান (রুদ্র যামল), (৩) একেশ্বরো কোষ, (৪) বিজ্ঞান ঘণ্টু, (৫) মাতৃকা নির্ঘণ্টু—২য় খণ্ড, (৬) মুদ্রা নির্ঘণ্টু—(বামকেশ্বরতন্ত্র), (৭) ষটচক্রনিরূপণ অংশ—শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের। উড্‌রফ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "ভারতীয় সাধারণের ও কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা যে, তন্ত্রশাস্ত্র পাগলের প্রলাপ, গাঁজাখুরি ও ব্যাভিচার অনুশীলনের শাস্ত্র।"

উড্‌রফ বলিতেছেন,—She, (Kundalini) Who shines like a chain of light as a lighting flash in the centres of the body, is the inner woman as embodiment of sakti otherwise called 'kundalini". What vira sadhak have the need of any other woman, as an embodiment of sakti in the physical plane, being however as a sublimated self, having controlled sexual desires and gratification by yogic (here kundalini) technique. The Divya sadhak or yogi unites within himself his own male and female principles which

(২৬) উড্‌রফের "শক্তি ও শাক্ত" গ্রন্থের ১৩ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

is the heart of the Lord (Hridayam Parameshitu) sakti and her Lord Siva. It is their union which is known as mystic coition.(২৭)

মূলাধারে শক্তি কুলকুণ্ডলিনী বিদ্যুৎবর্ণা জ্যোতির ঝলকে ঝলকে প্রতিটি দেহস্থ ষট্‌চক্র বা পদ্ম হ'তে পদ্মান্তরের প্রতিটি চৈতন্য ক্ষেত্রে উর্দ্ধগতিতে চক্রস্থিত শিবচৈতন্যের সঙ্গে রমণ করতে করতে হয় সহস্রারে পূর্ণ শিবচৈতন্যের সঙ্গে সামরস্যে সমবেতা। সাধকের ঐ আন্তরচৈতন্য স্তরের নিভৃত গূঢ় গহ্বরে কুণ্ডলিনী শক্তিই ঈপ্সিতা নারী। [অর্থাৎ ভৈরবী] ঐ নারী শক্তিরূপা মা মহামায়ারই স্ফুরিত সত্তা। বীরাচারী বা বামাচারী শক্তি সাধকের কোন বাহ্য শক্তি বা নারীর প্রয়োজন নাই। বাস্তব স্তরে ঐ তত্ত্ব সাধনকালে বীরাচারী কোন বাহ্যশক্তি গ্রহণ করলেও সে হ'বে সিদ্ধযোগী, বাসনা কামনাহীন উর্দ্ধরেতা। ঐ বাহ্যশক্তি যে সাধকের সাধন সঙ্গীনি হ'বে সেও হবে কামভূক ও উর্দ্ধ ওজস্বা। আজ্ঞার জাগে দিব্য সাধক নিজ সত্তাস্থ স্ত্রী ও পুরুষ এই দ্বিভাবের যে যুগলবদ্ধ সত্তার একত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূতি লব্ধ রসাস্বাদনে আপ্লুত হ'বে, তাই তন্ত্রের বীরাচার ক্রিয়ার গূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব। [ভৈরুণ্ড সংহিতা হ'তে উড্‌ডয়কের অনুদিত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য] [ঠাকুর রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, বামদেব ও শ্রীঅরবিন্দ দিব্য বীরাচারী ও অন্তর্যাগে রহস্যাবৃত যোগজ অনুকল্পিক পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সাধন সিদ্ধ। তাঁহাদের কোন বাহ্য ভৈরবী ছিল না] বামদেব বলিতেন,—"মা আমার আশ্চর্য ভৈরবী"। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা সারদার দিব্য আধারে শক্তি বা ষোড়শী পূজা করেন। উড্‌ডয়ক বলিতেছেন যে,—"পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে বীরাচার সাধনের লক্ষ্য যোগানুলব্ধ আনন্দ তত্ত্ব জ্ঞান। এ পথে স্খলন হ'লেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী"। (২৮)

উড্‌ডয়ক বলেন,—বীরাচার বা বামাচারে শক্তি সাধনকালে চক্র পূজার পঞ্চতত্ত্ব (বাহ্যিক) ব্যবহার কালে ভৈরবী বা শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—পূজ্যা ও ভোগ্যা। সাধক পূজ্যা শক্তিকে মহামায়া জ্ঞানে চক্রে পূজা ক'রবে। কলিযুগের মানুষ বীরাচার সাধনে কখনই গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হবে না যদি সে পূর্ণভাবে কামনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি সংযমে অপারগ হয়।

২৭। শক্তি ও শাক্ত—৪৪২।

২৮। উড্‌ডয়ক শক্তি ও শাক্ত—৪৪২ বাংলা তর্জমা।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দয়াময়ী নাম নিয়েছো
করবে বলে আমায় দয়া
মায়াতীত করো বলেই
নামটি তোমার মহামায়া ॥
চোখের জলে পূজলে চরণ
তোমার কাছে নিলে শরণ
হয় মা সহজ তোমায় পাওয়া
মেলে তোমার পদছায়া ॥

ভাগ্য আমার এমনি খারাপ
তোমার দিকে যায়না মতি
রাঙা পায়ে রাখো মোরে
তোমার কাছে এই মিনতি।
ভক্তি দাও মা হৃদয় ভরে
নাও মা মোরে আপন ক'রে
তোমার সেবায় থাকুক সদা
আমার মন আর আমার কায়া ॥

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—বিজ্ঞানী ও স্বপ্নদর্শী

লেখক—ডঃ শ্যামাদাস চ্যাটার্জী
(এমেরিটাস প্রফেসর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় D. Sc. F.N.T.)
ইংরাজী হইতে অনুবাদ—কুমারী জয়ন্তী চ্যাটার্জী

জন্ম ও শৈশব :

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু ওখানকার ডেপুটি কালেকটার ছিলেন। পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরের ক্ষুদ্র শহর ফরিদপুরের এক গ্রাম্য পাঠশালায় জগদীশচন্দ্র শৈশবে পাঠাভ্যাস শুরু করেন। এইসময় তাঁর প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল স্থানীয় প্রাকৃতিক ইতিহাস ও আবহাওয়া তথা পর্যবেক্ষণ ও গ্রাম্যমেলার যাত্রাভিনয়ের রসাস্বাদন ; এই সকল কাজে তাঁর সাথী ছিল কৃষক, ধীবর প্রভৃতি সাধারণ গোষ্ঠীর মানুষ। কালে এই গ্রাম্যযাত্রা তাঁকে বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য অধ্যয়নে উৎসাহিত করে।

এগার বৎসর বয়সে ইংরাজী শিক্ষার জন্য তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়। প্রথমে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স স্কুল ও পরে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে তাঁর বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সাক্ষ্যপত্র থেকে তাঁর অধীতবিদ্যাগত যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ
১০, পার্ক স্ট্রীট্, কলিকাতা
১৬ই জুলাই, ১৮৮০

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে— শ্রীমান জগদীশচন্দ্র বসু সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে দশ বৎসরকাল অধ্যয়ন করে। একজন বালক ছাত্ররূপে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ ক'রে সে ধীরে ধীরে কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হয়। ১৮৭৫ সালে সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় এবং পরে ১৮৭৭ সালে এফ. বি. এ পরীক্ষা পাশ করে। উভয় পরীক্ষায় ল্যাটিন তাঁর দ্বিতীয় ভাষা ছিল। ১৮৮০ সালে সে বিজ্ঞানের স্নাতক হয়। কলেজে বিজ্ঞান এবং গণিতে সে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। সংস্কৃত ভাষায় তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং ল্যাটীন ভাষায়ও তার অধিকার সমতুল্য। তার নৈতিক চরিত্র অন্য সকলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

স্বাক্ষরিত :
ডি, ডান, ইমপে এস, জে
অধ্যক্ষ

ইংল্যাণ্ডের প্রবাস-জীবন :

এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস্' পরীক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্তি হন। এই পরীক্ষার জন্য তাঁর পাঠক্রম ছিল ভৌত-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান। এই সময় Lord Rayleigh এবং Prof.Sydney Vines, তাঁর দুই অধ্যাপক, তাঁকে পড়াশোনায় প্রভূত সাহায্য করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. Sc. ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময় তাঁকে ভাগ্যের নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। তাঁর সমকালীন চিন্তার অংশ বিশেষ তিনি একটি

পকেট ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী অবলা বসু ঐ ডায়েরীটি বর্তমান লেখককে উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। আমি ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকার কিছু কিছু উক্তি এখানে উদ্ধৃত না ক'রে পারছি না।

৩০শে নভেম্বর ১৮৮২ :

"হে প্রিয়তম প্রভু, তোমার বিপথগামী সন্তানের আর্তস্বর শ্রবণ কর। সে দীর্ঘকাল নানা স্থানে ঘুরে বেড়াল কিন্তু শান্তি পেল না। তার জরাগ্রস্ত অন্তরে তোমার প্রকাশ ঘটুক। তোমার করুণায় তার আত্মা পুনরুজ্জীবিত হোক। পিতা! তোমার পরম নির্ভরপর দু'বাহু বাড়িয়ে আমার দীর্ঘ নিষ্ফল হতাশ আত্মচিন্তা থেকে উদ্ধার কর। এই হতাশা আমার মনোবল নষ্ট করেছে। আমি নিষ্ক্রিয় জীবন কামনা ক'রে তোমার দেওয়া মহৎ উচ্চাকাংখাগুলি বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু এখন আমার আর সে বাসনা নেই। আমার যা আছে তা সর্বোত্তম মঙ্গল সাধনের জন্যই আছে।"

কেম্ব্রিজ ; ৩০শে এপ্রিল ১৮৮৩, রবিবার :

"আজ জানতে পারলাম বম্বে মিল থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। আমাদের সব নষ্ট হল, এবার ফতুর হতে চলেছি।

সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল। আমি আর ও বিষয়ে চিন্তা করব না। এবার স্বপ্ন ছেড়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে। প্রতিকূল অবস্থার আঘাত মানবজীবনে প্রায়শই চরম সংকট ডেকে আনে। এই ঘটনায় আমার জীবনধারার মোড় ফিরতে বাধা কোথায়? কেন আমি ব্যক্তিগত সংকট অগ্রাহ্য করার শৌর্যের অধিকারী হব না? কেনই বা আমি কঠিন কর্তব্য থেকে আনন্দ আহরণ করতে পারব না? এ যাবৎ আমি প্রতিকূল অবস্থায় অন্যের স্বাধীনতা, অনমনীয়তা ও অদম্য গৌরববোধকে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি। আমি আমার নিতান্ত সাধারণ জীবনে ঐ সদ্‌গুণগুলির কিছুটা কি আহরণ করতে পারি না?"

২রা জুন ১৮৯৪ : (এখানে তিনি বিখ্যাত ইংরেজ কবি কার্ডিন্যাল নিউম্যানের অমর স্তবকটি উদ্ধৃত করেছেন)।

"Lead kindly light, amidst encircling gloom Lead thou me on
Lead thou me on, Keep thou my feet, I do not wish to see
The night is dark and I am far from home The distant scene—One step enough for me."

পরবর্তী পর্যায়ে ডায়েরীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিগুলির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখি।

৫ই মার্চ ১৮৮৫ ; রবিবার :

ক্যান্টীর অঞ্চলে যে বিপুল সৌরশক্তির অপচয় ঘটছে তাকে কোনভাবে কাজে লাগানো যায় কিনা সে বিষয়ে আমি বহুদিন ধরে চিন্তা করে এসেছি। গাছপালা সৌরশক্তির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সূর্যের বিকীর্ণ শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগাবার অন্য কোন উপায় কি উদ্ভাবিত হবে না? তাপীয় প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে সৌর এঞ্জিন নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এটি মূলতঃ একটি তাপশক্তি চালিত এঞ্জিন। দুই ভিন্ন পরিবাহীর কোন একটি সংযোগস্থলকে উত্তপ্ত ক'রে তাপ-বিদ্যুৎ প্রবাহ পেতে পারি। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ধরণের তাপ-বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর প্রচলন বড় একটা দেখা যায় না। অপচয়ী পরিস্রবণের জন্য বিপুল পরিমাণ শক্তি নষ্ট হয়ে থাকে। এখন আমার ভাবনা কি উপায়ে আলোক শক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়? সূর্যালোক ক্লোরোফিলের সাহায্যে Co_2 কে বিয়োজিত করে এবং তার ফলে কার্বনের পরিনাস ঘটে। গতিশক্তিকে বিশ্লেষিত ক'রে স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই রাসায়নিক বিয়োজনে লাল-হলুদ রশ্মির ভূমিকা সর্বাপেক্ষা সক্রিয়।

ধরা যাক্ বিয়োজনের CO_2 জন্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে বিকীর্ণ শক্তি যা বিশোষিত হয়েছে সেটি কোন্‌রূপে প্রকাশ পাবে? সম্ভবতঃ সেটা পাওয়া যাবে তাপশক্তিরূপে। কিন্তু বিকীর্ণ শক্তি থেকে কি আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি পেতে পারি?"

দিন কেটে যাচ্ছিল। হয়ত নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার দরুণ এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি করার অবকাশ তাঁর আর হয়ে উঠছিল না। অবশ্য এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয় বনস্পতির এক সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তিনি তাঁর নোট বইয়ে লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী মার্কিনী বিজ্ঞানী Melvin Calvin তাঁর স্বপ্ন সফল করেন। তিনি আবিষ্কার করেন উদ্ভিদের ক্লোরোফিল সূর্যালোকের প্রভাবে একটি অর্ধ-পরিবাহীকে ইলেকট্রন যোগাতে সক্ষম। Calvin পরিমাপ ক'রে দেখেছিলেন যে একটি ১০ বর্গমিটার ক্লোরোফিল আলোক-তল (Photo-element) থেকে এক কিলোওয়াট্ বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে অধ্যাপক Calvin-এর বম্বেতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি-বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদানের কথা ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আসতে পারেন নি। আমি অবশ্য তাঁকে স্যার জেঃ সি বোস এর ভায়েরীর একটি পাতার চিত্র-প্রতিরূপ (Photo-Copy) পাঠিয়ে দিই। ঐ পাতায় জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে উল্লেখ্য আলোচনা করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন—

বার্কলে ক্যালিফোর্ণিয়া
এপ্রিল ৩, ১৯৮০

Dear অধ্যাপক চ্যাটার্জী,

১৭ই মার্চ-এ লিখিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ আপনার পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সালোকসংশ্লেষ বিষয়ে স্যার জগদীশচন্দ্রের চিন্তা ও মন্তব্যগুলি খুবই আকর্ষণীয়। আমি এগুলি আগে কখনও দেখিনি। আমার সংগ্রহে এগুলি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আপনার বিশ্বস্ত,
Melvin Calvin
ডিরেক্টর

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক জীবন :

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর আত্মীয় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রথম শ্রেণীর সম্মানসহস্নাতকোপাধিক ও প্রাক্তন ছাত্র এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনকে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পরিচয়পত্র দেওয়ার জন্য, তাঁর বন্ধু পোস্টমাস্টার জেনারেল Mr. Fawettকে অনুরোধ করেন। বাড়ী ফেরার পথে সিমলায় জগদীশচন্দ্র ভাইসরয়কে এই পত্রটি দেন। কলকাতায় ফিরে তিনি তৎকালীন ডি. পি. আই-এর সঙ্গে দেখা করেন। ইতিমধ্যে লর্ড রিপন আই. ই. এস. এ জগদীশচন্দ্রের নিয়োগ অনুমোদন করে বাংলা সরকারের মাধ্যমে একটি পত্র ডি. পি. আই-কে দিয়েছিলেন। ডিরেক্টর এই নির্দেশে মোটেই খুশী হলেন না। নিতান্ত স্থূলভাবে তিনি জগদীশচন্দ্রকে বলে ফেললেন, "ওপর মহল থেকে নয়, নীচের মহল থেকেই আমার সঙ্গে এই ধরণের যোগাযোগ করা হয়। আমি আপনাকে প্রাদেশিক সংস্থায় (Provincial Service) কোন পদ দিতে পারি; যেখান থেকে ভবিষ্যতে আপনার পদোন্নতি হতে পারে।" জগদীশচন্দ্র এই অনুগ্রহ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। গেজেটে জগদীশচন্দ্রের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত না হওয়ায় ভাইসরয় বাংলা সরকারের কাছে এই বিলম্বের কৈফিয়ৎ তলব করেন। ওপর মহলের চাপে ডিরেক্টর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে

উঠলেন। তাঁর চিঠি পেয়ে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তিনি তাঁকে জানালেন, যে উচ্চতর পদে তিনি তাঁকে নিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছেন বটে তবে এই পদে তাঁর স্থায়িত্বের দাবী গ্রাহ্য করা হবে না। যদি জগদীশচন্দ্র স্বীয় কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন তবে তিনি (Director) তাঁর স্থায়িত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করতে পারেন।

যখন জগদীশচন্দ্র কর্ম শুরু করেন সে সময় সরকারী বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে একজন ভারতীয় অধ্যাপকের বেতন একজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল। কর্মে নিযুক্ত হয়ে জগদীশচন্দ্র দেখলেন তাঁর বেতনহার এই দুই-তৃতীয়াংশেরও অর্দ্ধেক যেহেতু তাঁর পদটি অস্থায়ী। অর্থাৎ এই কর্মের জন্য এ পর্যন্ত যে বেতনহার প্রচলিত ছিল, তাঁর বেতন তার এক-তৃতীয়াংশে। এই বেতন বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি তিন বৎসরকাল তাঁর মাসিক বেতন গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং এই আচরণে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করেন।

প্রায় তিন বৎসর অস্থায়ী পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অধ্যক্ষ (Mr. C. M. Tawney) এবং ডি. পি আই (Sir Alfred Croft) জগদীশচন্দ্রের উচ্চমানের কর্মকুশলতার মূল্য উপলব্ধি করেন। তাঁরা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধেও অবগত হন এবং ক্রমে উভয়েই তাঁর পরম বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে ওঠেন। ডি. পি. আই-এর মনোভাব পরিবর্তনের ফলে এক বিশেষ সরকারী আদেশে তিনি যে ঐ পদে শুধু স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হলেন তাই নয় তাঁর অতীত কর্মজীবনও বিবেচিত হল। এর ফলে তিনি ভূতপূর্ব তিন বৎসরের পূর্ণ বেতন একসঙ্গে পেলেন এবং এই অর্থের সাহায্যে তাঁর পিতার উত্তমর্ণদের ঋণ শোধ ক'রে দিলেন।

দীর্ঘ বত্রিশ বছরের কর্মজীবনান্তে ১৯১৫ সালে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে তিনি শিক্ষকতার চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উচ্চপদাধিকার এবং কর্ম বিশিষ্টতার বলে ডি. পি. আই-এর পদ তাঁর কাছে সুলভ হলেও প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকাকে তিনি শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে বেতন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনহারের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছে দেয়।

জগদীশচন্দ্রের স্বভাবসুলভ ঔদাসীন্য তাঁকে পদোন্নতি বিষয়ক চাকুরীজীবিদের সরকারী তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বিরত রাখে। যদি তিনি ঐ তালিকা পর্যবেক্ষণ করতেন তবে দেখতেন তিনি অনেকদিন পূর্বেই চাকুরী ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতনলাভের অধিকারী হয়েছেন। শিক্ষাবিভাগ নিজস্ব কারণে তাঁর পদোন্নতির কথা যথাসময়ে সরকারকে অবগত করায় নি। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে জনৈক নিম্নতর পদাধিকারীর উচ্চতম পদলাভের দাবী সরকারের গোচরে আসে। এই ঘটনার সাপেক্ষে অনুসন্ধান ক'রে সরকার জানতে চায় জগদীশচন্দ্রের অগ্রাধিকার কি কারণে বিবেচিত হয়নি? এই গাফিলতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়ায় সরকার হেজেটে জগদীশচন্দ্রের উচ্চতম পদপ্রাপ্তির সংবাদ ঘোষণা করে এবং তাঁকে তাঁর ভূতপূর্ব সকল প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেয়। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আজীবন পূর্ণ-বেতনভোগী সম্মানিত অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

"মানুষ হয়ে জন্মেছিস্, একটা দাগ রেখে যা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃতের সন্ধানে

ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু
সরস্বতী, বিদ্যাবারিধি, প্রজ্ঞাভারতী.
এম. এ , এল. এল.. ডি. ডি. লিট্, (অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)

প্রথম মানবশিশুটির জ্ঞানের উন্মেষ হইবার পরমুহূর্ত হইতে যে রহস্যটি তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, তাহা হইতেছে মৃত্যুরহস্য।

মৃত্যু হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই।[১] —তর্কশাস্ত্রের এই যে সার্বজনীন প্রতিজ্ঞা (Universal proposition) ইহা পাশ্চাত্য দেশে তর্কশাস্ত্রের উদ্ভবের বহুসহস্র বৎসর পূর্বে এই ভারতভূমিতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তখন হইতেই ঋষিগণ এই দুর্নিবার মৃত্যুর পরপারে আর কিছু আছে কিনা[২] এবং এই মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণের উপায় আছে কিনা,[৩] চিরন্তন মানবশিশু নাচিকেতার এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যে সর্বপ্রকার পন্থা ও উপায় অবলম্বনে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। 'মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া আমি যেন অমৃতলাভ করিতে পারি,[৪] ইহাই মানুষের আদিম এবং অন্তিম প্রার্থনা। এই প্রার্থনা কিরূপে সফল করা যায়, সনাতন ধর্মের প্রতিটি শাস্ত্রে তাহারই উপায় আবিষ্কারের প্রয়াস করা হইয়াছে।

বিভিন্ন ঋষির উত্তর ভিন্নরূপ, ইহা হইতে এই অনুমান সঙ্গত নহে যে তাঁহাদের উক্তিগুলি কল্পনাবিলাস মাত্র। পরন্তু ইহাই প্রমাণিত হইবে যে অবাধ মতস্বাধীনতার সহায়তায় বিভিন্ন ঋষি সর্বপ্রকার পথে একই সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গবেষণার বিশেষত্ব এই যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে উপলব্ধির অধিকার ও স্তরভেদ থাকিবার জন্য তাঁহারা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ধারণার নির্দেশ দিয়াছেন। এই পদ্ধতি যে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত সম্মত, পরস্পর বিরোধী নহে।

(ক) এই চিন্তাধারার প্রাথমিক বা স্থূলতম স্তরে এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে এই মর্ত্যলোকের ঊর্দ্ধে স্বর্গলোক বলিয়া একটি লোক আছে। যেখানে দেবগণ বাস করেন এবং তাঁহারা নরলোকের যাবতীয় দুঃখ শোক তো বটেই, জরা মৃত্যুকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া অনন্ত এবং অসীম আনন্দময় জীবন যাপন করেন।'[৫] অতএব স্বর্গলোকে গমন করিতে পারিলে 'অমৃতত্ব'[৬] লাভ করা বা অমর হওয়া সম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় প্রশ্ন উদিত হইল—কিসের সহায়তায় দেবগণ এই অমরত্বের অধিকারী হইলেন?

ঋগ্বেদের ঋষিরা সোমরস রূপ পানীয় দ্বারা দেবগণের স্তবন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের ধারণা হইল যে এই সোমরস পান করিয়াই দেবগণ অমিতবীর্য্য ও অমর হইয়াছেন[৭] এবং এই সোমরসরূপ 'অমৃত'[৮] পান করিলেই মানুষ স্বর্গলোকে গিয়া 'অমর'[৯] হইতে পারে।

এই যুক্তিতেই ঋগ্বেদের আদিতম সূক্তগুলিতে মানুষকে সাংসারিক ও দৈহিক তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে লইয়া যায় বলিয়া,

১। কঠ (১।১।২৮)'... জীবিতং মর্ত্যঃ কৃতঃস্থ্য (১।২।৬)—' পুনঃ পুনর্বিত্তমাপদ্যতে মে...' ; (২।১।১০)—' মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি...' ; ঐ (২।১।৪)—' .... স ইত্থ প্রত্যেব পুনর্জায়তে' ; প্রশ্ন ঃ (৩।১) .....পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈঃ ; গী, (২।২৭)—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' ; ভা (১০।১।৩৮) —'মৃত্যুর্জন্মবতাং দেহেন সহ জায়তে।'

২। কঠ (১।১।২০)।

৩। কঠ (১।১।২)।

৪। বৃ, (১।৩।২৮)—'...মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'।

৫। কঠ, (১।১।১২) 'স্বর্গলোকে ন ভয়ং...মোদতে

৬। কঠ, (১।১।১৩)।

৭। ঋক্ (৯।১০৮।৩-৪)।

৮। ঋক্ (৯।১১০।৪)।

৯। ঋক্ (৯।১১৩।৭-১১)।

সোমলতার রসকে অমরত্ব প্রদানকারী দেবতারূপে উপাসনা করা হইয়াছে।[১২-১৩] এই একই ধারণায়, যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ ও তর্পণ মন্ত্রে ঘৃতময় জল গণ্ডূষকে 'অমৃত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[১৪] সোমরস পান মানুষকে অক্ষয় অমৃতলোকে লইয়া যাইতে সক্ষম এই ধারণারই বিস্তৃতি করিয়া পুরাণে অমৃতমন্থন বিষয়ক উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হয়।

(ক্রমশঃ)

১০। এই অমৃত মধুরতম বলিয়া ঋগ্বেদে বহুস্থলে ইহাকে 'মধু' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা (১।১০৪।১, ১৩; ১।১১০।১১); যা, (৩।২—১০)। উপনিষদেও অনুরূপভাবে অমৃতসত্তাকে 'মধু' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—[বৃ, ২।৫।১—১১।৬।৩।৬···'মধু বাতা ঋতায়তে']।

১১। যথা (১।১১০।৫)·····'অজীজনো অমৃত···'; (১।১১৩।৭-১১) 'যত্র জ্যোতিরজস্রং···অমৃতলোকে ···মা অমৃতং কৃধী '।

১২। যথা (১।২); (১।১০৮)।

১৩। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমান যুগের নব-চার্বাকগণ তাঁহাদের মদ্যপতার সমর্থনে ঋষিগণ সোমরস পান করিতেন এই প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সোমলতাটি কি এবং কোথায় পাওয়া যায় তাহা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কি? ইহা বলবর্দ্ধক বলিয়া যাজ্ঞিক ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের কঠোর পরিশ্রমের সহায়ক বলিয়া পান করিতেন ইহার মাদকতা সম্বন্ধে বা এই রস পানের ফলে কোনও ঋষি অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কোনও শাস্ত্রে কথিত আছে বলিয়া জানা নাই।

১৪। যজু, (২।৩৪) 'উর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং

—:০:—

দিব্যমুপৈতি দিব্যম্

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

(মনুসংহিতা)

সর্ব শরীরে বর্ষিলে পূত বারি,
হ'য়ে যাবে তাহা সর্বদুরিতহারী।
মালিন্য সব যাবে,
শুদ্ধতা-ভাব পাবে,
লভিবে শৈত্য অঙ্গের হিতকারী।

ইন্দ্রিয়গণে কর সদা বশীভূত,
স্বকীয় ভাবে হ'বে তাহা আয়ত্ত।
ত্যজিয়া রাগ-দ্বেষ,
হিংসার কর শেষ,
অন্তরে হ'বে অমৃত উদ্ভূত।

কর তপস্যা, লভিও পরম জ্ঞান,
অন্তর মাঝে করিও স্বরূপ ধ্যান,
জীবনের গৌরবে,
আত্মা মুক্ত হ'বে,
শুদ্ধ বুদ্ধি বিকশিবে তব প্রাণ।

চিত্ত' তত্ত্ব হও তুমি অধিকার,
নিরুদ্ধ কর সকল বহির্দ্বার।
নিস্পৃহ সদা হও,
তাঁর পানে চেয়ে রও,
নিত্য সুখের পাবে তবে অধিকার।

—:০:—

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বদেশ প্রেম

অধ্যাপক প্রেমব্রত সেন

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মের দেশপ্রেমের মন্ত্রে একদিন দেশবাসীকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশ প্রেমের মন্ত্র গুরুরূপে তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত আবির্ভাব প্রথম যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ঘটিয়াছিল স্বদেশে নহে, বিদেশের মাটিতে। আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর বিশ্বব্যাপী মহিমার প্রথম উদ্ঘাটন। তাঁহার সেই ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশ ইতিহাসে নব অধ্যায় রচনা করিয়াছিল। ভারতবাসীকে তাহা সর্বপ্রথম জাতীয় আত্মগৌরবে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। বিশ্ব ইতিহাসে ভারতের দার্শনিক চিন্তা ও সাংস্কৃতিক সাধনার যে অসামান্য গৌরবময় ভূমিকা যুগে যুগে অক্ষয় কীর্তি সৃজন করিয়াছে স্বামীজীই প্রথম তাহার সম্পর্কে একই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে এবং তাঁহার দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই প্রথম আধুনিককালে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর এক মহা-সম্মেলনে ভারতবর্ষের অতীতকালের কীর্তি কথা জগতের বিভিন্ন দেশে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। সেই ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনে স্বামীজীকে আমরা দুইটি সুমহান ভূমিকায় প্রদীপ্তরূপে আবির্ভূত হইতে দেখি। একদিকে তিনি আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর জাতীয় আত্মগৌরবের উদ্গাতা। অপরদিকে মানব মৈত্রীর তিনি নবযুগ স্রষ্টা অবিস্মরণীয় আচার্য স্বামীজীর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বুঝিতে চাহিলে আমাদের স্বামীজীর মধ্যে এই দুই ভূমিকার আশ্চর্য সমন্বয়কে বুঝিতে হইবে।

আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে স্বামীজী যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আমরা দেখি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল আত্ম ঘোষণা। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, মহামিলনের মধ্যেই যে মানব কল্যাণের যথার্থ প্রতিষ্ঠা সম্ভব এই সত্য দ্বিধাহীন অকুণ্ঠিত সুরে স্বামীজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু মানবকল্যাণ চিন্তায় সমাহিত এই মহাযোগী এক মুহূর্তের জন্যও স্বদেশের বন্ধন মুক্তি ও দুঃখ বিমোচনের ভাবনা হইতে বিরত ছিলেন না।

দেশের জন্য যখন তিনি চিন্তা করিয়াছেন তখনই দুইটি বৈশিষ্ট্য তাঁহার সে চিন্তাধারাকে চিহ্নিত করিয়াছে। সে বৈশিষ্ট্য দেশের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গৌরববোধে এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাসে দেশকে নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখিবার তাঁহার নিশ্চিত আস্থার মধ্যে প্রকাশিত। কলম্বো হইতে আলামোড়া পর্যন্ত দেশ পরিক্রমাকালে তিনি দেশের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও ঐতিহাসিক কীর্তিগুলি যে বন্দনা রচনা করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নবমন্ত্ররূপে দেখা দিয়াছিল। স্বামীজীর ঐ কালের ভাষণগুলির মধ্যে দেশবাসীর স্বদেশ চেতনা দেশের বিভীষিকা অঞ্চলে একটি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ভূমি লাভ করিয়াছিল।

ইংরাজ শাসন ভারতবাসীর চিত্তে একটি গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ ইংরাজ শাসনকে আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্য জীবনধারা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছিল। এই পাশ্চাত্য প্রভাবকে আদ্যোপান্ত ক্ষতিকর বিবেচনা করা অনেক চিন্তাশীল ভারতীয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী যুগ প্রয়োজনে ভারতবর্ষের নিকট আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল তাহার স্বীকৃতি কেবল ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি-পুষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেও উচ্চারিত হইতেছিল। তাই কলিকাতায় হিন্দু কলেজ নামক পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঠস্থান স্থাপনে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রক্ষণশীল দলের নেতা রাজা রাধাকান্তদেব হিন্দু কলেজ

পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে ইংরাজ শাসনের সুফল সম্বন্ধে ভারতবর্ষে বিশেষ কোন বাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয় নাই।

কিন্তু রামমোহনের ন্যায় ইংরাজ শাসককে ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেবল ইংরাজ শাসন নহে, ভারতে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপনই যে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক—রামমোহনের এই মতবাদকে গ্রহণ করিতেও অনেকে সম্মত ছিলেন না। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের একটি অঙ্গ ছিল ভারতে ইংরাজ শাসনকে বিধাতার বিধান বলিয়া গ্রহণ করা। এই পরিবেশে ইংরাজ শাসনের কুফল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং দেশবাসীকে সে বিষয়ে অবহিত করা বিশেষ দুরূহ কাজ ছিল। সেই কঠিন কাজটি প্রথম যিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের বিখ্যাত প্রবন্ধ—"দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে বঙ্কিম স্বল্পতম পরিসরে ইংরাজ শাসনের সুফল ও কুফলের প্রকৃষ্টতম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের কৃষক গ্রন্থে বঙ্কিম ইংরাজ শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি বিস্তৃত রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রামের চাষা হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের কোন উপকার যে ইংরাজ শাসনের দ্বারা সাধিত হয় নাই একথা বঙ্কিম অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য ইংরাজ শাসনের জয়গান করিতে যে তিনি অক্ষম তাহাও বলিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। কারণ বঙ্কিমের দৃষ্টিতে অধিকাংশ ভারতবাসী এই হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের সমষ্টি। ইংরাজের ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষিত ভারতবাসীকে এমন প্রভাবিত করিয়াছিল যে সুরেন্দ্রনাথ ও গোখলের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘকাল কেবল আবেদন নিবেদনের নীতি ও ইংরাজ রাজত্বের চিরস্থায়িত্ব ব্যতীত অন্য কোন লক্ষ্যের কথা চিন্তা করিতে পারে নাই।

কিন্তু বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রেরণা শেষ পর্যন্ত ইংরাজ শাসন মুক্ত স্বাধীন ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মহাব্রতে ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত ও নিয়োজিত করিয়াছিল। ভারত সংস্কৃতি যে আগামী দিনের ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি-রূপে বিরাজ করিবে, ভারতবাসী যে ইংরাজ না হইয়া, ভারতবাসী থাকিয়াই পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবময় স্থান লাভ করিবে—বঙ্কিম-বিবেকানন্দের এই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করিবার সাধনায় পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিলেন অরবিন্দ, তিলক ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। আবেদন নিবেদনের পথত্যাগ করিয়া কংগ্রেস যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়যাত্রায় অগ্রসর হইল তাহার মৃত্যুহীন শক্তির মূর্ত প্রতীকরূপে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের বন্দনা গান এই সকল মহৎ দেশনায়কের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হইল।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রেরণা কি অতুলনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল এ তিন সংগ্রামী মহানায়কগণের উক্তিতে বারে বারে ব্যক্ত হইয়াছে। বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের মূলে ছিল ভারত ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামীজী গভীর পর্যালোচনা। আধুনিক যুগে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজী ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা। তাঁহার নিকট ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মর্মবাণীর পাঠ গ্রহণ করিয়া নিবেদিতা যে ভারত পরিচয়ের মহাব্রত উদ্‌যাপনে ভারতবাসীকে ডাক দিয়াছিলেন তাহার মধ্য হইতে নব আত্মচেতনার উদ্বুদ্ধ ঋষিগণ ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও তত্ত্বচিন্তার নব অধ্যায় রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আর পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষার পথে অগ্রসর না হইয়া স্বকীয়তার দীপ্ত সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জনের গৌরবলাভ ভারতীয় প্রতিভাকে পুরস্কৃত করিয়াছে।

ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে সচেতন করা ব্যতীত স্বদেশকে বিশ্বের চিন্তাজগতে নেতৃত্বের অবলুপ্ত পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীজী ভারতে স্বদেশপ্রেমকে নব ভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে ভারতবর্ষ একদিন যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, তিব্বত,

চীন, জাপান প্রমুখ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐ সকল দেশ হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহু জ্ঞানানুরাগী মানুষ জ্ঞান ও ধর্মলাভের জন্য ভারতে তীর্থযাত্রী রূপে আসিতেন। ঐ সকল দেশগুলির শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম শিল্প প্রভৃতি ভারতের অকৃপণ দানের দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বুদ্ধের কয়েক সহস্র বৎসর পরে বিবেকানন্দ সে ইতিহাসকে পুনরায় বাস্তব রূপ দিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আবির্ভাব শিক্ষাগুরুরূপে ভারতবর্ষকে পুনরায় বিশ্বসভায় অসীম মর্যাদার আসনে স্থাপিত করিয়াছিল। যেদিন ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভিক্ষাপাত্র হস্তে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে যাত্রা করা সেদিন বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শিক্ষালাভের জন্য নহে, শিক্ষাদানের জন্য। হার্ভার্ডে স্বামীজীর সেই স্মরণীয় বক্তৃতা ইতিহাসের যুগচক্র পরিবর্তন করিয়াছিল। ভারতবর্ষ যে কেবল পাশ্চাত্য জগতের কাছে শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হইবে—এই ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহে এই নূতন ধারা সংযোজিত হইল যে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য জগতে গুরুর ভূমিকাও গ্রহণ করিতে পারে। তবে বুদ্ধের শিষ্যেরা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার বাণীকে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ স্বয়ং আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে ভারতের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যগণ যেমন ভারতের বাণী প্রচারে একটি পরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দের ভক্ত ও সহচরগণও তেমনি একটি উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ধারার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই ধারার মধ্যে স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী ভক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত প্রচার প্রাচীন ভারতে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

দেশবাসীকে ভালবাসার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের জীবনে উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সর্বস্তরের ভারতবাসীর সহিত অন্তরঙ্গতম যে পরিচয় ক্রিয়াশীল হইয়াছিল তাহার তুলনা ভারতীয় স্বদেশ প্রেমের ইতিহাসে কেবলমাত্র মহাত্মাগান্ধীর জীবনেই দেখা যায়। পরিব্রাজে ভারত ভ্রমণকালে বিবেকানন্দ যেমন বিভিন্ন রাজামহারাজার প্রাসাদে গুরুরূপে বন্দিত হইয়াছিলেন তেমনি মুচি, মেথর প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষের গৃহেও তিনি নিকটতম আত্মীয়ের স্থানলাভ করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের দেশপ্রেম তাঁহার মানবপ্রেমের পরিপন্থী ছিল না। যত মত তত পথ—এই মহামন্ত্রের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মানস পুত্ররূপে তিনি ধর্মে ধর্মে ঐক্য প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, জাতিতে, জাতিতে, সংস্কৃতিতে, সংস্কৃতিতে মিলনের মহামন্ত্রও তাঁহার কণ্ঠে অপরূপ মহিমায় ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুঞ্জকে স্বামীজী ব্যক্তির চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ন্যায় জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি সেই জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন কোন ব্যক্তির নিজস্ব ভাব নষ্ট করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না বিবেকানন্দও তেমনি কোন জাতির ভাব বা চরিত্র বিনষ্ট করিতে অসম্মত ছিলেন। প্রত্যেক জাতির জাতীয় চরিত্র রক্ষার দ্বারা মানব সমাজে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বিস্তারই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাই শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে অগণিত বিদেশীর গৃহে পরমতম আত্মীয়রূপে গৃহীত ও আদৃত হইয়াছিলেন। দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমকে অখণ্ড ঐক্যের সূত্রে মিলিত করিয়া বিবেকানন্দের মহাজীবন মানব ইতিহাসে অতুলনীয় মহিমায় দীপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

—:—

পথের সন্ধানে

শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য

উপক্রমণিকা। যক্ষরূপী যম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল "কঃ পন্থাঃ" অর্থাৎ পথ কি। যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন—

বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥

—মহাভারত, বনপর্ব—৩১০।১১৪, ১১৭॥

অর্থাৎ, বেদ ভিন্ন ভিন্ন। স্মৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। এমন মুনি নাই, যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের স্বরূপ নিগূঢ়। মহাজনেরা যে পথে গিয়েছেন, সেই পথই অনুসরণীয়।

বেদ চারিটি, সুতরাং ভিন্ন। ঋগ্বেদ প্রধান এবং প্রাচীনতম। সামবেদ মুখ্যতঃ ঋগ্বেদের সুরকর্তার। যজুর্বেদ ঋক্‌মন্ত্রগুলির যজ্ঞে প্রয়োগ। এই বেদ গদ্যে নিবদ্ধ। এর নিজস্ব মন্ত্রও রয়েছে। অথর্ববেদ চতুর্থ। এরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আসলে বেদ নিত্য এবং অপৌরুষের শব্দরাশি। তা'হলেও, বেদের চতুর্বিভাগ স্বীকৃত।

স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রও বিভিন্ন। কুড়িজন প্রাচীন স্মার্ত বা ধর্মশাস্ত্রকারের নাম তো প্রসিদ্ধই রয়েছে। শ্রাদ্ধের পাত্রাদিবিচারে এই কুড়িজনের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

ওঁ মন্বোত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

অর্থাৎ, ধর্মশাস্ত্রকারেরা হলেন মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ।

তৃতীয়তঃ, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্", অর্থাৎ, এমন মুনি নাই যাঁর মত ভিন্ন নয়। প্রচলিত কথাও রয়েছে "নানা মুনির নানা মত।" বেদ এবং উপনিষদ মুনি-ঋষিদেরই উপলব্ধিনিঃসৃত বাণী। এই বাণীর বিভিন্নতাকে আশ্রয় করেই নানা দর্শন মত, এমন কি ছয়টি আস্তিক দর্শনের উদ্ভব হয়েছে।

দর্শনের বিভিন্নতা। বেদোপনিষদিক বাণী অনুধাবনের ফলেই যে ছয়টি প্রধান আস্তিক অথবা বেদে-বিশ্বাসী দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আলোচ্য। যথা—কপিলের সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগদর্শন, গোতমের ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, জৈমিনির মীমাংসা দর্শন এবং ব্যাসের বেদান্তদর্শন। পাশ্চাত্য দর্শন মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আস্তিকতার এবং অবিশ্বাস নাস্তিকতার লক্ষণ। কিন্তু ভারতীয় দর্শনমতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে নয়, কিন্তু আত্মার অস্তিত্বে এবং কর্মবাদ, জন্মান্তর এবং মুক্তি, এই বৈদিক সত্যগুলিতে বিশ্বাসই হলো আস্তিকতা এবং এদের অবিশ্বাস করাই নাস্তিকতা। এই কারণেই ঈশ্বরের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী সাংখ্য এবং মীমাংসা বেদে বিশ্বাসী বলে আস্তিক। মনুও বলেছেন, "নাস্তিকাঃ বেদনিন্দকাঃ" অর্থাৎ যাঁরা বেদের নিন্দক, তাঁরাই নাস্তিক। এই রকম নাস্তিক দর্শন প্রধানতঃ তিনটি। যথা—চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধদর্শন। এরা প্রত্যক্ষভাবে বেদনির্ভর নয়। কিন্তু বেদের প্রভাব এরা এড়াতে পারেনি। বেদের বিরুদ্ধতা সূত্রেই এদের শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় অনেকাংশে। এমন যে ঘোর নাস্তিক চার্বাক দর্শন, যার মতে আত্মা, কর্মবাদ, জন্মান্তর এবং মুক্তি মিথ্যা—ঈশ্বর তো মিথ্যা বটেই—সেই নাস্তিক দর্শনটিও ঋষি অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতির রচিত সূত্র থেকে উদ্ভূত বলে কথিত আছে।

দর্শনসমন্বয় প্রচেষ্টা। উপরোক্ত দর্শনগুলির মত-

বিভিন্নতা আলোচনা না করেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এরা বিভিন্ন। বিভিন্ন না হলে এরা এতগুলি না হ'য়ে একটিতে পরিণত হতো। কিন্তু ছয়টি আস্তিক দর্শন বিভিন্ন হলেও তারা ঐক্য সূত্রে সমান্বিত হতে পারে। এই সমন্বয় চেষ্টা করেছেন দার্শনিক ব্যাসাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু, যার ইঙ্গিত রয়েছে তৎপ্রণীত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায়। ন্যায় এবং সাংখ্যের বিরুদ্ধ মতের, যেমন আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে, সমন্বয়-সূত্র তুলে ধরেছেন তিনি। তিনি বলেছেন ন্যায়মত ব্যবহারিক ভূমিতে সত্য এবং সাংখ্যমত পারমার্থিক ভূমিতে সত্য। কোনোটিই মিথ্যা নয়।

সম্প্রতি আচার্যপ্রবর শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "উপনিষদ্‌রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" শীর্ষক মহাগ্রন্থে আস্তিক দর্শনগুলির আধ্যাত্মিক বা যৌগিক স্তরবিন্যাস করেছেন। উক্ত মহাগ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৩-৯৭ পৃষ্ঠাগুলিতে তিনি ছয়টি আস্তিক দর্শনকে একই পরমসত্যের স্তরভেদরূপে দেখিয়েছেন। গীতা শ্রীভগবন্মুখ নিঃসৃত অপৌরুষের বাণী। ছয়টি আস্তিক দর্শন হলো গীতারূপ পরমাত্মার সাকার রূপাশ্রিত ছয়টি কোষ। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত গীতারূপ পরমাত্মার যথাক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় বা বুদ্ধিময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। অথবা এই দর্শনগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নাই, আছে পরম্পরাগত স্তরভেদ। এরা একই জ্ঞানপ্রবাহের যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্তর। জিজ্ঞাসু পাঠক আচার্যদেবের উল্লিখিত পৃষ্ঠাগুলি অধ্যয়ন করুন। "দর্শনগুলি গীতার কোষ বা দেহ—গীতা আত্মা।"

সত্যপথ একটি। উপরের আলোচনায় একজন শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী পণ্ডিতের এবং একজন গৃহী শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের দর্শনসমন্বয় প্রচেষ্টা উল্লিখিত হলো। প্রত্যেকটি দর্শন সত্যপথসন্ধান, মুক্তিপথনির্দেশ। ভারতীয় দর্শন শুধু মননশাস্ত্র নয়, কিন্তু মুক্তিশাস্ত্রও বটে। যেমন সাংখ্যমতে প্রকৃতিপুরুষের বিবেকখ্যাতি বা ভেদজ্ঞানই মুক্তির পথ। পুরুষ যখন বুঝতে পারেন, তিনি প্রকৃতি হতে স্বতন্ত্র, সুখ, দুঃখ, মোহ প্রকৃতির ধর্ম, পুরুষের নয়, তখন পুরুষ তাঁর নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপে অবস্থিত হন, প্রাকৃতিক বিকারে অভিভূত হন না। আবার বেদান্তও পরমসত্য মোক্ষপথের নির্দেশক। জ্ঞানই মুক্তিপথ—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ।" আত্মা যখন বুঝতে পারেন যে তিনি পরমাত্মাই বা ব্রহ্মই——"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—তখনই তাঁর মোক্ষলাভ হয়। অন্যান্য দর্শনগুলিও—চার্বাক দর্শন ছাড়া—মুক্তিপথপ্রদর্শক। আমরা কিন্তু ভারতীয় দর্শনের এই সঞ্জীবনী স্বরূপ ভুলে একে তর্কের জালে আবদ্ধ করেছি।

আসলে পরমসত্যপথ একটি। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং বিধানম্॥"—(মুণ্ডক —৩।১।৬)। সত্যই জয়যুক্ত হয়। দেবযান বা দেবত্বে আরোহণের পথ সত্য দিয়ে গড়া, সত্য দিয়ে ভরা। আপ্তকাম ঋষিরা এই পথে গমন করে সত্যরূপ পরমার্থ লাভ করেন।" পথের আপাত অনৈক্য বা বহুত্ব এক অদ্বিতীয় পরমসত্যের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ঋষি দীর্ঘতমা বলেছেন, "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এক সত্যবস্তুকেই মনীষীরা বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"—এক হয়েও তিনি সর্বরূপ বহুরূপ স্বীকার করেছেন। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—কোথাও নানার বা বহুত্ব নেই। যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সদ্‌বস্তুকে বহুরূপে দেখে সে জন্মে জন্মে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে অগ্রসর হয়। এইসব এবং আরও অগণিত শাস্ত্রবাক্য একটি অদ্বিতীয় সত্যপথেরই ইঙ্গিত বহন করে।

কর্মযোগী বা ক্রিয়াযোগী, ভক্তিযোগী, জ্ঞানযোগী, রাজযোগী, পূর্ণাহুতিযোগী—সকলেরই পথবিভিন্নতা আপাতদৃশ্য বা ব্যবহারিক মাত্র। আসলে তাঁদের অনুসৃত পথ একটি - আত্মত্যাগের বিনিময়ে আত্মলাভ। সকল মত ও পথের চরম পরিণতি ঘটে এক, অদ্বিতীয় পরম সত্যে। ভগবানে কর্মফল অর্পণ করে নিষ্কাম বা নিরাসক্ত হওয়াই কর্মযোগ বা ক্রিয়াযোগের লক্ষ্য এবং পথ। ঈশ্বরে অহৈতুকী প্রেম বা পরানুরক্তি সাধনায় আত্মসমর্পণ ভক্তিযোগীর লক্ষ্য এবং পথ। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একাত্মতা বা তাদাত্ম্য

জ্ঞানই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য এবং পথ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গযোগের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে স্ব-স্বরূপে অবস্থানই রাজযোগীর লক্ষ্য এবং পথ। আবার, চরম আত্মসমর্পণে জৈব সত্তার সর্বাংশে অতিমানসের অবতরণ, ফলে এর দিব্য রূপান্তরই পূর্ণাঙ্গযোগীর লক্ষ্য এবং পথ।

"যত মত তত পথ"। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অভূতপূর্ব সাধনার ফল যে সব সূত্রে নিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে একটি প্রধান হলো "যত মত তত পথ"। আপাত দৃষ্টিতে এই উক্তিটি বহু সত্য পথের নির্দেশক বলে মনে হতে পারে। অথচ আসলে যে তা' নয় এটি দেখানোর প্রয়োজনে এই প্রসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণোক্তিটি আলোচ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "যত মত তত পথ"। তিনি কিন্তু বলেন নি—"যত উপলব্ধি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার তত পথ"। তাঁর উল্লিখিত সূত্রের পরিষ্কার উদ্দেশ্য হলো নানাপথ ও মতানুবর্তী ধর্মসম্প্রদায়গুলির ভেদবুদ্ধি দূর করা। উপলব্ধি হলো তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভূতি, তত্ত্বদর্শন করে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা। এই ভূমি নানা মতামত বা পথাপথের ঊর্ধ্বে, যেখানে সব অলিগলি পরমসত্যের রাজপথে মিশে গিয়েছে। অথচ নানা পথে ও মতে বিশ্বাসী ধর্মধ্বজীরা পথভ্রান্ত হয়ে অসহিষ্ণু রেষারেষি এবং হানাহানিতে লিপ্ত, যা' নিতান্ত অমূলক। নানা মত এবং নানাপথ আবিষ্কৃত হয়েছে রুচিভেদে এবং মনন ভেদে। মানস ভূমিতে পথের ও মতের অনেকত্ব অনস্বীকার্য। যতক্ষণ না বিভিন্ন মত এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন পথ এক ও অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ সঙ্গমে বা পরমসত্যে, নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে যাবার মত একাকার না হয়, ততক্ষণই মত এবং পথ বহু।

আসলে সব পথই এক পরমসত্যে একাকার। সব মতই পরিশেষে এক পরম তত্ত্বের উপলব্ধি। এই চরম ও পরম ভূমির নীচে মত ও পথের যত বিভিন্নতা। কারণ, মত হলো মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধিনির্মাণ। তদনুসারী পথও বুদ্ধির সৃষ্টি। কাজেই মতবিভিন্নতা এবং পথবিভিন্নতা কৃত্রিম। এরা স্বতঃসিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। অন্যদিকে উপলব্ধি হলো স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতঃপ্রমাণ। এর প্রমাণ এ' নিজেই। উপলব্ধি অকৃত্রিম, নিঃসংশয়। অপরিশুদ্ধ বুদ্ধি বা বিষয়মুখী বুদ্ধি মতপথের বিভিন্নতাকে একসূত্রে গ্রথিত করে না। সকলেই এক সচ্চিদানন্দ অমৃতের সন্তান, শুধু এই উপলব্ধিই নিশ্চিত ও স্থায়ী ঐক্যবন্ধনসূত্র। এই উপলব্ধির নীচে মত ও পথবিভিন্নতার স্থান।

মহাজনের পথ—মহাজন কারা?। তাহলে, "কঃ পন্থাঃ" প্রশ্নটির উত্তরে যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ", সেই উক্তির মর্মার্থ কি? উল্লিখিত আলোচনার পর এই উত্তরের মর্মার্থ দাঁড়ায়, মহাজনেরা এক এবং অদ্বিতীয় সত্যপথের পথিক। উত্তর বাক্যের "মহাজনো" এবং "পন্থাঃ" প্রথমা বিভক্তির একবচনান্ত পদ। মহাজনরা সংখ্যায় যতই হো'ন না কেন, তাঁরা এক অদ্বিতীয় পরমসত্যপথচারী। আবার পথের শাখা-প্রশাখা যত সংখ্যক হো'ক না কেন, আসল পথ একটি। কিন্তু যুধিষ্ঠির বলেন নি মহাজনেরা যে একটি পরমসত্যপথে বিচরণ করেছেন সেই পথটি কি। তিনি শুধু মহাজনদের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। যাঁদের পুণ্যবলে মহাপুরুষ-সঙ্গের ঘটেছে, যাঁরা মহাপুরুষের অশন, বসন, ভূষণ দেখেছেন তাঁদের প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভ করে বা তাঁদের শরণাগত হ'য়ে, সেই সব দুর্লভ ভাগ্যবানদের আলোচনা ক'রে বুঝাবার দরকার নাই, সেই পথটি কি। কিন্তু আপামর জনসাধারণ যাঁরা সেই সৌভাগ্য লাভ করেন নি, তাঁদের ভেবে দেখা দরকার মহাজন-অনুসৃত সেই পথটি কি।

এই প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। মহাজন কারা? জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা অসাধারণ এবং অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন, তাঁরা কি মহাজন ন'ন? তাঁদের পথ কি আমাদের অনুসরণীয় নয়? দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জীবনের বহুবিধ বিভাগে কৃতী এবং চিরস্মরণীয়রা কি নানাপথে সাধনা করে মহাজনের মর্যাদা লাভের অধিকারী ন'ন? তাঁদের অনুসৃত পথগুলি কি আমাদের অনুবর্তনীয় নয়? উত্তরে বলা যেতে পারে যে না, তাঁরা মহাজন নন। তাঁরা এমন ভূমিলাভ করেননি, যেখান থেকে বলা

যায়, "আমার সব চাওয়া পাওয়া হয়েছে, (প্রাপ্তং প্রাপনীয়ং) আমার চাইবার আর কিছু নাই, ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম", বলা যায় "শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নানাঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ॥ তাঁরা অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করে ব্রহ্মতত্ত্বের একাংশ পেয়েছেন মাত্র। তাঁরা স্বরাট্ হ'ন নি। তাঁরা এখনও প্রার্থী, আরও, আরও, আরও পেতে চান। কেউ হয়তো পাণ্ডিত্যের, কেউ বা অর্থের, ধনের, মানের, ক্ষমতার তুঙ্গে উঠেছেন, কিন্তু এমন যায়গায় ওঠেননি যার উর্ধ্বে ভূমি নাই। এক কথায়, তাঁরা ভূমাকে পাননি, পেয়েছেন অল্পকে, তা' আমাদের মাপে যত বেশী হো'ক না কেন। এ জন্যই একজন নিউটন বলে থাকেন, "আমি অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে নুড়ি কুড়োচ্ছি মাত্র"। এ জন্যই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগ থেকে অবসর নিয়ে পণ্ডিচেরীতে পূর্ণযোগসাধনায় দুষ্কর তপস্যা করেন। তাঁরা পূর্ণ বা অখণ্ড মহাজন নন। তাঁরা আংশিক বা খণ্ড মহাজন।

ব্রাহ্মী স্থিতি মহাজনের লক্ষণ। ব্রহ্মবিদ্যা পরাবিদ্যা। অন্যান্য বিদ্যা অপরাবিদ্যা। অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যাই প্রকৃত বিজ্ঞান—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্"। পরাবিদ্যায় মুক্তি অপরা বিদ্যায় বন্ধন। এই বিদ্যা ধর্ম, অর্থ এবং কাম সাধে। পরাবিদ্যা মোক্ষসাধে। অথবা অপরাবিদ্যায় লাভ হয় অভ্যুদয়। পরাবিদ্যায় লাভ হয় নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। "সা বিদ্যা পরমামৃতমেহেভুভূতা সনাতনী"। তা' বলে কি আংশিক মহাজনদের মত এবং পথ আমাদের অনুসরণীয় নয়? আমরা অখণ্ড পরাবিদ্যার খণ্ডীভূত অপরাবিদ্যার যে খণ্ডের সাধে হতে চাই, তং তং খণ্ডের প্রাপ্তিতে যাঁরা সিদ্ধকাম হয়েছেন, সেই সব খণ্ড বা আংশিক মহাজনদের মত এবং পথ অবশ্যই অনুসরণ করব। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে এঁতে আমরা এমন পাওয়া পেতে পারি না, যাঁর উপরে আর পাওয়া নাই, এমন কিছু জানতে পারি না যা' জানলে সব জানা হয়ে যাবে—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"। ব্রহ্মজ্ঞবরিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ীকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে সংসার ত্যাগ করতে চেয়ে ছিলেন। কাত্যায়নী তা'তে রাজী হলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, "এসব পেলে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করব"? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করলেন, "না এ'তে তুমি অমৃতত্ব পাবে না"। তখন মৈত্রেয়ী বললেন, বললেন, "যেনাহম্ নামৃতং স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্"? যাতে আমি অমৃতত্ব লাভ করব না, তা' দিয়ে আমি কি করব"? এমনই ছিল বেদোপনিষদিক ভারত। একজন গৃহবধূও জানতেন যে খণ্ডজ্ঞানে বা খণ্ড কিছুতে অমৃতত্ব নেই এবং অমৃতত্বলাভই পরমপুরুষার্থ।

মোটের উপর পূর্ণ মহাজনদের এবং আংশিক মহাজনের মত ও পথ বিভিন্নতা এই। প্রথমোক্তরা চলেছেন অখণ্ড, অবিভক্ত পরম একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর পথে, আর শেষোক্তরা চলেছেন খণ্ড, বিভক্ত অপরম বহুধা শাখান্বিত পথে। কিন্তু দুই পথেরই মূলমন্ত্র বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, সংযম, নিয়ম এবং ত্যাগ। এসব সত্যস্বরূপ পরমাত্মারই অঙ্গ। সত্যই যে পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম তাতে সন্দেহ নেই। "সত্যংপরং ধীমহি"—পরমসত্যকে ধ্যান করি। "ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা"—আমি এই জল (পাঠান্তর—এই আমাকে) জগৎকারণ সত্যরূপ পরমাত্ম-জ্যোতিতে আহুতি দিলাম"। এইসব এবং আরও অনেক বৈদিক মন্ত্রে সত্যের পরমাত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে।

সত্য পথচক্র—সত্য গতিশীল। সত্য নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু সত্যে সৃজিত, বিধৃত এবং নিহিত নয়, কিন্তু সত্য দ্বারা নিয়মিত এবং পরিচালিত। সত্য সক্রিয়, সত্য সর্বশক্তিসমন্বিত। "সত্যেন পন্থা বিততো দেববানঃ।" শক্তিস্বরূপ সত্যপথ চক্রাকার। তাই সত্যপথচক্রই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ধারক, বাহক এবং নিয়ামক।

এই সত্যপথচক্রের আদি হলো সত্যজ্যোতি পরমাত্মব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়ম্ আত্মলীন স্বস্বরূপে বহু হবার প্রথম স্পন্দন। "তদৈক্ষত অহং বহু স্যাম প্রজায়েয়"—তিনি ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব"। তিনি বহু হলেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন। গীতাবাক্য অনুসারে পরমাত্ম-

স্বরূপ বিষ্ণু ব্রহ্ম হলেন, ব্রহ্ম হতে সৃষ্টিকর্ম হলো. এই কর্ম হতে আরম্ভ হলো যজ্ঞ। তিনি নেমে আসতে লাগলেন সৃষ্টির উচ্চতর হতে নিম্নতর স্তরে। তাঁর সচ্চিদানন্দস্বরূপ আহুতি দিয়ে আত্মত্যাগ বা আত্মবিসর্জন করে করে অজ্ঞানান্ধকারে, অচিতির আবরণে বা জড়ে নিজেকে অবলুপ্ত করলেন। ফলে জগৎকে আমরা মনে করি জড়, অচেতন এবং ভগবান থেকে আলাদা। এমনই তাঁর আত্মাহুতি বা নিজেকে নিজের সৃষ্টি থেকে মুছে ফেলা। যজ্ঞ থেকে হলো পর্জন্য বা মেঘ। পর্জন্য থেকে হলো অন্ন এবং অন্ন থেকে হলো পাঞ্চভৌতিক জড় ও জীবজগৎ। এটি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অবরোহণ বা নেমে আসা রূপ সত্যপথচক্রের অংশ।

সত্যপথচক্রের অবশিষ্ট অংশ হলো ভৌতিক জগৎ হতে অন্ন, অন্ন হতে পর্জন্য বা মেঘ, পর্জন্য থেকে যজ্ঞ, যজ্ঞ হতে কর্ম, কর্ম হতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হতে পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুতে ঊর্ধ্বগতি। এই হলো সত্যপথচক্রের আরোহণাত্মক অংশে। অক্ষর পরমব্রহ্মই এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডরূপ যজ্ঞক্ষেত্রে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। মহাজনদের তত্ত্বদৃষ্টিতে এই ব্রহ্মাণ্ড একটি বিরাট যজ্ঞক্ষেত্র। এই যজ্ঞক্ষেত্রের অধীশ্বর স্বয়ং শ্রীহরি বা পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণু।

"ঔ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" ॥

এই মন্ত্রে জন্মান্তে ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করা হচ্ছে। তিনি যজ্ঞেশ্বর। তিনি তুষ্ট হ'লেই জগৎ তুষ্ট এবং তিনি প্রীত হলেই জগৎ প্রীত।

সত্যপথচক্রের তত্ত্বটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক তিনটিতে। যথা—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৩।১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩।১৫
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।" ৩।১৬

এই তিনটি শ্লোকে সত্যপথচক্রের অবরোহণ এবং আরোহণ গতিদ্বয় উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে ভূত—অন্ন—পর্জন্য—যজ্ঞ—কর্ম—ব্রহ্ম—অক্ষর পুরুষ, এই ক্রমে আরোহাত্মক বা ঊর্ধ্বমুখী ধারা। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে ব্রহ্মের অবরোহাত্মক বা নিম্নমুখী প্রবাহ সূচিত হয়েছে। তৃতীয় শ্লোকটিতে এই ব্রহ্মজন্মচক্র বা সত্যপথচক্রই যে আমাদের পূর্ণতালাভে উদ্দেশ্যে অনুবর্তনীয় বা অনুসরণীয়, এই বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই নিত্য, স্বাভাবিক যজ্ঞচক্রই পরম সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কৃপা এবং উপলব্ধি লাভের নিয়ামক। বিষয়টির অনাদ্যন্তপূর্ব রস নিসান্দিত হয়েছে আচার্যদেব শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের "উপনিষদ্‌রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" শীর্ষক মহাগ্রন্থের ৫৮৪-৬১৫ পৃষ্ঠাগুলিতে।

ত্যাগমুখী ভোগ ঃ পরমাত্মস্বরূপ ভগবান বিষ্ণু ভৌতিক পদার্থ থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত সর্বগতভাবে নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আত্ম-অঙ্গসংঠনরূপ কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে দিতে জড় ভূতে সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত বা অব্যক্ত হয়েছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সবই তিনি—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। তাঁরই থেকে পাওয়া আমাদের যথাসর্বস্ব—সমস্ত সত্তা, চেতনা আনন্দ। তিনি আমাদের বড় করার জন্যেই নিজেকে মুছে দিয়ে ছোট হয়েছেন। "তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তাই এসেছ নীচে। আমার নইলে, হে ভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে"। এই হলো ব্রহ্মযজ্ঞ, তাঁর পূর্ণ আত্মাহুতি। পরমপ্রেমস্বরূপ তিনি নীচে নেমে এসেছেন আমাদের ভালোবেসে।

তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যথাসর্বস্ব তাঁতে আহুতি দেওয়া, তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই তাঁকে পাবার, দিব্যস্বরূপে আরোহণ করবার একমাত্র পথ। আমাদের বলতে যা কিছু সবই তাঁকে নিবেদন করে ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রসাদরূপে ভোগ করাই পরমসত্যপথচক্রের পুনরাবর্তিত অংশে। সে জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন,—"ইষ্টান্‌ভোগান্‌হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ" (গীতা—৩।১২)। আমাদের ভোগদ্রব্যসামগ্রী দেবতাদের দান। "তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস তাঁদের না দিয়ে যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর"। ঈশোপনিষদের প্রথম

মন্ত্রেও ত্যাগমুখে ভোগ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রটি এই :

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্" ॥

"জাগতিক সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদনীয়। এই সব বস্তু জাগতিক, ঈশ্বরীয় নয়, এই অনাত্মবোধ ত্যাগ করে ভোগ্য বস্তুগুলি ভোগ করবে। আত্মা ভিন্ন অন্য কারু ধনে লোভ করবে না"। সবই তিনি এবং তাঁর। এই বোধই আত্মবোধ। সবই তিনি ছাড়া অন্য কিছু। এইটি অনাত্মবোধ। কবি রজনীকান্ত সেনের—"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ, তোমারই দেওয়া সুখ তোমারই অনুভব। তোমারি দেওয়া নিধি তোমারি কেড়ে নেওয়া আমার বলে কেন ভ্রান্তি হ'ল হেন, ভাঙ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব"—সঙ্গীতটি এই সুরে বাঁধা। ত্যাগমুখে ভোগ করাই উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য।

উপসংহার—সার্বভৌম পথ : যক্ষরূপী যক্ষের "কঃ পন্থাঃ" প্রশ্নের যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন—"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—তার মর্মার্থ বুদ্ধিবিচার অনুযায়ী আলোচিত হল। মহাজনেরা যে পথে গিয়েছেন তা'ই আমাদের অনুসরণীয় পথ। কিন্তু মহাজনেরা কোন্ পথে গিয়েছেন, যুধিষ্ঠির সেই বিষয়ে নিরুত্তর। শাস্ত্রের আলোকে আমরা দেখেছি মহাজনেরা সত্যের পথে, ধর্মের পথে, ত্যাগের পথে বিচরণ করেছেন। এই পথ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আত্মলাভের পথ। এই পথই সার্বভৌম পথ। এই পথেরই অবরোহণ চক্রাংশে এক, অদ্বিতীয়, সত্যস্বরূপ ভগবান বহুরূপে নেমে এসেছেন ধরণীর ধূলিতে। এই সর্বনিম্নস্তরে এসে সচ্চিদানন্দের স্বপ্রকাশ স্বরূপ আচ্ছন্ন, অবগুণ্ঠিত, সংগুপ্ত হয়েছে তাঁরই ইচ্ছায়। তিনি "রাজার রাজা হয়ে" দীন, হীন, ছিন্ন জড়ের দশাগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু এই নিম্নতম আত্মবিলুপ্তি, ঘোর তমাচ্ছন্ন অবস্থায়ও সেই অমিত পরাক্রম পরব্রহ্ম ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত চাপা পড়ে রয়েছেন মাত্র। তাঁর অনির্বাণ শিখা আবার উদ্ভাসিত করে জড়কে জীবের বিকাশে, জীবকে মানসের প্রকাশে, আবার মানসকে অতিমানসের অমৃতলোকে। এই আরোহণ পথ-চক্রাংশে অবরোহণ চক্রাংশের বিপরীত গতিতে পুনরাবর্তিত উদ্ভাস। মহাজনদের শুদ্ধ আধারে এই উদ্ভাস বা আরোহণ, অনাত্মভাব ত্যাগ করে আত্মস্বরূপ পূর্ণলাভের গতি সুস্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে। এই দিব্যপথের আরোহণ পর্বে মহাজনদের মর্ত্যজীবন হয় দিব্যান্বিত। তাঁদের উর্ধ্বস্পৃহী অন্তরাত্মা নিম্নাভিমুখী জৈব আত্মাকে জয় করেছে। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্"। উর্ধ্বমুখী আত্মা দিয়েই নিম্নমুখী আত্মাকে উদ্ধার করবে। এই গীতোক্ত ভাবনির্দেশ তাঁদের জীবনে মূর্ত হয়েছে জীবন্ত সত্যে। ব্রহ্মযজ্ঞের যজ্ঞশালায় ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে মহত্তম আত্মলাভের পথই মহাজন-সেবিত। এই হলো আত্মবলি দিয়ে আত্মোদ্ধারের পথ।

জনসাধারণ সন্ধানে মহাজনসেবিত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মলাভের পথে বিচরণে অনভ্যস্ত। তাঁরা কোন্ পথে চলবেন? তাঁরাও মহাজনদের পথে চলতে বাধ্য। বিশেষত এই মহাজনরা চলেন সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় এক হিরণ্ময় সত্যজ্যোতির পথে, আর জনসাধারণ চলেন অজ্ঞানে ঋজুকুটিল, বিপরীত পথে একই লক্ষ্যে। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"—ক্ষুদ্রে সুখ নাই, ভূমাই সুখ।" আমরাও চলেছি অসীম অতৃপ্তি, অনন্ত আকাঙ্খা নিয়ে। ধনী আরও ধনী হতে চায়, ক্ষমতার অধিকারী আরও ক্ষমতা চায়। এমন কি অংপাতের পথিক আরও গভীর নরকে প্রবেশে উদ্যত। ভূমার ক্ষুধা অশুদ্ধ আধারে নিম্নমুখী অসীমতায় পরিচালিত হয়। আঘাত, প্রত্যাঘাতে এই বিপরীত গতি ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসে যন্ত্রণাকালে।

সাধারণ জীবনেও আত্মত্যাগের মধ্যে আত্মলাভের জীবন। কিন্তু এই আত্মা আত্মস্থ নয়, দেহ ও জড়ের সঙ্গে তার জটপাকানো গ্রন্থি। সেই গ্রন্থিতে জড়িয়ে তার আত্মাহুতি হয় দেহে, ইন্দ্রিয়ে, মনে এবং তৎতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে। ফলে ভস্মে ঘি ঢালার মত, তার আত্মাহুতিতে চিদগ্নি বা আত্মশিখা প্রজ্বলিত হয় না। যেটুকু বা চিদগ্নি মৃদুভাবে জ্বলছিল, সেটুকুও নিভে যায়, তার আত্মযজ্ঞে। ফলে, বন্ধন আরও বদ্ধমূল হয়। মুক্তির আনন্দ আরও দূরে সরে যায়। সত্যপথচক্রের পথিক হয়েও আমরা বিফল হই।

সজ্ঞানে সার্বভৌম সত্যপথচক্রে আমাদের কেমন ভাবে চলতে হবে? এই বোধে চলতে হবে যে, আমরা এক এক জন স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক সত্তা নই। আমরা এক, অদ্বিতীয় সর্বসত্তাস্বরূপ পরমাত্মার অবিচ্ছিন্ন অংশ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, অহংকার, বুদ্ধি, সবই সেই পরম এক-এর যন্ত্রবিশেষ, যা' দিয়ে তিনি ব্যষ্টিরূপে কাজ করেন। আমাদের ব্যষ্টি সত্তা, পরিবার, প্রতিবেশ, সমাজ, অঞ্চল, পরগণা, জিলা, বিভাগ প্রদেশ, রাষ্ট্র, দেশ, মহাদেশ, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই ভিন্নস্তরীয় ক্রিয়াক্ষেত্র! আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা, কারিগরী, নীতি, ধর্ম, সৌন্দর্যবোধ, এককথায় আমাদের সত্তা, চেতনা, আনন্দ যেভাবেই প্রকাশিত, বিকশিত এবং পরিণত হোক না কেন, সবই তাঁরই আত্মাহুতি বা যজ্ঞফল। তিনিই অবতরণ করেছেন আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে। এই হলো তাঁর সত্যপথচক্রের অবরোহণাংশ। এই চক্রের অবশিষ্ট অর্ধাংশ পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। এখানেই আমাদের পুরুষকার। আমাদের সংসারক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, এবং ধর্মক্ষেত্র, কারণ কর্মই এই ক্ষেত্রের যজ্ঞ। আমাদের কর্মলক্ষ্য সেই পরমস্বরূপে স্থিতিলাভ, যাঁতে আমাদের জন্ম, স্থিতি এবং লয়, অথচ যাঁকে আমরা ভুলে গিয়েছি।

আমাদের সত্তাস্বরূপে আরোহণের পথ কর্মযজ্ঞ। সংসারক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে কর্তব্যসাধন করে যাওয়াই কর্মযজ্ঞ। "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (গীতা ১৮।৪৬)। পুরো শ্লোকটির মর্মার্থ হলো—ভগবান ভূতাদি (জড় ও জীবজগৎ) সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। স্বকর্ম বা কর্তব্য সাধন করলেই তাঁকে পূজো করা হয় এবং মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যথাকর্তব্য কর্ম করে যাওয়াই তাঁর পূজো। প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের, সমষ্টির প্রতি ব্যক্তির, আবার ব্যক্তির প্রতি সমষ্টির এবং সমষ্টির প্রতি সমষ্টির সম্বন্ধ ও পদ বা স্থান অনুযায়ী যথাবিহিত কর্তব্য করে যাওয়াই স্বধর্ম। এই স্বধর্ম পালনই সত্যপথচক্রের আরোহণরূপ অর্ধাংশ।

কিন্তু কেন আমরা এই কর্তব্য পালন করব? কর্তব্য না করেই যদি সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি হয়, তবে কর্তব্য পালনের জন্য ত্যাগ, সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন বৃথা। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যে স্বার্থসিদ্ধিলাভ, সে স্বার্থ নিম্নমুখী অথবা বিষয়মুখী। সেই স্বার্থ স্ব এর বা আত্মার স্বার্থ নয়। সেই স্বার্থ খণ্ডিত করে, অধঃপাতিত করে, আমাদের আত্মস্বরূপ হতে বিচ্যুত করে। সেই স্বার্থ আনন্দকর নয়, তার পদে পদে শঙ্কা, দ্বিধা, সংকোচ। সেই স্বার্থ প্রকৃত স্বার্থ নয়, স্বার্থবিরুদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, "মৈত্রেয়ী! পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মার কামনায় পতি প্রিয় হয়"। তেমনি "কোন বস্তুই ঐ বস্তুটির জন্য প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়।"

"ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি!" —(বৃহদারণ্যক ২।৪।৫)

এই আত্মা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। এই আত্মা সর্বগত, সকলের আত্মা। এই সর্বগত, বিভু আত্মার তৃপ্তি হলেই সকলের তৃপ্তি। তাই তাঁরই সেবা করছি এই বোধে ও নিষ্ঠার স্থান, কাল, পাত্রানুযায়ী যথাবিহিত কর্তব্য সম্পাদন করে যাওয়াই সত্যপথচক্রের আরোহণাত্মক অংশ।

তা'হলে "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নোত্তরের অর্থ দাঁড়ালো—মহাজনেরা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই আত্ম-সমর্পিত শ্রদ্ধায় তাঁদের কর্তব্য কর্ম করেছেন। এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগমুখী, ঈশ্বরনির্ভর চিত্তে যার যার কর্তব্য পালন করে যাওয়াই মহাজনসেবিত সত্যপথচক্রে ফিরে করা। কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই ফলাকাঙ্ক্ষা কর্মের মুখ্য প্রেরক বা প্রবর্তক নয়। কর্মের গৌণ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার বলে কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। অতিরিক্ত ফলাকাঙ্ক্ষা আত্মঘাতী। যে কর্মবৃক্ষে কর্মফল ফলে, অতিরিক্ত ফলাকাঙ্ক্ষা সেই বৃক্ষটিরই মূলোচ্ছেদ করে। শুধু কর্মেই অধিকার। কর্মফলে অনধিকার। "কর্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" দুর্লঙ্ঘ্য, চিরশাশ্বত এই ভগবদুপদেশ।

—:০:—

"মদ্‌বিভূতয়ঃ"

ডক্টর রমা চৌধুরী

এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি (অক্সফোর্ড) প্রাক্তন উপাচার্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৺শ্রীশ্রীমাতৃলীলার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ৺শ্রীশ্রীচ-ডী'তে অষ্ট মাতৃকার অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। এঁরা হলেন—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা। তাঁরা নানাভাবে ভীষণ যুদ্ধে অসুর বিজয় করলেন। (শ্রীশ্রীচণ্ডী—৮।১৩-২৩, ১০।৫-৬)।

তাতে শুম্ভ প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা নিশুম্ভকে প্রাণত্যাগ করতে দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে, পরমা দেবীকে বল্লেন—

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥

—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০।৩)

'হে বলগর্বে উদ্ধতে দুর্গে! করোনা গর্ব দর্পিণী।
অন্যের বল আশ্রয় ক'রেই তুমি আজ এই যুদ্ধকারিণী॥

॥ দেব্যুবাচ ॥

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময়োব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্‌।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা॥

—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০।৫-৬)

"একাই আমি জগতে বিরাজিতা, দ্বিতীয়া কে আছেন আমাকে বিনা।
দেখ্‌ দুষ্টা ব্রহ্মাণী সকলে আমার মধ্যেই হচ্ছেন বিলীনা॥

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, নীতিশাস্ত্রের একটী মূলীভূত নীতির কথা স্বতঃই মনে হয়। সেটী হল এই যে—শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। তার কারণ হল এই যে—স্বয়ং শক্তিমানই শক্তিতে প্রকাশিত হন। সেজন্য উভয়ের স্বরূপ এক ও অভিন্ন হতে বাধ্য। যেমন, দুগ্ধ ও ধবলত্ব—দুগ্ধে আছে দুগ্ধত্ব, ধবলত্বেও তাই; এটী হল তার গুণ। পুনরায় ধরুন দুগ্ধ ও শরীর পোষণ শক্তি—দুগ্ধের ন্যায় সেই শক্তিও সমানভাবে পুষ্টিদায়ক। এইভাবে, দ্রব্য ও গুণ, শক্তি ও শক্তিমান একই স্বরূপের দুটী দিক ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এক্ষেত্রেও, পরমা জননী ও তাঁর গুণ ও শক্তি প্রকাশিত করবার জন্যই এই ভাবে অষ্টমাতৃকার তথাকথিত সৃষ্টি করেছেন। এতে অনাদিকাল থেকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নারী মহিমারও একটী মনোরম উজ্জ্বল মূর্তি দেখে আমরা ধন্যাতিধন্য হই। প্রত্যেক নারীই স্বয়ং জগন্মাতার মূর্ত, জ্বলন্ত, জীবন্ত প্রতিমূর্তি—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

—(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৬)

"সকলই বিদ্যা তোমার ভেদরূপিণী।
সকলই স্ত্রী তোমার মূর্তি মনোহারিণী॥"—ঐ

॥ ওঁ শান্তি ॥

গানের কসরৎ

শ্রীকামাখ্যা নাথ ভট্টাচার্য

বাড়ী ফিরে এসেছি। কি করে যাই-হোক্ গোছের একটা চাকরি পাওয়া যায়, এ-সব আকাশ পাতাল ভাবছি, এমন সময় বাড়ীতে এক আত্মীয় নন্দনের আবির্ভাব ঘটল। ছেলেটির নাম নন্দ।

গানে নন্দর অসামান্য অনুরাগ। আমাদের বাড়ীতে কাউকে কোনদিনও গান করতে দেখিনি ; অথচ কি ক'রে যে একটা হারমনিয়ম্ কোন্ সূত্র ধরে এমন রস-বিবর্জিত গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল, তা কেউ জানে না।

ধুলোবালির স্তূপ থেকে ওটি আবিষ্কার করে নন্দ দুই একদিনের মধ্যেই গান-বাজনার বাড়ীতে এক অপ্রত্যাশিত তুফান সৃষ্টি করল। সেই তুফানের প্রবল ধাক্কায় ঘরের খুঁটি, দরজা, জানালা সবই ঠিক থাকল, কিন্তু আমি একেবারে উপড়ে কাৎ হয়ে পড়লাম। হারমনিয়মের প্রাণান্তকর শব্দে পাড়ার সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পেল, সঙ্গীত জগতে এক নতুন অবতারের জন্ম হচ্ছে। যন্ত্রটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলিই টিপতে লাগলাম বটে, কিন্তু মনে হল যেন অতর্কিতে কার গলা টিপে ধরেছি, আর অসহ্য যন্ত্রণায় জীবনের শেষ চিৎকারে সে সাহায্যের জন্য আর্ত আবেদন প্রচার ক'রে চলেছে।

গানের নামে আমার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বের হতে লাগল, তা ও এক ধরনের কর্কশ চিৎকার ছাড়া আর কিছু নয়। এমন যে নন্দ, সেও পর্যন্ত আমার কণ্ঠস্বরের তীব্রতা ও মাধুর্যে শঙ্কিত হয়ে অসহায়ভাবে আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাতে বাধ্য হল। নন্দকে দোষ দিয়েও লাভ নেই, কারণ নিজের গলার শব্দে আমি নিজেই মাঝে মাঝে আঁতকে উঠতাম। এমনও মনে হত, বুঝিবা একটা আস্ত গাধা আমার গলায় আটকে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ চিৎকার ক'রে চলেছে।

নন্দর মনে কি অভিপ্রায় ছিল তা জানি না। একদিন সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করল। কোকিলের ডিম খেলে নাকি গলার স্বর অতিশয় মধুর হয়। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না ক'রে যে ভাবেই হোক বস্তুটি সংগ্রহ করতেই হবে। ভাবলাম নন্দ ঠাট্টা করছে। কিন্তু সে ভারতের বহু বিখ্যাত গায়কের একের পর এক নাম ক'রে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করল, ওনারা সকলেই কোকিলের ডিম খেয়ে সঙ্গীত সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তাছাড়া এত কথার দরকারই বা কি ? নন্দ স্বয়ং খেয়েছে এবং আরও খাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ক্রমেই মনে হতে লাগল কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। মুরগী ও হাঁসের ডিমে যদি এত স্বাস্থ্য ও শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, তবে কোকিলের ডিমেই বা কণ্ঠমাধুর্য থাকতে বাধা কোথায় ?

কিন্তু সমস্যা হল, ডিম সংগ্রহ করা যায় কি ক'রে ? কোকিল আর্টিস্ট ! বাসার মত বাজে জিনিষ তৈরী করার মত তার না আছে প্রবৃত্তি, না আছে সময়। কাকের বাসায় ডিম প্রসব ক'রেই সে খালাস।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে নন্দ পাড়ার সমস্ত গাছ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লেগে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি গাছে কাকের বাসার সন্ধান মিলল।

একদিন দুপুরবেলা। পাড়ার সকলেই তখন দিবানিদ্রায় মগ্ন। আমরা যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়ে সেই গাছতলায় চলে গেলাম। নন্দ বাড়ীর অতিথি। সুতরাং আমাকেই গাছে উঠতে হল।

ইতিমধ্যে আমাদের মন্দ অভিপ্রায় বুঝতে পেরে কাক-গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেল। দেখতে দেখতে বহু কাক সেখানে এসে উপস্থিত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মহা হাঁকডাক শুরু করে তারা সমস্ত

পাড়া মাত করার উপক্রম করল। আমি যতই তাড়াতাড়ি ক'রে উপরের দিকে উঠতে থাকি, কাকগুলিও ততই মারমুখী হয়ে আমাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে চতুর্দিক থেকে আমার মাথার উপর ঘনঘন উড়ে আসতে লাগল। প্রথমে ব্যাপারটা তেমন গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু একটু পরেই অবস্থাটা বিশেষ সুবিধাজনক নয় দেখে বিপদের কথাটা নন্দকে জানালাম। নীচ থেকে আমাকে অভয় বাণী শুনিয়ে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে সে কাকগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা ক'রে চলল। ঈপ্সিত বস্তুর প্রায় কাছাকাছি গিয়েছি, এমন সময় একটা দারুণ তেড়িয়া কাক আমার মাথার উপর ছোঁ মারার তাল করতেই আমি একেবারে বেতাল হয়ে পড়ে গেলাম। কোনরকমে একটা ডাল ধরে অবধারিত পতনের হাত থেকে সে যাত্রা নিস্তার পেলাম।

কিন্তু সেদিন থেকে ঐ অঞ্চলের বিশাল কাক-সম্প্রদায় আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলল। ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই ওরা আমাকে এমন ক'রে তাড়া করতে থাকে, যে শেষ পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে নেহাৎ আত্মরক্ষার তাগিদে মাথায় একটা বড় পাগড়ি বাঁধতে বাধ্য হলাম। এতে ফল হল একেবারেই বিপরীত। কাকেরা ধরে নিল, বুঝিবা ওদের বিরুদ্ধে আমি একটা নতুন অভিমানের ফন্দি হিসাবে মাথায় কাপড় জড়িয়েছি। অল্প সময়ের মধ্যেই কাকের সংখ্যা দ্বিগুণ হল এবং তাদের আক্রমণের পদ্ধতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠলো। শুনলে লোকে অবিশ্বাস করবে, কিন্তু আসলে কথাটা সত্য। সে যাত্রা নন্দের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য তাদের বাড়ী গিয়ে আমাকে কাকের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে হয়েছিল।

কোকিলের ডিম খেতে পারলে কি হত জানিনা, কিন্তু না খেয়েই সঙ্গীত বস্তুটাকে কিছুদিন এমন নাড়াচাড়া ক'রে দিলাম, যে গন্ধর্বলোকের কিন্নরীরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

নন্দদের বাড়ী থেকে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। নন্দ আমাকে এই কথাটা অনবরত বুঝিয়ে ছিল যে, পাড়া-পড়শীরা যতই উত্যক্ত হবে, ততই জোরে গলা সাধতে হবে। যখন তারা ঢিল নিক্ষেপ শুরু করবে, তখন বুঝতে হবে, সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত প্রায়। মোট কথা—মশা-মাছি যানিকটা উৎপাত করে বলে মানুষ যেমন বাড়ী ঘর ছেড়ে বনবাসে যায় না, তেমনি লোক উত্যক্ত হয় বলেই সঙ্গীত শিক্ষা কখনো বন্ধ হতে পারে না।

এইভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার বর্ম-বর্মে নিজেকে রীতিমত দুর্ভেদ্য ক'রে সঙ্গীতের নামে কয়েকটা দিন একেবারে মাতাল হয়ে উঠলাম।

দিন কয়েক অবিরত চিৎকার করার ফলে গলার শিরাগুলি ফুলে উঠল। একদিন সকালে উঠে কথা বলতে গিয়ে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন কর্ণের রথচক্র মাটিতে ঢুকে গিয়েছিল, আমারও বাক্‌শক্তি ঠিক তেমনি একেবারে বুকের ভিতর ঢুকে বসে গেছে। সারাদিন অনেক চেষ্টা করেও একটি সামান্য শব্দ পর্যন্ত ভিতর থেকে টেনে আনা গেল না। একেবারে খাঁটি স্বরভঙ্গ।

ফুটবল খেলোয়াড়ের পা ভেঙ্গে গেলে তার যে দুর্গতি হয়, গলা ভেঙ্গে গীত-বাদ্যের রাজ্যে আমার অবস্থা হল ঠিক সে রকম। ছিপি আঁটা ফ্লাস্কের গরম বস্তু নিজের উত্তাপে নিজেই অনবরত দগ্ধ হতে থাকে। কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে এক নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় আমার সমস্ত সঙ্গীত দাপাদাপি করতে লাগল।

চিৎকার ক'রে নিজের যতখানি না প্রচার হল, গলা ভেঙ্গে দু' একদিনের মধ্যেই তার চেয়ে অনেক বেশী প্রচারিত হয়ে পড়লাম। সকলেই বোধ হয় বিধাতার কাছে নীরবে প্রার্থনা করতে লাগল যেন এই ভাঙ্গা গলা আর কোনদিনও জোড়া না লাগে। বাইরের আচরণে অবশ্য আমার এই দুর্গতিতে ওরা এমন ভাব দেখাতে থাকল যেন আমার গলা ভাঙ্গার আঘাতে ওদের হৃদয় ভেঙ্গেছে। এদিকে আদা, নুন, তুলসীপাতা ও গরমজলের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী দাওয়াই খেতেই হল। ডাক্তার প্রতিবেশী, বিলক্ষণ চেনা-জানা লোক। আমার গানের বেলা তাকেও দস্তুরমত সামলাতে হত। শুশ্রূষের সঙ্গে তিনি আমাকে যানিকটা উপদেশ না দিয়ে ছাড়লেন না।

বললেন—গান শিখছ, খুবই ভাল কথা। গলার স্বরের আর এক নাম নাদ-ব্রহ্ম। তার সাধনাকে মহৎ কাজই বলতে হবে; কিন্তু সেজন্য চিৎকার ক'রে গলার দফাটি নিকাশ করতে হবে এমন কোন কথা সঙ্গীত শাস্ত্রে আছে কি? গাধাও তো কম চিৎকার করে না; কিন্তু তাতে কি তার গলার মাধুর্য বাড়ে? তোমার ভালর জন্যই বলছি, অত চিৎকার করো না। গলায় একেবারে ঘা হয়ে গেলে কিন্তু শেষটায় গান ছেড়ে প্রাণ নিয়ে টানাটানি লেগে যাবে। গলা দিয়ে ভাল ক'রে শব্দ বের হয় না তখনো। তাই চুপ করে গেলাম। মহৎকার্যে বহু বিঘ্ন আসে। মনে মনে নন্দর উপদেশগুলি স্মরণ করে কর্তব্যে স্থির থাকার শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলাম।

অবশ্য, গলা ক্রমে ক্রমে খুলে গেল। আবার সঙ্গীত সাধনা নতুন করে শুরু করলাম। চারিদিক থেকে খোঁচা খেতে লাগলাম কিন্তু গান এত সহজে আমি ছাড়লাম না। বাড়ীর এক গুরুজন (স্ত্রী) আর ধৈর্য ধরতে না পেরে পষ্টাপষ্টি আমাকে বলেই ফেললেন, ভগবান আমাকে যা গলা দিয়েছেন তাতে শুধু কথাই বলা চলে, গান একেবারেই চলে না। আমিও তাঁকে আরও স্পষ্ট ক'রে শুনিয়ে দিলাম, গান কন্তুলা জাহাজও নয়, রেলগাড়ীও নয় যে সমুদ্রের জল বা লোহার লাইন পাতা না থাকলে সেটা চলতে পারে না। গলা দিয়ে যদি কথাই বের হতে পারে, তবে গানও বের হতে পারবে। মাটির মতন এমন অপদার্থ বস্তুতে বীজ ছড়িয়ে দিলে যদি আলু, পেঁয়াজ, ধানগাছ গজিয়ে উঠতে পারে তবে গলার মত এমন সযত্ন রক্ষিত স্থানে এত চেষ্টা করেও গানের মত একটা ফসল ফলাতে পারব না, এ কোন কাজের কথা নয়। সুতরাং গলার গান না থেমে আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল।

আমার সেই গুরুজনের এক জামাতা কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরালয়ে বেড়াতে এল। কন্যাকে উদ্ধার করে বলে জামাতা দেবতুল্য। বয়স তেমন কিছু না হলেও, ঐ জামাতার চালচলনটা বেশ ভারিক্কি ধরনের। কোন্ কথায় হাসবেন এবং কোন্ কথায় তিনি রাগবেন তা ঠিক মতন বুঝতে পারা কঠিন ছিল। শ্বশুর গৃহ থেকে প্রচুর পরিমান ক্ষীর, ননী, পিঠে, পায়েস উদরে বোঝাই ক'রে কয়েকদিন পর জামাতা বাবাজীবন স্বগৃহে প্রস্থান করলে সেই পূর্বোক্ত গুরুজনটি আমাকে শুনিয়ে একদিন যা বললেন, তাতে খুব থতমত খেয়ে গেলাম। জামাতা নাকি বিদায়ের আগে তাঁকে বলেছেন, আমার গান কানে গেলেই তার মাথার ভিতরটা কি রকম করতে থাকে। তাই, আরও দু'চারদিন থাকার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার গানের আতঙ্কেই তাকেই তাকে আগে চলে যেতে হল।

চামড়াটা বড়ই গণ্ডারের মত হোক না কেন, এ কথা শোনার পর নন্দর উপদেশ আর পালন করা চলে না। ক্ষোভে ও অপমানে জ্বলতে জ্বলতে গান একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলাম।

—:০:—

শারদ-প্রাতে

অরুণ নীল

শিউলী ফুলের গন্ধে ভরা
তোমার আমার আভাষ যেন
বর্ষা শেষে শরৎ আসে
আকাশ বুকে শুরুই হল
শিশির ধোওয়া শিউলী ফুলে
আগমনীর আগমনে
এমনি ক'রেই বারে বারে
সোনার রবি আগমনীর
ধরার আঙ্গিনায়
বারে বারেই পাই ॥
কাশ বনেরই মেলা
শুভ্র মেঘের খেলা ॥
গাঁথাই হল মালা
সাজাও বরণডালা ॥
শরৎ যখন আসে
আসার আশায় হাসে ॥

সোহাগমাখা মায়ের স্নেহ
ভরায় জানি আনন্দেতে
জগমাতা সারদামা
বারে বারে তাইতো আসেন
তোমার চরণ পদ্মমূলে
প্রণাম তোমায় বারেক নমি
আগমনীর গান
সবার হৃদয় প্রাণ ॥
দুর্গা স্বরূপিণী
দুঃখ বিনাশিনী ॥
রইল মোদের নতি
দূর কর দুর্গতি ॥

গুরু-শিষ্যের কলকাতা

ডঃ ঝরা বসু

কেউ বলেন দুঃস্বপ্নের শহর, কেউ বলেন মিছিলের শহর, কেউ বলেন ভিখারীর শহর এই কলকাতা। জরাজীর্ণ কলকাতার এই দুর্নাম দূর করার উদ্যোগ চলেছে। সরকারী বেসরকারী নানা সংস্থা কলকাতাকে বক্সোলিনী করবার সংকল্প নিয়েছে। কিন্তু কলকাতা তো বৃদ্ধা নয়। মহানগরীর ইতিহাসে সে নিতান্তই তরুণী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল জবচার্ণক সুতানটীতে কুঠি স্থাপন করার সনদ পান ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে। আউরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শানের কাছ থেকে এই কোম্পানী ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি গ্রাম কেনার অনুমতি পায়। ভাগিরথীর পূর্বদিকে সুতানটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর—তিনটি গ্রাম ছিল। সেই সময়ের সুতানটী আজকের দিনের চিৎপুর, বাগবাজার, শোভাবাজার ও হাটখোলা, ধর্মতলা, বহুবাজার, মির্জাপুর, সিমলা, ও জানবাজার ছিল কলকাতা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। হেস্টিংস, ময়দান ও ভবানীপুর জুড়ে ছিল গোবিন্দপুর গ্রামের অস্তিত্ব। ব্যবসায়ী ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনেই এই তিনটি গ্রাম জুড়ে নগর পত্তন করে। কলকাতা মহানগরী সম্পূর্ণ ইংরেজদের তৈরী। তিন গ্রামের মধ্যে কলকাতা নামটিই টিকে থাকল। কারণ কলকাতা গ্রামে ছিল ইংরেজদের বসতি। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাস থেকে কলকাতা নামটি প্রচলিত হল। এর আগে কোম্পানীর দলিল দস্তাবেজে অবশ্য সুতানটী নামটিই ব্যবহৃত হত। ইংরেজের প্রয়োজনে কলকাতার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম দুনিয়ার সরাসরি যোগাযোগ হয়েছিল। এইজন্যই কলকাতা এত দ্রুত উন্নতি করেছিল। শুধু বাণিজ্যিক লেনদেন নয়। সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে কলকাতা অতি দ্রুত এগিয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা ইংরেজদের দিয়েছে দেশজ সম্পত্তি উজার ক'রে, কখনও বা নিজে অভুক্ত থেকে—আবার নবজাগরণের (রেনেসাঁস) সম্পদ দুহাত ভরে তুলে নিয়েছে। তাই শতাব্দীকালের ব্যবধানে কলকাতা সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতিবানের প্রচণ্ড ফলপ্রবাহে ভারতের অন্তর্মুক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে এই কলকাতা থেকেই। কলকাতায় জন্মেছেন বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান। শুধু পণ্ডিতজন নন, নরনারী পরিত্রাতা বহু সাধু-সন্ন্যাসীর জন্মও এই কলকাতায়।

কলকাতা কলির মহাতীর্থ। যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও তাঁদের যোগ্য সন্ন্যাসী ভাইয়েরা কলকাতায় বসেই যুগমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। এইখানেই এসেছেন বিংশ শতাব্দীর যুগদেবতা। তিনি সত্যানন্দদেব। স্বামী সত্যানন্দদেবের মন্ত্রগুরু স্বামী অভেদানন্দ। এই দুই সন্ন্যাসীর লোকাতীত ধ্যানধারণা, ত্যাগ-তপস্যার মাঝে মধ্যে ধরা পড়েছে লোকায়ত বস্তুবিশ্ব। দু'জনেরই মহাজীবনের ভূমিকা তৈরী করেছে কলকাতা। কলকাতায় তাঁদের জন্ম। কৈশোর, যৌবন, সন্ন্যাসজীবন, অন্তিমজীবন ও জীবনাবসান এই গঙ্গার তীরবর্তী মহানগরীর বুকে। গুরু-শিষ্যের কলকাতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের রচনাবলীতে।

আহেরীটোলার ২২নং নিমু গোস্বামী লেনে ১৮৬৬ খ্রীঃ অভেদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতারও জন্মস্থান কলকাতা। অভেদানন্দ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর মার্কিন মুলুকে কাটালেও দেশে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেছিলেন বারবার। মার্কিনী দেশের লোভনীয় নাগরিকত্ব, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপকের মূল্যবান পদ অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রে তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দার্জিলিং-এ আছে তাঁর স্থাপিত বেদান্ত আশ্রম। দার্জিলিং থেকে একবার কলকাতায় ফিরে আসছিলেন। তখন একটি

রেল দুর্ঘটনায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কলকাতায় দেহ রাখেন। এই তপস্বী 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে বাল্য ও কৈশোরের ছবি আঁকতে গিয়ে প্রাচীন কলকাতার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

"সেই সময়ে কলিকাতা-নগরীতে কোন জলের কল, গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। প্রত্যেক বাড়ীতে কূপ অর্থাৎ পাতকুয়া ছিল এবং সেই কূয়ার জলে স্নান, রান্না ইত্যাদি গৃহকার্য নির্বাহ হইত। প্রত্যেক বাড়ীতে কূপ-পায়খানা ছিল এবং উহা হনুমান অন্তর পরিষ্কার করানো হত। মাটির নীচে ড্রেন ছিল না, তাহার পরিবর্তে রাস্তার বড় বড় নর্দমা ছিল। রাস্তার লণ্ঠনের মধ্যে রাখিয়া তৈলপ্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল। দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার ছিল না। তখন কেরোসিন তৈল ভারতে আসে নাই, রেড়ীর তৈলেরই ব্যবহার ছিল। কাপড়ের সলিতা করিয়া রেড়ীর তৈলে ভিজাইয়া প্রদীপ জ্বালানো হইত। তাহার অনেক দিন পরে তবে কেরোসিন তৈলের প্রচলন হয়। আমি প্রদীপের আলোতেই লেখাপড়া করিতাম।"

....."মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) যখন কলিকাতা নগরী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সহরের ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও ধর্মতলা স্ট্রীট বিচিত্র রঙ্গের নিশান প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর রাস্তার দুইধারে ঝুকো (খালি) শিশিতে তৈল প্রদীপের দীপমালা সাজাইয়া আলোকিত করা হইয়াছিল।"

উপরের বিবরণটি কলকাতার আলোক অভিসারের দীর্ঘপথ সম্পর্কে কৌতূহলী করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ছিল তেলের আলোর ব্যবহার। বাড়ীতে তো বটেই, রাস্তাও তেলের আলোতে আলোকিত হত। ৩১০টি আলো ছিল রাস্তার। এই তেলের আলোর প্রচলন হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে রাতের আঁধার দূর করত শুধু চাঁদ ও চাঁদনী। জানতে বেশ মজা লাগে—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে গৃহকর্তাদের আলো জ্বালবার ভার দেন সরকার। প্রত্যেক বাড়ীর গেটের সম্মুখভাগ আলোকিত করা বাধ্যতামূলক ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কিছু কিছু গ্যাসের আলো এল। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী রাস্তা আলোকিত করবার দায়িত্ব নিয়েছিল। চৌরঙ্গী এলাকায় প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলেছিল। তারপর এল বিজলীবাতি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ কলকাতায় বৈদ্যুতিক আলোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিসন রোডে প্রথম বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। ১৯১৪-১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতার গৃহস্থ বাড়ীতে বিজলিআলো প্রবেশ করল। প্রায় শতবছরের পথপরিক্রমা শেষ ক'রে কলকাতা রাত্রির তমিস্রা থেকে আলোর আলোকিত হয়ে উঠল।

স্বামী অভেদানন্দ কালীঘাট সম্পর্কেও মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন।

"সেই সময়ে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আহেরীটোলা হইতে কালীঘাটে যাইতে প্রায় তিন চার ঘণ্টা লাগিত। চৌরঙ্গী হইতে ময়দানের উপর দিয়া যাইবার সময় তখন ইংরেজ গোরাদিগের ভয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে হইত, কারণ ইংরেজ পল্টনের গোরারা গাড়ীতে স্ত্রীলোক দেখিলে দৌড়িয়া আসিত এবং ডাকাতের ন্যায় তাহাদের গায় হইতে স্বর্ণালঙ্কার ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিত।·· কালীঘাটে যাইয়া আমার পিতামাতা খড়ের অথবা গোলপাতার ছাদযুক্ত যাত্রীদিগের বিশ্রামঘর ভাড়া করিতেন এবং আহারাদি সমাপন করিয়া চেতলার হাট দেখিতে যাইতেন। ···হাওড়ার ব্রিজ (পুরাতন) যখন (১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) নির্মিত হয় তখন আমার বয়স আট বৎসর। আমার পিতামাতা আমাকে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ঐ কাঠের ব্রিজ (পোল) দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গার বুকে ঐ সেতু দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। কলিকাতা সহরে যখন ট্রামগাড়ীর চলন হয় তখন প্রথম উহা বিডনস্ট্রীট হইতে লালবাজার পর্যন্ত চলিত। দুইটি ঘোড়া রেললাইনের উপরে ট্রামগাড়ী টানিয়া লইয়া যাইত।"

এবারে সত্যানন্দদেবের কলকাতা প্রসঙ্গে আসি। গুরুর চেয়েও শিষ্যের কলকাতা প্রীতি বোধকরি অনেক

কেশী। জন্ম নিয়েছিলেন তিনি ১৩০৮ বাং (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) মাঘী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে এই কলকাতার বুকে। পিতা কলকাতার এ্যাসিটান্ট পুলিশ কমিশনার। স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেছেন এখানেই। তবে সাধনার দীর্ঘ পনের বছর সিউড়িতে কাটান। সেখানে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের সাধন গৃহে। কিন্তু কলকাতাই ছিল তাঁর ধর্মসাধনা ও ধর্ম আবরণের প্রধান অঙ্গন। বরাহনগরে রামকৃষ্ণ সেবায়তন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি। ঐ আশ্রম প্রাঙ্গনে মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করালেন মণি-মন্দির (বিখ্যাতে কাঁচের মন্দির)। এই মন্দির আজকের কলকাতার পরম আনন্দ ও আত্মার তৃপ্তি এনে দেয়। সত্যানন্দদেব ছিলেন খুব উচ্চমার্গের সাধক। কিন্তু সাধনার জন্য তিনি বনে-জঙ্গলে, গিরি-গুহাতে যান নি। আপন মনের গভীরতায় ও গৃহকোণের নির্জনতায় শব্দহীন ধ্যান তন্ময়তায় ডুবে ছিলেন। গুরু অভেদানন্দের মত তিনি বিদেশে যান নি বেদান্ত প্রচারের জন্য। কলকাতার গঙ্গা-তীরে বসেই মানুষকে মহামানবে রূপান্তর করবার কাজে আত্মনিয়ুক্ত হয়েছিলেন। ধ্যান কিংবা ধ্যানের ধন প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে কখনও কলকাতা ছাড়তে হয় নি। কলহ ও কোলাহলময়ী কলকাতায় সজনে নির্জনে এই সাধকটির কিন্তু প্রথম জীবনে কলকাতার সঙ্গে মিতালি ঘটেছিল একটি বিচক্ষণের সাহায্যে। তাঁদের পরিবারে একটি বিলেতী সাইকেল ছিল। সেটি চড়ে সত্যানন্দদেব কাশীপুর থেকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ইডেন হসপিটাল রোড, চৌরঙ্গী রোড ঘুরে বেড়াতেন। "সেইটেই চড়ে হোয়াইওয়েলেডল-এর পাশ দিয়ে গেছি—রাস্তাগুলো দেখে মনে হ'ত যেন স্বর্গের রাস্তা—ঝকঝক করছে। কাঁচের শোকেস তাতে গাড়ী সাজান।" ...."কলকাতার রাস্তাগুলো তখন সব নতুন নাম নেয় নি। এসব রাস্তা দিয়ে ভিজে ভিজে সাইকেল চালিয়ে মনের আনন্দে গেছি। হয়তো মনে মনে গুঞ্জন উঠেছে—'ই ভরা বাদর মাহ বাদর শূনা পকেট মোর'। কোড়ো কাকের মত বাসায় ফিরেছি সন্ধ্যায়।"

কলকাতা সত্যানন্দদেবের কাছে ছিল নেশার মত। "পুরানো কলকাতার নানা গোলমাল সত্ত্বেও কি জানি কেমন যেন একটা মোহ সৃষ্টি করতো। হয়তো সিউড়ী থেকে ফিরছি, কলকাতার ইলেকট্রিক আলো দেখতে পেলেই যেন মনে হত হাতছানি দিয়ে ডাকছে।" এই নেশা তাঁর বালাবধি। "গানসেল ফাউন্ড্রীর ঘাটে গঙ্গা স্নানে যেতুম। গঙ্গা স্নানে যাওয়া একটা নেশার মত ছিল। না যেতে পারলে ভীষণ মন খারাপ হত। ভোরের গঙ্গা কি জানি এত ভাল লাগতো। ঠাকুমার সঙ্গে এই গঙ্গা স্নানের মোহ পেয়ে বসেছিল। ঘাটের উড়িষ্যাবাসী পান্ডারা কপালে চন্দন তিলক দিত। সেও একটা জীবনের মধুর স্মৃতি হয়েই আছে।" ভাগিরথীর সঙ্গে সত্যানন্দদেবের বাল্যপ্রণয় তাঁর কাব্য উন্মেষের একান্ত সহায়ক হয়েছিল।

কলকাতার স্মৃতি তাঁর কাছে মধুর চেয়েও মধুর। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন "টুকরো টুকরো ঘটনা হয়তো জীবনটাকে কিছু কিছু তৈরী করে সেজন্য তাদের দান আছে।" আর এই টুকরো ঘটনার মালা গেঁথে তিনি লিখেছেন এক বিশাল প্রবন্ধ 'পুরানো কলকাতা'! কলকাতাকে নিয়ে তাঁর অনেক স্মৃতি, অনেক অনুভূতি।

বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র সত্যব্রত দেখেছেন গান্ধীবাদীদের আন্দোলন। সারদা রঞ্জন তখন প্রিন্সিপাল। ঐ কলেজে শিশির ভাদুড়ীর কাছে পড়েছেন। ছবিবিশ্বাস তাঁর সহপাঠী। গিরীশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অমর বসু তাঁর পিতৃবন্ধু ছিলেন। তখনও কলকাতায় 'টকি' আসে নি। তখন নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গিরীশ ঘোষের অভিনয় তিনি দেখেছেন। তখন বিজলী পাখা থিয়েটার হলে ছিল না। হাতপাখা রাখার ব্যবস্থা থাকত বসবার জায়গায়। সারারাত্রি ধরে থিয়েটার হত তখন। তিনি এককালে রাত জেগে থিয়েটার দেখতে ভালবাসলেও সাধু হবার সংকল্প গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার দেখাও বন্ধ করে দেন। সময়টা হবে ১৯২১/২২ খ্রীষ্টাব্দ। তখন তিনি কলেজে আই. এ. পড়েন।

১৯২৪ ও ১৯২৬ সালের হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা দেখেছেন। "ঘরে ঘরে আগুন, এক এক পাড়াতে

সব দলবদ্ধ হ'য়ে আগুন লাগানো, মারামারি চলেছে। ঠনঠনে কালী বাড়ী ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে, লাঠিয়াল পুলিন দাস তখন ছেলেদের নিয়ে তা রক্ষা করেছেন।"

তিনি দেখেছেন শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ গড়ে উঠেছে। আর মহা-কলকাতা জমজমাট। "মহা-কলকাতায় তখন ইলেকট্রিক ছিল না, টেলিফোন ছিল। লম্বা ঘড়ির মত টেলিফোনের যন্ত্রটা ছিল। সেটি ঘোরালে ইলেকট্রিসিটি তৈরী হত। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তখন সারি-সারি মুসলমানদের দোকান ছিল, কোনটাতে সিক্‌কাবাব্‌ ঝুলতো। কাশীপুরে তখন বি, টি, রোড দিয়ে গেছি, দিনের বেলায় ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকতো আর শেয়াল বেড়াত। নিরুম রাত্রা"। এই কলকাতায় তিনি ঘুরেছেন ; কলকাতার মাঠে মাঠে খেলেছেন ফুটবল, ক্রিকেট। কলকাতার আকাশে ঘুড়ি উড়িয়েছেন, বৈশাখে আম পেড়েছেন, বর্ষায় শীল কুড়িয়েছেন, নৌ-কোয় দোলা খেয়েছেন ; আর বাদল দিনে বাড়ীতে খিচুড়ী খাওয়ার মহোৎসবে মেতেছেন।

কলকাতার ঋতুসম্পদে আবর্তিত হয়েছে তাঁর জীবনচক্র। তার মধ্যে বর্ষা সর্বাপেক্ষা তাঁর হৃদয়নন্দন। কারণ "অঝোর শ্রাবণ যেন ভগবানের আশীর্বাদ। কলকাতার কৃষকের নয়নে বাদল জাগে না—জাগে কবির মনে।" ভগবানের মিলন আশা জাগে মনে। "কতদিন হেদোতে কলেজের সহপাঠীদের নিয়ে আমরা বসেছি—মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—আমরাও ঘন হয়ে বসেছি। কত গভীর প্রশ্ন সেদিন ছিল—আবার গানও জেগেছে। ···· কলকাতার আছড়ে পড়া শ্রাবণ না দেখলে ধারণা হয় না। গঙ্গার একূল ওকূল ভরে গেছে—মন চুপচাপ তাকিয়ে আছে জলভরা কূলের পানে। এমন কি মহুরীরাও ভয়ে কাঠরোধ করে চেয়ে আছে দূরের পানে।" শান্তিনিকেতনের বর্ষা এক কবির মনে আকৃতি জাগিয়েছিল। কলকাতার বর্ষা সত্যানন্দদেবকে মর্ত্যাতীত সৌন্দর্যের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। দেখবার গভীরতা চাই। গভীর মমতায় কলকাতা সত্যিই অপরূপা। —ধূলি, ক্লিন্নতা ছিন্ন ক'রে কলকাতা সদাস্নাত পবিত্র মায়ের মত। অতি আপন, অতি ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের মত। এই কলকাতার ভূমিতেই কিশোরের আঁচল পাতা। এই কলকাতার আকাশেই মিলবে মহাকাশের মহাব্যাপ্তি।

—:০:—

সবার মাঝে সবার কাজে

॥ স্বপনবুড়ো ॥

সবার মাঝে সবার কাজে আছে আমার স্থান
তাই এ হিয়া উঠছে গেয়ে গান।
ফুলের মতো কমল কলি
তার চরণে কে যায় দলি
সব কুসুমেই জাগছে ভীরু প্রাণ!
সবার মাঝে সবার কাজে আছে আমার স্থান।

সবার হাসি মুখের মাঝে পাই যে আমি ঠাঁই
তাই ত' সদা মিতালিরই মালা গেঁথে যাই!
শশী তারায় গগন তলে
জাগছি আমি পলে পলে
সবার নিয়ে বাঁচবো বলে মিলছে আমার স্থান
সবার মাঝে সবার কাজে আছে আমার স্থান॥

—:০:—

আমাদের ধর্মভাবনা

শ্রীশান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়

উত্তর-কলকাতার যে অঞ্চলে আমি বাস করি তার ডানদিকে উঁচু পাঁচিলের ওপারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রেল-কলোনি। লাল রঙের সুন্দর পাকা-পোক্ত বাড়িগুলি বিশ শতকের গোড়ার দিকে তৈরি। রেল কর্মচারী সব বাস করেন। বাড়িগুলোর কৌলীন্য একদা ছিল। বৃটিশ আমলে সাহেবদের কোয়ার্টার ছিল। কলোনির একটি বাড়িকে গীর্জা বলে চিনতে কোন ভুল হয় না। এখন তার গোত্রান্তর ঘটেছে। ক্রীশ্চান সাহেবরা আজ নেই। গীর্জাও নেই। এখন তার নাম স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুট। তার একটি অংশে লাইব্রেরি, অন্য অংশে জিমনাসিয়াম। দেহমনের সুষ্ঠু বিকাশের প্রয়াস এখানে আছে। বাঁদিকে রাস্তার ওপারে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংঘ। সামনের দিকে একটি কালী মন্দির। পিছনে দত্তবাগানের মোড়ে ঘনবসতির মধ্যে পুরনো একটি মসজিদ। সব মিলিয়ে পল্লীটির জীবনের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের যোগসূত্রের পরিচয় এর মধ্যে মিলবে এবং তাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানও প্রমাণিত হবে। শুধু এখানে নয়, অন্যান্য পল্লীতেও এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের নজরে পড়ে। এগুলি দেখলে নিশ্চয়ই মনে হবে ধর্ম আমাদের জীবনের অঙ্গ। কিন্তু সত্যিকারের ধর্মবোধের অভাব বোধ হয় আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাই তো ভাবনা!

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন আজকের বিজ্ঞানের যুগে ধর্মের কোন উপযোগিতা আদৌ আছে কিনা। বস্তুবাদী মানুষ বিজ্ঞানের যুগে সব কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা ক'রে দেখতে চায়। কার্য-কারণের পরম্পরা তার কাছে বড় কথা। বিশ্বাসের জগৎ, অনুভূতির জগৎ, উপলব্ধির জগৎ এসব তো কথার কথা। নিছক কল্পনার কথা। এ সব নিয়ে তার দরকার কি? কিন্তু মানুষের সন্তুষ্টি তো বস্তুনিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে সে যেতে চায়। হয়তো সে কী চায় সঠিক জানে না। যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে মৈত্রেয়ী যা বলেছিলেন সে কথা হয়তো সে বলে না। কিন্তু সে যা পেয়েছে তাই নিয়ে কখনোই সুখী হতে পারে না। অর্থ সম্মান প্রতিষ্ঠা তাও যথেষ্ট নয়। এতো বাইরের সমৃদ্ধি। সে চায় আরও কিছু। অন্য কিছু। কেননা প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে দ্বৈত সত্তা আছে। একটা তার ব্যক্তিসত্তা। যা জীবভাবে সীমাবদ্ধ। যা একান্তই পার্থিব। যা তার অহং এবং আশু প্রয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। অন্যটি তার ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে বৃহৎ জীবন। বিশ্বজীবন। যেখানে তার আত্মার সমৃদ্ধি।

অনেক পেয়েও তার মনে তাই অতৃপ্তি। পশু-মানব যে চায় ব্রহ্মমানবে উন্নীত হতে। ধর্ম তার কাছে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ সে দেখতে পায় না। সে বলে ধর্মের সঙ্গে বিরোধ অধর্মের। বিজ্ঞানের নয়। দুয়ের এলাকা অবশ্য পৃথক। একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ। অন্যটি ইন্দ্রিয়াতীত এবং বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে। একটি থেকে অন্যটিতে উত্তরণ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। দুয়ের মধ্যে সীমারেখা তাই সব সময়ে টানা যায় না। আইনস্টাইন যখন বলেছিলেন সমস্ত প্রাণিলোকের সঙ্গে আমি একাত্মতা অনুভব করি সেই অনুভূতি নিছক বস্তুবাদী বিজ্ঞানীর যুক্তিসিদ্ধ অনুভূতি নয়। সেটা অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর উপলব্ধি।

হঠাৎ বড় বিষয়ে চলে গিয়েছিলাম। হয়তো ঠিকমত না জেনেই। সুতরাং নিজের সীমানায় ফিরে আসি। আমরা সাধারণ মানুষ, যারা বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা তত্ত্বকথা বুঝি না কিন্তু যুক্তির আলোকে সব কিছু দেখতে ইচ্ছা করি, স্বভাবতই প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তেমন একটা আস্থা রাখতে পারি না। বলি আন্তরিকতার চেয়ে আড়ম্বর ওখানে বড়। আসলে কোন কিছুতেই আমাদের বড় একটা আস্থা নেই। আবার

পুরোপুরি অবিশ্বাস করবো তেমন জোরও নেই। তার ফলে প্রচার করি ধর্ম সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে অনেকটা নিরপেক্ষ ধরণের। কথাটা অপ্রিয় হলেও ধর্মের নাম শুনলেই কেমন একটা ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করি। এর মধ্যে বিজ্ঞের উদাসীনতা যতটা তার চেয়ে অজ্ঞতার অহমিকাই বেশি। কেননা এই অজ্ঞতা প্রসূত অহমিকাকেই আমরা প্রগতিশীলতা মনে করি।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রসঙ্গে কোন আলোচনা আমি করছি না। অধিকারভেদের প্রশ্ন সেখানে ওঠে এবং সে অধিকার আমার নেই। এ আমার বিনয় নয়, স্বীকারোক্তি। তাই সাধারণভাবে জীবনের ধর্মের কথা বলছি। ধর্মের অর্থ যদি হয় স্বভাব বা গুণ, তাহলে মানুষের ধর্ম বলতে আমরা মানুষের স্বভাবই বুঝবো। এই স্বভাব কষ্টকল্পিত বাহ্য কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু তাই বলে একেবারে ফুলের গন্ধের মত স্বতস্ফূর্ত প্রকৃতিজাতও নয়। চেষ্টা করে মানুষের অন্তর্নিহিত সুগন্ধকে বিকশিত ক'রে তুলতে হয়। অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে স্বভাবকে পেতে হয়। প্রবৃত্তিকে জয় করতে হয়। তখন প্রেয়কে নয়, শ্রেয়কে সে পায় আপন স্বভাবের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা অনুসরণ করে বলতে হয় মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই ধর্ম এবং তাঁরই কথায় জীবে প্রেমই তো ঈশ্বরের সেবা এবং এটাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। নাই বা হলো তত্ত্বজ্ঞান। নাই বা জানলাম আত্মা কী? আমি কী, কেন ইত্যাদি। স্বামীজীর কথা স্মরণে রেখে আমি যদি আমার মত করে মানুষের ধর্ম পালন করি, আমার মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সচেষ্ট হই তাহলে আমার কাছে ধর্ম ও জীবনের সত্য হবে সমার্থক। সত্যের যে তেরটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহাভারতের শান্তিপর্বে, যেমন—সাম্য, সংযম, পরশ্রীতে অকাতরতা, ক্ষমা, বিনয়, অসহিষ্ণুতা, অদোষদর্শিতা, ত্যাগ, ধ্যানপ্রিয়তা, আত্মমর্যাদাবোধ, ধৈর্য, দয়া ও অহিংসা সকলি আমরা সাধারণ মানুষ আয়ত্ত করতে পারবো না। নাই বা পারলাম। যেটুকু পারি, সেটুকুই যদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি তাহলেই নিজের কাছে সৎ হয়ে উঠতে পারবো। একটা সাধারণ প্রশ্ন : গৃহী এবং সন্ন্যাসী দুয়ের মধ্যে কে বড়? উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ চমৎকার একটি গল্প বলেছিলেন। যার মধ্যেই উত্তরটি নিহিত ছিল। গল্পের সারমর্ম ছিল : গৃহী যদি গৃহীর ধর্ম পালন করে এবং সন্ন্যাসী যদি সন্ন্যাসীর ধর্ম পালন করে তাহলে স্বক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ। সেখানে কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়। ছোট বড়র প্রশ্নও সেখানে ওঠে না। গৃহী অতিথিকে যদি নারায়ণজ্ঞানে সেবা করে, সেই সেবার মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা। অতিথির তৃপ্তির জন্য সে তার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। শুধু সে নয়, তার পরিবারের সবাই সেই সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়। গৃহীর কাছে এর চেয়ে বড় ধর্ম আর কী হতে পারে?

আমরা ছোট ছোট মানুষ। আমাদের কাছে ধর্মের অর্থ কর্তব্যপালন। বেদ ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ধর্মের নানা ব্যাখ্যা করা হলেও আমাদের কাছে ধর্মের অর্থ প্রধানত কর্তব্যকর্ম সাধন। ধর্মের অপর নাম ঋত অর্থাৎ সত্য যা আমাদের ধরে রাখে, আমাদের মনে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে, কল্যাণকর্মে আমাদের প্রেরণা দেয়। জীবনকে ভালবাসতে শিখি। অহং থেকে আত্মার বিস্তার ঘটে। মৃত্যুভয় জয় করতে পারি। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাকে সমভাবে দেখতে শিখি। যার ফলে একটি সুগভীর সুপ্রসন্ন জীবনবোধ গড়ে ওঠে। যা জীবনে চরম সান্ত্বনা, পরম প্রাপ্তি।

একটি জাপানী কবিতার ইংরেজি উদ্ধৃতি এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"I followed the twilight to find where it went
It was lost in the day's full light;
I followed the twilight to find where it went
It was lost in the dark of night.

Last night I wept in passionate joy
To night the passion of sorrow came ;
O light and darkness, sorrow and joy
Tell me are ye the same ?

কবিতাটি কত সহজ অথচ কত গভীর। জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে। শেষ ছত্রটি প্রশ্নসূচক। উত্তর, বলাবাহুল্য, প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত। জীবন সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা, এক নতুন উপলব্ধি হয়। জীবনের সত্যকে এখানে দেখতে পাই। মুক্তির স্বাদ পাই। সুখ-দুঃখের উর্ধ্বের সন্ধান পাই। ধর্মভাবনার এই তো ফলশ্রুতি।

—:০:—

প্রাণের ঠাকুর

শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

প্রণাম লহগো প্রাণের দয়াল
ওগো অন্তরযামী
হৃদয় পাথারে অশ্রুর ভার
তবু যে তোমারে নমি।
তুমিই মানুষ, তুমিই দেবতা,
তুমি যে ফুলেরকলি
তোমার পূজার হোমানলে,
শুধু লও এ ব্রতাঞ্জলি।
ওগো মহীয়ান্ ওগো দরদীয়া
তোমার মর্ম্মবাণী
বিশ্বলোকের হৃদয় দুয়ারে
ছড়ায়ে দিয়েছো জানি।
হানাহানি করে জগৎ মাঝারে
এঁকে দিল যারা ছায়া
তুমি তো তাদের শিখাচ্ছে প্রভু
জীবনটা যে শুধু মায়া।
অধর্ম্ম যখন বাতাসে ছড়ায়
হাহাকার কানে বাজে
চক্র তোমার করিতে শাসন,
নেমে আসে ধরা মাঝে।
ভক্তজনের আকুল আহ্বানে
সদা সতর্ক রও
যারা অপাংক্তেয়, তরিতে তাদের
তুমি তো বিমুখ নও।
মানুষের প্রাণে ভালবাসা দিয়ে
তাদের করিতে জয়
শান্তি প্রলেপ মাখিয়েছে যারা
নাহিকো তাদের ক্ষয়।
এই শিক্ষাই দিয়ে গেলে প্রভু
মূঢ় ভারত জনে
কৃপার আধার কত যে তোমার
মনে পড়ে প্রতি ক্ষণে।
আকুল আর্ত্তি নিয়ে ওগো প্রভু
এই মোর আবেদন,
শেষের বেলায় তোমার আশিষ
পাই যেন অনুক্ষণ।

—:০:—

শরণাগতোহং শত যুগ যুগং

স্বামী অরূপানন্দ

'নীলকান্তমণি বিদ্যুৎবরনী'···দুটী শব্দ কি অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জনাময় লীলারাজ্যের কি গভীর দ্যোতনা। মায়ের সাথে যাঁর রীতিমত সহজ সম্পর্ক—মায়ের কোলের ছেলে সত্যানন্দের লেখনী নিসৃত গানের প্রথম ছত্র। দেখলেন মায়ের রূপ, সারা গায়ে বিদ্যুতের ওড়না জড়ান—নীল স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ঝলমল করছে ছোট্ট দুলালী—মুখে হাসি—কে ইনি—কি নাম রাখবেন মাতৃরূপা মেয়ের। —দিব্য স্বর ভেসে এল—'আমি নিরঞ্জনী'। নীল দেউলে নীলকান্তমণি মায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন—কন্যাকারূপে। উপনিষদে আছে সাক্ষা-সূত্র-ক্ষমাভুজ পদতলে পদ্ম, মুণ্ডমালা নেই! অসি বাঁশী দুই আছে বরাভয়া মহাযোগিনী মূর্ত্তি। কৃষ্ণকালীর মিলিত সত্তা। অনেকদিন আগে আশ্রমের প্রথমদিকে তখন সকলে আসেনি—একটী দিব্যাতিদিব্য ঘটনা মনে পড়ে। মায়েদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছেন। সিউড়ী আশ্রম—শ্রীঠাকুর দোতলার ঘরে ধ্যান করছেন। মায়েদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন—দেখছেন অপূর্ব্ব নীল স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ঘর ভরে গ্যাছে—আর ঘরের ভেতর থেকে গুন গুন ক'রে কথা বলার শব্দ ভেসে আসছে। দোতলার ছাদে গিয়ে দেখা যায় ঘড় থেকে নীল জ্যোতি জানালা দিয়ে ঠিকরে পড়ছে।

শ্রীঠাকুরের ধ্যানের পর মায়েরা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঠাকুর আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন—গোটা ঘর নীল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ—কে এসেছিল। শ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন—"তাহলে বোধ হয় ঐ মা বেটীই এসেছিল।" সেই নীলকান্তমণি বিদ্যুৎবরণী ধরা দিলেন চিরন্তনীরূপে—শত শত ভক্তের কল্যাণে। ধরা না দিয়ে কি পারেন? ছেলের আকুল ডাক—"আয়াহি বরদে আর্ত্তের জননী!" প্রতিষ্ঠা করলেন স্বয়ং ভগবান সত্যানন্দদেব! ধরা কি অধরাকে ধরতে পারে—তাই অধরাকেই আসতে হয় বারে বারে এমন করে।

অবতারগণের লীলা কাহিনীতে পাওয়া যায়—কত ভক্তকে তাঁরা কতরূপে দর্শন দিয়ে ধন্য করেছেন। শ্রীসত্যানন্দদেবের জীবনেও এরকম অনেক ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। কৃষ্ণরূপে, সারদারূপে, কালীরূপে, শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়ে ধন্য করেছেন। যার যা ইষ্টমূর্ত্তি সেইরূপে দেখা দিয়েছেন। পাঠকদের কাছে নিবেদন—এগুলি পড়ে কোনও রকম অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস পোষণ করবেন না—তাহলে তাদের ক্ষতি হতে পারে—গীতাতে এ সম্বন্ধে ভগবান সাবধান ক'রে দিয়েছেন।

আর একদিনের ঘটনা—শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ত্যাগব্রতী মায়েরা আছেন বসে অনেকে। হঠাৎ শ্রীঠাকুর তাদের বললেন—"ভবতারিণী দর্শন করবি?" সকলে কিন্তু কিন্তু ভরে তাকিয়ে দেখছেন শ্রীঠাকুরের বুকের ওপর থেকে সবটা মা ভবতারিণীর রূপ প্রকাশিত হয়েছে। জিব বেরিয়ে আছে—চোখ দুটীও ঐ রকম। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ঐভাবে রয়েছেন—ভয়ে সকলে চাইছে তাড়াতাড়ি শ্রীঠাকুর আবার আগের রূপে ফিরে আসুন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার স্বাভাবিক হলেন। গহন গহিন এ লীলারাজ্যের কথা কেই বা বুঝবে। শ্রীঠাকুর বলতেন—দেখ ভক্তিরাজ্যের কত গুহ্য সাধনা—কত রহস্য নিয়ে আমি বসে রয়েছি—কেই বা চায়? বেশীর ভাগই কলাইয়ের ডালের ঘন্দের। শ্রীঠাকুর বলতেন—দ্যাখ্ নির্ব্বিকল্প সমাধির পর পঞ্চম পুরুষার্থ, নিবিড় ভক্তি বিশ্বাসে ভগবানকে নিয়ে প্রত্যক্ষ লীলা, সহজ নয়। কিন্তু এইসব ত্যাগব্রতী মায়েদের সহজভাবেই সেগুলি এসে গ্যাছে।

"নয়ন সমুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঠাকুর ও গোপাল একই সত্তা। বলতেন—"আমাকে যে ভালবাসবে গোপালকেও সে ভালবাসবে, গোপালকে যে ভালবাসবে আমাকেও সে ভালবাসবে—একে দুই—দুইয়ে এক। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে গোপালের দু'একটী লীলার কথা স্মরণ ক'রে নেওয়া হই। শ্রীঠাকুর আছেন গঙ্গার ধারের বারন্দায় বসে—মন্দিরে পূজা হচ্ছে। সময় হয়ে গেলে শ্রীঠাকুর মন্দিরে যাচ্ছেন, দরজা পেরিয়ে ঢুকেই খুব হেসে উঠলেন। মায়েরা জিজ্ঞাসা করলেন কি হল ঠাকুর? শ্রীঠাকুর বললেন—"শীগ্‌গীর ওকে শুইয়ে দে, দেখছিস না কিরকম ঢুলছে, খুব ঘুম পেয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে গোপাল বিগ্রহকে শুইয়ে দেওয়া হল। আজও পূজার শেষে ভোগের আগে একবার গোপালজীকে শুইয়ে দেওয়া হয়। সচ্চিদানন্দঘন পুরুষের দুই রূপের কি লীলামাধুরী।

সব ত্যাগব্রতী মায়েদের সাথেই শ্রীঠাকুর ও গোপালকে নিয়ে নানারূপ লীলা খেলা হোত। সকলের কাছে লেখার সৌভাগ্য হয়নি। শ্রীগীতাপুরীর কাছে যেটুকু শুনেছি—সাধ্যমত নিবেদন করছি মার কোথাও কোনও ত্রুটি থাকলে ক্ষমা ক'রে নেবেন।

একদিন হয়েছে কি শ্রীঅর্চনাপুরী ও শ্রীগীতাপুরী দু'জনে কথাবার্তা হচ্ছে গোপালের স্নান পূজার সময়। গরমকাল শ্রীঅর্চনাপুরী বলছেন, এত গরমে গোপালকে আর কাপড় জামা কিছু পরাব না। শ্রীগীতাপুরী বলছেন—অর্চনা দি, গোপালকে অন্ততঃ একটা জাঙ্গিয়াও পরিয়ে দাও ও কি করছ। শ্রীঅর্চনাপুরী কিছুতেই শুনবে না—না—কিছুই পরাব না। স্নান টান করিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। চারিপাশে ফুল দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন—বাইরে থেকে সহজে বোঝা যাচ্ছে না। শ্রীঠাকুর ধ্যান করছিলেন—হঠাৎ গোপালের দিকে তাকিয়ে খুব হেসে উঠলেন। শ্রীঅর্চনাপুরী জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হল—হাসছেন কেন?' শ্রীঠাকুর খুব মিষ্টি আদর গলায় বললেন—হ্যাঁরে গোপালকে কিছু পরাসনি—গোপাল আমাকে বলছে—"আমার খুব লজ্জা করছে।" তখন আর কি করা যাবে। শ্রীঅর্চনাপুরী তখন রহস্য করে বলছেন—'ঠাকুর' ঐ যে গোপালের মাসী (গীতা) উনি বলেছিলেন কিছু পরিয়ে দিতে আমি পরাইনি—তাই আপনাকে গিয়ে জানিয়েছে। গীতা যেমন বলবে সেই রকমটি চাই ও কি গোপালের গুরু?" সঙ্গে সঙ্গে গোপালকে একটী প্যান্ট পরিয়ে দেওয়া হল ব্যস্ তখন খুব হাসি। দেখুন আমরা বিজ্ঞানের যুগে মহাকাল নিয়ে গবেষণা করছি কত বড় বড় তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কিন্তু এই যে লীলাকাশে কত বড় ঘটনা ঘটে যায় যে খবর কেউ রাখে না। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—অনন্ত সচ্চিদানন্দ ছোট্ট গোপাল হয়ে সুন্দর শোভন মোহন রূপে আমাদের সাথে খেলতে আসছেন—খেলতে চাইছেন—আমরা তা দেখছি না বুদ্ধির অহমিকার প্রাচীর তুলে বোধিকে ঢেকে রেখেছি। যেখান থেকে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি সেদিকে কারও নজর নেই। এ সেই—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবার বাবুকে বাদ দিয়ে তার ঐশ্বর্য্য নিয়ে মাতামাতি। কখানা বাড়ী—কত কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি। সর্ব্বোত্তম সত্যকে অস্বীকার ক'রে বা এড়িয়ে গিয়ে জড়-বিজ্ঞান কোনদিনই কল্যাণমুখী হতে পারে না। ধ্বংসের বীজ সে বপন করবেই। এখন পৃথিবীতে সব থেকে প্রয়োজন বোধির সাথে যুক্ত হয়ে বুদ্ধির নব নব ক্ষেত্রে যথার্থ উন্মোচন—না হলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

গোপাল সোনার আর একটী লীলার কথা সেদিন শুনলাম। আগেই বলেছি শ্রীসত্যানন্দ গোপাল আর গোপাল সত্যানন্দ অভেদ-এক। শ্রীঠাকুরকে একদিন একটু দই খেতে দিয়েছেন গীতাপুরী। শ্রীঠাকুর আনন্দ ক'রে ছোট্ট ছেলের মত হাত পেতে পেতে খাচ্ছেন আর সব দাড়িতে গোঁপে লেগে যাচ্ছে। সেও এক দিব্য সৌন্দর্য্য। হঠাৎ গীতাপুরীকে সম্বোধন করে বলছেন—"মৈয়া। মাখি নেহি মাখন খাও"। দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে কোন অপার্থিব লোকে চলে গেছেন গোপাল সত্যানন্দ। ঠিক যেন ব্রজের গোপাল। যিনি খেতে দিচ্ছিলেন তিনিও হতবাক। বুদ্ধত্বাসে কম এগিয়ে চলেছে ভাবছেন এ তিনি কাকে দেখছেন স্বয়ং গোপাল অবতীর্ণ গুরুরূপে, সখারূপে, সাথীরূপে

পিতা-মাতা সব হয়ে। নিজমুখেই বলেছেন "আমি আর তিনকড়ি এক"। ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) কি বারবার আসেন—তবে আমাকে তার Agent বলতে পার।" "এবার ঠাকুর ও মা এক দেহেই।" আরও কতকথা স্বরূপের কত ভাব প্রকাশ যে হয়েছে কতটুকুই বা ধরা গ্যাছে। মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে আর একবার আসব বলেছিলেন। "বায়ুকোণে আবার দেহ হবে।" 'কে জানে তোর গাঁই গুষ্টি—বীরভূমের বামুন মুই' এসব কথা বলে গেলেন। সারদা মা দেখেছিলেন—ভাবসমাধি অবস্থায়—"বর্দ্ধমানের পথ ধরে হাঁটছেন—বাউল বেশ—হাতে এক ভাঙ্গা একতারা। মা আছেন পেছনে হাতে হুঁকো। কিছুদূর গিয়ে মা হাতের হুঁকোটি ভেঙ্গে দিয়ে বললেন—এই রইল তোমার হুঁকো আমি আর আসছিনি।" এবে সব মিলে যায় তবে কি গোপনভাবে এসে সকলকে ফাঁকি দিয়ে আরব্ধ কাজ শেষ ক'রে লীলা ক'রে চলে গেলেন। তবে কি সত্যানন্দরূপে যিনি এসেছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণেরই নবতমরূপ। সারদা—রামকৃষ্ণ—সত্যানন্দ সব এক?

"প্রভু তব চরণের চন্দনে
এধরা আবার হল সুন্দর"

শ্রীঠাকুরের গান একটু পাল্টে নিলাম। সবারই চোখে ধুলি দিয়ে চন্দন চর্চ্চিত চরণ নিয়ে যেমন গোপন হতেও গোপন লীলা ক'রে গেলেন আমার গোরা রায়। গানও লিখলেন তিনি—

"আমার নবীন গোরা রায়
আমার নবীন গোরা রায়
কেনে কাঁদে কেনে হাঁসে কেনে আপন ভুলায়।"

আমরা দীর্ঘদিন ধরে এ লীলা দেখেও ধরতে পেরেছি কি? বোধহয়—না। মুখে বলেছি স্বয়ং ভগবান—কিন্তু প্রাণে প্রাণে যে বোধ করা – বিশ্বাস করা তা কি হয়েছিল—না তার মধ্যে অনেকখানিই ফাঁকি ছিল। এখন সে প্রশ্ন আসে বৈকি। অবশ্য তিনি না বোঝালে—না ধরা দিলে কারও সাধ্য নাই। অধ্যাত্ম তত্ত্ব—অধ্যাত্মজ্ঞান কি কেনোপনিষদে বলছেন—

অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদ্যুপস্মরত্য ভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ॥ ৬৫

—মনের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ের নিরন্তর স্মরণ এবং মনের যে সংকল্প তাই অধ্যাত্ম।

যা ক্ষণমাত্র দেখা হলো তার মাঝে ডুবে যাওয়াই অধ্যাত্ম। চিরহরা রূপ দেখে তাতে মজে যাওয়া বিভোর হয়ে যাওয়া সেইরূপের স্মরণ মনন চিন্তন করা এবং তাতে ডুবে যাওয়া বা পাওয়ার সংকল্প করা —(১) ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্—প্রীতির সহিত ভজন কর প্রীতিই মূল। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে প্রেম্না হরিং ভজেৎ। আসুন আমরা সকলে মনপ্রাণ এক ক'রে সারদা রামকৃষ্ণ স্বরূপ সত্যানন্দের বন্দনা করি—বিভোর হয়ে চিন্তা করি—নামরূপে ভাবে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করি। প্রীতির সহিত ভজনা করি—

"জগদুদ্ধার কারণ দেহধরং
শরণাগত রক্ষণ হেতুভূতং
যুগধর্ম বিধায়ক দেব দেবং
প্রণমামি সদা সত্যানন্দরূপং
• •
রামকৃষ্ণস্বরং সারদা শরণং
প্রণমামি সদা সত্যানন্দ রূপং
• •
শরণাগতোহং শত যুগ যুগং
প্রণমামি সদা সত্যানন্দ রূপং।"

এই ভাবে স্মরণ-মনন ও ভজনা করতে করতে কখন কিভাবে তিনি তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন তিনিই জানেন।

"করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা নয়ন মেলিয়া দেখিনু
এনেছে তোমারি দুয়ারে॥"

(১) পার্থসারথি পৌষ ১৩৬৯

জীবন চেয়েছি আমি

সন্তোষ কুমার অধিকারী

মৃত্যুকে করেছি ভয়
মৃত্যু মানে অন্ধকার, অনন্তে বিলয় চিরতরে।
আমি ক্ষুদ্র প্রাণ ভরে স্পর্শ নিই আনন্দ রূপের,
বেঁচে থাকি নিরন্তর ছন্দের স্পন্দনে,
জীবন আমার তৃপ্তি
পূর্ণতা আশার,
ভয় পাই আঁধারের রূপে॥

মৃত্যুকে করেছি ভয় :
যতক্ষণ বেঁচে আছি,
দীপ্ত আমি প্রাণের চাওলো,
আমার আকাশে আলো,
আকাংক্ষার অনির্বাণ শিখা,
পার হ'য়ে যাই অপূর্ণতা।

জেনেছি, জীবন এক অন্তহীন চলার সঙ্গীত ;
মৃত্যু-ক্ষয় শুধুতা কেবল।
জীবন চেয়েছি আমি মৃত্যু ভয় ছেড়ে॥

—:০:—

বেদনার মধ্যেই শান্তির উজ্জ্বল দীপ

কবিকঙ্কণ : হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চলার পথ আঁকা বাঁকা হলেও
তোমার বেদনা তোমাকে সোজা
পথ বলে দেবে।
তোমার অবিশ্বাসের মধ্যেই
বিশ্বাসের মূল মন্ত্র রয়েছে।
তাকে পেতে চাইলে
খুঁজে পাওয়া যাবেই।
প্রভাতের সূর্য্যরশ্মির মধ্যেই
সন্ধ্যার অন্ধকার খেলা করে।
তাকে খুঁজে পেতে হলে
তোমার মনের দরজা খোল।
চোখের জল দিলেও সমুদ্র
গড়া যায়।
তবে তাকে দেখা যাবে
তোমার অনুভবের
চোখের আয়নায়।
দুঃখ এবং বেদনা যার সঙ্গী
সেই-ই উজ্জ্বল সার্থক সম্পদের
একক অধিকারী।

—:০:—

সংসার-সংগীত

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সংসার-সাগরের অপার জলধি তীরে
দিন যায় চলে,
কি আছে রাখার মতো অমূল্যরত্ন রে—
কি আছে আঁচলে ?
বাতাসে হারাবে সব উড়ে গিয়ে উড়ে গিয়ে—
ধরতে বাসনা হবে, ধরা কি সহজ হবে—
সচলে-অচলে ?
সকলের শুভমতে শুভমনে গান শোনা,
অশুভের দূরে দূরে সুর খুঁজে ফিরে ফিরে
মহতী আদলে।

—:০:—

প্রেমের ঠাকুর

শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার করুণাঘন দুই নয়নের অতলে
নীল কমলের উজ্জ্বল নীলদ্যুতি।
হিয়ের রূপমাধুরী ছানিয়া
বিশ্বকর্মা নিভৃতে বসিয়া
আপনার মনে গড়িয়াছে যেন
অপরূপ ওই মূরতি॥

শ্বেতপদ্মের অঙ্গ সুষমা
আর কোমলতা লয়ে,
যমুনার নীল জলধারা সনে
চন্দ্রমাধুরী মিশায়ে,
স্রষ্টা অসীমে বেঁধেছে সসীমে
গড়িয়াছে প্রেম মূরতি।
সৃষ্টিরে হেরি মুগ্ধ স্রষ্টা
লুটায়ে করিছে আরতি॥

অসীমে যে ছিল বন্ধনহীন
সসীমে সে হ'লো ভক্ত অধীন,
ভক্তিপ্রেমের আরতিতে জাগে
ও দেহে বিশ্বমাতা।
ডাকিয়া আর্ত বিশ্ববাসীরে,
অমৃত বার্তা শুনাইয়া ফিরে,
বলে ভয় নাই আয় কাছে আয়
আমি আজ ভয়-ত্রাতা॥

—:০:—

Sura Yoga

Sree Sree Thakur

Sura yoga is union with Suramaya
In the Suraloka.
With the mellow merger of time, tune and thought,
The Surakara
Soars to the Suraloka
In Sura-lila, in Sura-Arati—
For union with and absorption in Suramaya.

The Song of Creation
Is the Song Eternal,
Vibrating through Time and Space.
Attunement with this
Pleases the Lord, and,
His pleasure releases newer notes
In the Cosmic Concert.
In the Orchestra of Creation.

—:•:—

Bhagavan Sree Ramakrishna says—"Realisation came to Ramprasad through music... In the 'Kali-yuga', the way of devotion is the way to God sing on His Name and Attributes·· know that His Name taken in tears dispells fear and draws Him near···"

Such is the charm of devotional songs. Songs sung in love for the Lord vivify their ideality, sweeten their tune and betray delightful timing. The concord of Indian tunes (Ragas) with diurnal and nocturnal periods is also remarkable so that Time, Tune and thought meet in a melody of musical worship and serve the 'Suramaya' with mellow and beauteous notes superlatively set, in the supra-ethereal realm of 'Suraloka'. There the 'Surakara' offers Himself through his offerings of song and the 'Suramaya' loving that He is, allows Himself to be wrapped in the ecstatic embrace of the singer.

The Suramaya is playing His cosmic flute eternally. All its keys release an Infinity of notes, held in a harmony we can not grasp —merged in a melody we miss. We have drifted away. Our notes echo our egoism, We jar and jolt. It pains Him, our only lover. So, fall in and be linked to the Lila. Take to His tune and play on piper · Harmony is there ; melody is there. Newer and newer notes nourish and enrich the concert and mingle to make for eternal melli-fluence in the 'Suraloka' where meet the Surakara and Suramaya. This consummation—extra-physical though it is—is the result of a process that takes its start, from an effort made in the 'Manipura Chakra' of the 'Surasadhaka' to wake up 'Pranaba' that lies dormant there. With Sabda Brahman' awake here, the 'Surasadhaka' goes on caressing the 'Suramaya' with the awakend tune through his 'Ishtamantram' or through other divine, charms or names or songs at the ascending 'Chakras' in seriatim and finally transgresses the physical plane. In the mental plane the play goes on and until the body-sense drops finally, it reverberates the musical worship of the mental plane.

The 'Surasadhaka' continues to live in the musical plane and to play unto and serve the Suramaya until his final absorption takes place. And this unison which

brings back a wave of His own to Himself is specially pleasing to Him and this special delight, special thrill sends down special blessings, special favours to the creation. Recall the descent of the Suradhuni from below the lotus feet of Sree Hari after Narada pleased Him with music. Recall the resolution of the 'Nirvikalpa Samadhi of 'Sukdeb' at the instance of Narayan, when Narada began singing on the beauty of Sree Hari in four couplets with the help of his Veena, which excited in Sukdeb vibrations of physical life through Shudder, tears, thrill and visualisation of the Divine 'Rupam'. It is after this that king Pareekshita and the world heard the Bhagawatam.

This is the blessing that musicians may secure for themselves and the world through 'Sura-yoga' and union with Suramaya.

—:o:—

AN INDEX OF WHENS

Sunil Bhattacharya

How many days more shall pass, Oh
my Lord !
that the bud of Thy Mercy shall peep
through the dense blackness of my
endless waiting ;

When that coveted moment shall appear
with Thy resplendent music
for which my ears are pining ;

When that celestial dish shall be served
before my hungry heart, Oh Lord !

Oh ! when all these whens shall be appeased
with Thy sweet Love :

Is that the finalising point of my mundane
existence
swinging between the oceans of
Life and Death ?

—:•:—

Led By Truth We Rejoice

Niranjan Bannarjee

Read the pages
Of lives of sages
They show the path divine
And tell us how
Here and now
Man's perfect self can shine.

The Only need
Is to heed
The guiding silent voice,
In Karmic Law
Is found no flaw
Led by Truth we rejoice.

Depressed—are you ?
Build anew
A world of ideas pure,
Faith in Grace
Will leave no trace
Of problems in life

—:•:—

Idea in a nutshell about Nirguna Brahman, the unmanifested divinity, and Saguna Brahman, the manifested Divine science

Baba Thakur

The Absolute existence, the embodiment of Sat-Chit-Ananda, which is declared to be All Power, All Knowledge, All Bliss, All Love and Peace, is known to be Param-Brahman, Param-Atman (Over Soul), Parameswara (Supreme Lord) Purusottama Bhagawan (Supreme Personality of Godhead Absolute). It is Unmanifested, Unconditional, Unqualified, Undifferentiated, Eternal, One state of Absolute Being.

Only 1/4 part of it becomes manifested through Itself Potency of Infinite Divine Nature. This manifested part of the Absolute is called the Saguna or Qualified Brahman, Atman, Self, Spirit, Iswara and Universal God The other three parts remain Unmanifested, Unconditional, Unqualified and Undifferentiated, what is said to be the Nirguna aspect of the Absolute.

1. (a) The Eternal one Substance is the one Infinite consciousness, named as God or the Self, the Spirit, Brahman, Atman, or Iswara, so and so. It is eternally playing the same-side game of ITSELF. Some part of the game is the one aspect of the design and pattern of Egoness, My-ness and Meum, according to the particular style and technique of the game, which refers to the definite position of the game, having experienced the sense of disturbance and getting upset by it.

(b) Another part of the same game is the other aspect of the design and pattern of Thou-ness, Thy-ness and Thee-ness, according to the perfect style and technique of the game, which referred to and confirmed, the complete chapters of the whole game, having experienced the harmonised and balanced nature of Pure consciousness, is freed from the consequences of the first aspect of the game.

(c The third aspect of the game is the unity of the first and the second which becomes one without any personal liking, preference and reservation and, thus, it becomes the Pure Consciousness, freed from any mixture.

(d) The fourth aspect is the Transcendental aspect of the Consciousness in Its Absolute state of being.

(e) The four aspects of the game are, (1) Personal, (2 Impersonal, 3 Impersonal-Personal and (4) Transcendental aspect of the Conscicusness in Its Absolute state of Being.

(f) The whole of the manifestations and creations, which are the evolving-expressions of the ocean of CONSCIOUSNESS in different movements, shapes and forms, are part and parcel of the game. It is just like the scene found on the surface movements of the ocean, where waves of different shapes and sizes, ripples of diverse

movements, bubbles of infinite numbers and foams of manifold layers, born out of It, each of them spontaneously rising dancing, playing from different angles and positions, exhibiting their art and skill, and proclaiming the Infinite Glory and Beauty of their existence.

Each of the manifestations has the same quality of the existence, but in expression their quantity differs. Quantitatively when they are unified, they become uniform, balanced, and ultimately, turn to be the INFINITE ONE once again.

2. All the manifestations, without any exception in any design and pattern, are the evolving expressions of different style and technique, which is nothing but the true functioning and true nature of the game of the previous Conscious Substance.

3. The Individual life and form is a particular design and pattern of the same Consciousness, which takes part in a particular position in the Eternal game of the infinite Consciousness. All the individuals in a body appear to be the Universal Life, and the Universe is the playground which is evolved from the same Consciousness.

4. (a That Infinite Consciousness Itself, though indivisible, like the ether, stands as and appears to be divided into many beings in the Conscious game.

(b) The Eternal One Infinite Consciousness, out of delight and joy, manifests Itself in manifold ways into things persons, actions and their results with a view to tasting the Infinite Glory of Itself, Because, in its Absolute State, It is all calm and quiet, all silence in the Infinitude. All glories, all joys, and delights, all beauty, all goodness and love are latent in fully merged condition and undifferentiated unity ; It cannot be aware of its potentiality and reality of Itself.

As the honeycomb, full of sweetened honey does not know the taste of it, the truth of Itself, In order to taste and know the nature of itself, divides Itself into many and, then, in manifold ways, through different tastes It meets, and knowing the essence of it, gets united again. Similarly, Eternally One Infinite Consci ousness out of Itself manifests into the multiplicity of beings with diverse forms and natures, tastes Itself in manifold ways.

This multiplicity of beings with diverse forms are the becoming parts of the Eternal Being. The rise of the multiplicity of beings in becoming, which appears to be a vast creation as the Universal show, and to have a continuity of taste, the Eternity sustains it and maintains it accordingly. When in any indivIdual existence of being or in some parts of the becoming existence, the Indwelling Self or Conscious Being determines to go back to his original Eternal State : It then withdraws Itself with all its parts and parcels from the game, and gets dissolved within Itself. Then It is unified again and remains in the unity of One Being. It is called the transformation of the bccoming parts of the Consciousness, which, in condensed and concentrated form, appeared to be individual souls. Then It becomes Integral One Consciousness.

5. In the game of the Consciousness, it is the first and foremost character of the Consciousness to show and express the Infinite Glory of Its Being which is never devoid of and separated from the Conscious Substance Itself.

6. In the functioning game of the Consciousness, taking the form of life, it is the becoming part of the Consciousness itself. It is the divisor, it is the dividend, it is the result and it is the remainder as well. Again it is the experiencer of all the expressions of the game without any exception. It is the guide and sustainer of the game and, in fine, it is the witness of all as well as of itself.

7. The life of a man is constituted of and by the same Consciousness. The becoming parts of it is an undivided One. Even then, for the game's sake, it plays in four dimensions. They are expressed in the name of the physical part, the vital part, the mental part and the intellectual part. All the four parts combined makes another part, which is called the Blissful part, which is common in all. In life, it is found that all the parts have got their particular functions, sometimes separately and sometimes unitedly. When any part of it functions separately, defying other parts, even though all of them are fastened together, it wants to be prominent and predominant. The result is then finite, limited, incomplete and never perfect. But when all the parts function equally at a time, the result becomes complete and perfect. The life is then harmonised and balanced. Consciousness within is identified with the Consciousness itself fully, and outer and inner attitude of life then become One, which is called Perfection and Realisation. This perfection and realisation are symptomatised as the melodious harmonisation and universal symphonisation of all diverse functions of the Consciousness among all living beings. It is a unique representation of all the established faith and Truth of all embracing character and nature about Divinity and One Self, realised by different schools of the past as well as of the present.

8. When any part of life functions separately, it plays the foul game, the rough game, with the emotional mood of itself, though likes and dislikes, preferences and non-preferences, favours and disfavours, reservations and non-reservations accepting a particular unit and rejecting the rest. The result is disturbance and getting confused and upset. This is called the bondage of the Consciousness.

9. When any part of life that is, any part of the Consciousness, is covered and disturbed, or becomes of reverse character, other parts observing it try to control it according to the spirit of the game. Until the discord is reset and tuned again, the disharmony in life continues to be prominent.

10. The Eternal game of the Consciousness through each individual and the universal form of Life, is not monotonous, but ever new. The spirit of the game is eternally the One, because, it is eternally the One Substance of the Consciousness itself.

—:•:—

"Everyone can pray in this wise—"Thakur ! through your own grace please come forward. Please manifest yourself more ....."

—Sree Sree Thakur Satyananda

SAINTS OF THE SOUTH

P. S. Rao

The lives of realized saints are inextrieably mixed with miracles and to an extent with legends too. The miracles are performed by them not as a demonstration of their spiritual powers but to help devotees or to achieve some object. it also sometimes happens that in their lives miracles take place even without any attempt on their part to perform them. The lives of the following saints, therefore, should be read with the miracles and legends as forming an inseparable part of their life stories.

Tiru Jnana Sambandhar

The canonical works of Southern Saivism are twelve in number compiled by one Nambiandar Nambi who lived during the reign of Raja Raja Chola. The hymns sung by sainte Sambandhar, Tiru Navuk Karasu and Sundaramurti form the first seven works. Of these seven the first three contain the compositions of Sambandhar consisting of 383 hymns. In these hymns Sambandhar sings of the temples he visited and of the presiding deities and also refers to the legends about Lord Siva. In the compositions there are also appeals to God to come to the aid of individuals or groups, to work miracles so that the power of God could be shown and to grant spiritual solace to the devotees.

Among saints Sambandhar was a child prodigy. He lived during 7th century A.D. He was born in Sirkali near Kumbakonam in Tanjore Dist. to a pious Saiva Brahmin couple, Sivapada Hrdayar and Bhagavatiyar. When the boy was three years old a miracle happened. One day the father took the boy to the bathing ghat of a tank near a Siva Temple. Asking the boy to wait for him on the bank he entered the water for a bath. Not finding the father the boy cried looking at the top of the temple tower when Lord Siva and Mother Parvati appeared before him. On the direction of Lord Siva, Mother Parvati fed the boy with Her breast milk in a golden cup. On return from his bath the father found milk oozing from the mouth of the boy. Thinking that the boy was polluted by the milk of some unknown women the father was about to beat the boy when the child pointing out to the sky above the temple tower broke into a song conveying that the Lord in His *ardha nariswar* form appeared and came to his rescue. Though the father could not have the vision of the divine he was convinced that his son received divine grace. He followed the boy into the temple where the child prodigy sang his first batch of ten songs at a stretch. Thenceforth began the boy's visits to Siva temples and his singing the glories of the Lord.

Tiru Jnana Sambandhar literally means one who became related to divine wisdom. Accompanied by his father, travelling on foot and sometimes on his father's shoulders, the boy visited several shrines of Lord Siva. Where ever he went miracles

happened, and initially these were regarded more as due to divine grace than due to his own powers. At one stage the boy received from the Lord a pair of gold cymbals and at another a pearl palanquin. One of the important events of the boy saint's life was his meeting an elder saint, Tiru Navak Karasu, also known as Appar.

During his travels Sambandhar, invoking Lord Siva's intervention by his divine songs, performed many miracles. He came to the rescue of a local king in saving his daughter from an incurable malady. An epidemic which was once raging in the Kongu region of the Kaveri was eradicated. An young merchant who died following a snake bite was brought back to life. Once during a famine in the Kaveri delta region when people had no purchasing power he appealed to the Lord and received money for distribution among the needy.

At that time Madurai was the capital of Pandya Kingdom. The ruler was Kun Pandya. The king was a Jain while the queen, the Prime Minister and other important officials were staunch Saivites. The queen did not like the hold that the Jain monks had over the king, and to wean him away from Jainism back to Saivism the queen invited Sambandhar to Madurai. When Sambandhar was in Madurai the king happened to be afflicted with a burning fever. As medicines were of no avail the Jain monks were called for help. But they proved to be helpless while Sambandhar by a song singing the praise of Lord Siva brought the king back to normal condition. This aroused the jealousy of the Jains and so there followed two other tests. Some sacred words had to be written on palm leaves and thrown into a fire and a running stream. The palm leaf thrown by Sambandhar remained untouched by fire while the one thrown by the Jains was reduced to ashes within the twinkle of an eye. Then the palm leaf thrown into the water by Sambandhar started moving upstream while that of the Jains was washed away and disappeared in no time. To the delight of the queen the king became a worshipper of Lord Siva again.

After wide travelling Sambandhar returned to his home town, Sirkali. Arrangements were made to get him married. The saint did not agree at first but he had to finally yield to entreaties. The bride was selected. An auspicious day was fixed and the saint's marriage with the selected bride was solemnised. After the marriage at Tirunallur the saint, his bride and their relatives went to the local Siva temple where the saint sang a soul-stirring hymn and prayed to Lord Siva saying that the time had come to reach Lord's feet. The Lord responded. A blinding *jyoti* came out of the Siva Lingam into which the saint and his bride merged.

Tiru Navuk Karasu

Tiru Navuk Karasu who lived in 7th Century A.D. was a senior contemporary of Tiru Jnana Sambandhar. The two saints met often and a sort of spiritual comradeship developed between them, the younger saint calling Tiru Navuk Karasu as Appar, meaning father. Of the twelve canonical works of Southern Savism complied by Nambiandar

Nambi the first three were composod by Sambandhar and the next Navuk Karasu.

In a village called Tiruvamur in South Arcot district to a devout Saiva Brahmin couple, Pugalanar and Madiniyar, were born a daughter, Tilakavatiyar and a son, Marulnikkiyar who later came to be known as Tiru Navuk Karasu. Tilakavatiyar was to be married to a Saiva saint but unfortunately he died, Soon after Pugalanar and his wife too died. Deeply moved by the triple tragedy Tilakavatiyar thought of committing suicide but had to give up the attempt for the sake of her brother, Marulnikkiyar.

Those were the days when Jainism was popular and was even patronized by the kings. Under the mistaken impression that he would quicken his spiritual progress through Jain faith Marulnikkiyar embraced Jainism. He soon became a prominent Jain scholar and an ardent protagonist of Jain faith and earned the name of Dharmasena. Tilakavatiyar was very much disappointed at her brother's conversion to Jainism and started to pray with deep devotion to Lord Siva to bring him back to Saiva faith. The Lord appeared to have answered her prayer for very soon Dharmasena became afflicted with a physical ailment of which no remedies could cure him. The sister gave him Siva-panchakshara *mantra* smeared his body with *vibhuti* and asked him to go round Lord Siva's shrine and prostrate before the deity. No sooner he did this than his malady left him and he was on the spot endowed with a gift to compose hymns extempore. He composed ten poems in praise of Lord Siva and started to sing them. While doing so a voice of the Lord was heard to give him a new name, Tiru Navuk Karasu, which means "sovereign of divine speech." Thenceforth Tiru Navuk Karasu became a staunch devotee of Lord Siva and began to visit Siva temples, singing the glory and greatness of the Lord and removing weeds from the precincts of the temples he visited with the hoe he always carried with him.

Tiru Navuk Karasu's reconversion to Saivism caused deep resentment among Jain teachers who succeeded in prevailing upon the Pallava king to give him exemplary punishment. Very soon the drama of Hiranyakasyapa and Prahlada, as it were, was enacted between the Pallava king and Tiru Navuk Karasu. The latter was put in a burning lime kiln but he remained unscathed. He was administered poison but to no effect. He was sought to be trampled upon by an elephant but instead the elephant turned on the instigators who fled in panic. As a last resort he was tied to a sizeable stone and dropped into the sea but the stone proved to be his life buoy and brought him safely to a place with a Siva temple near by. Tiru Navuk Karasu entered the temple and in an outpouring of devotional songs extolled the Lord and pledged anew to remain his unflinching devotee and servant. The Pallava king came all the way from Kanchi-puram to fall at the feet of the saint and was duly forgiven.

The saint continued his visits to Siva temples and his service to devotees. Where ever he went miracles happened. He prayed to Lord Siva for the imprint of the emblems of Lord Siva on his hands and the prayer was granted. He pined for the *darshan* of the Lord and that too was granted. In one of his travels the saint was seized with unnatural

hunger and thirst. The Lord materialized for him food and drink. The Lord also granted him his heartfelt desire to have a vision of Kailash. One day as he was removing weeds from the precincts of a temple he stumbled upon gold and precious stones. But being a realized saint gold and precious stones were not different for him from clay and pebbles. In one of his travels he came to the house of his devotee in a place called Tingalur. The devotee prepared a grand feast for the master. As the food had to be served on plantain leaves the devotee's son went to the garden to pluck them. As he was doing so he was bitten by a snake but the boy ran back into the house, delivered the leaves and died. The parents did not break this news to the saint for fear that he would depart without taking his meal in the house. But the saint could visualise what had happened. He got the boy taken to the nearby Siva temple, placed him at the temple entrance, appealed to the Lord with a batch of ten songs and brought him back to life. Returning to the devotees house the saint satisfied the devotee by partaking of the feast.

Tiru Navuk Karasu lived beyond eighty. He prayed to the Lord to take him back. On an auspicious day the saint found his last prayer answerd and the saint's earthly existence came to an end.

[*To be continued*]

National Integration in India

Jyotsna Nath Mallik

A territory as the abode of men, tinged with the hues of the history of their actions and aspirations assumes a mental image which imperceptibly leads the inhabitants of that place generation after generation to think and act in a particular direction. The determining factors are necessities of social living and spiritual urges. This is the basis of nationality of that conntry. In the midst of political and geographical changes the national memory motivates national activity and inspires national ideals in response to challenges of changing environment and changed conditions of social living.

India through centuries of history and different kinds of changes has developed a spiritual entity out of the welter of aeons of events and ideas, imagination, contemplation and interests of peoples coming or residing there. It is like a pitcher of nectar churned out of the eternal ocean of time there. Suckling her children with this ever-flowing mother's milk Mother India has been inspiring them to aspire for deathless bliss. This spiritual mother instils strength, vitality, hope in their souls. Piercing the density of gathering gloom the flame of light guides Indians to their destined and cherished goal. Mother earth becomes mother etherial. Clod becomes conscious. The accumulated culture and spiritual consciousness of India transforming and synthesising all conflicts and contradictions emerge as an eternally vigilant soul of India to bind together

Indians by a subtle thread of unity. The apparently chaotic and unshapely mass is transfigured into a beautiful body robed in variagated colours. This soul of India is the rock of faith on which Indian nationality stands. The vitality of this national integrity lies in a deep and firm realisation of unity amidst diversity. This realisation is attested not only by rural and sylvan corporate living for centuries but also by the search for truth and God in India, by philosophical pursuits and religious practices, lone contemplation and devotional ecstasy. The sense of unity is not defeated by variety and the national feeling sometimes transcends death and geographical boundaries. God Himself in India is the One In Many and it is One who manifests as Many. The variegated without does not disturb the realisation of the One within.

This image of national integrity has been inspiring patriots, poets and prophets. It has been affirmed by saints and savants in India however different may be the forms of religon or schools of thought. It has been naturally and strongly confirmed by people's sacrifice, poet's emotion and patriot's statesmanship.

The Indian poet* enjoys this unity in diversity and looks wondrously at this majestic and magic panorama. He gets thrilled by the constant dips in this sea of diverse forms surging in beauty—Ellora, Ajanta, Madura, Tanjore, Purushottam, Girner, Hinglej Jwalamukhi Dwarabati, the eternal springs of Ideas and emotions, symmetry and symphony, aspirations and self-transcendence. In seagirt India in the far-flung fair of changing sights the poet gets regaled as by counting beads with holy names, extending from the Himalayas to the seashore. Everyone is chosen as a participant in the fair – the Toda, the Munda, the Lepcha, the Nulia, the Naga. Every one watches, none who joins in the concourse of the fair's din can be ignored. It is a great massive and unique synthesis of diverse peoples. Unusual is this very sight. Un-acquainted with each other they are still eternally related and known, Lovers of men and of God, artists, poets and thinkers have established this holy place. They have invited all of them to live together in the dwelling house of the only one Master of the house.

The perception of such national integration causes emotional integration in the hearts of every citizen and kindles patriotism into a live flame. The white flame consuming all dross sheds a bright radiance over the country, The Poet* sings :—

'Greek, Hun and Shak have mingled in me
In me has merged Iran and Turkman
Very dear to me is integration
O' my Bharat, my Hindusthan,
Come O' Muslim come O' Christian,
Every one is my own I welcome every man
Cordially received, equally honoured all.
O' my Bharat, my Hindusthan.'

The Indian Constitution recognises and upholds this integration. It reflects

* Kumudranjan Mallick.

the same ideal of unity in diversity, of equal rights and respect. Power politics and individual greed bereft of social responsibility and national interest have blurred the vision of one citizenship and common living. Only a few years after independence of the country from foreign domination certain happenings in India are endangering its integrity. The constitutional safeguards for minorities and the backward sections are being dangerously inflated into privileges defying fairness, justice and consideration for all. National interest is being ignored. The citizen's image and country's image are scratched and besmeared by indiscipline, anarchy, selfishness, avarice and corruption. National interest is lost sight of amidst narrow self-seeking. What was aimed at fusion is being manipulated as tools for fission. Nationality with independence of the country itself faces a graver danger from the domination of foreign political, economic, educational ideas and objects imported blindly oblivious of Indian heritage and national conditions. Self-confidence, self-reliance and self-respect born of Indian spirituality along with the feeling of oneness with all, are eroded by a blind faith in borrowed materialism and a pugnacity engendered by materialistic aims and attitudes. Selfish aims, evil designs, corrupt practices have substituted sacrifice, purity and integrity of the national spirit and patriotism. Purity of mind and character, spirit of sacrifice and service can only restore the clarity of vision and purity of action. Poets and prophets, saints and sages again call for fearless, selfless, farsighted, loving and manly souls to lead the nation. People wait for such leaders. The first duty of every citizen is to discourage and disown all fissiparous tendencies, corrupt values and corrupt practices. All must feel proud of the nation. The pride in India will not be obtuse to international amity and brotherhood. International attitude in Indian nationlism is a characteristic feature of its spiritual heritage and culture. All austerities and sacrifices here are for the good of the whole world. The vision of One maker makes the vision of One world real. The poets idealists and social realists are proud of India and the spiritual entity of India s nationality. The poet* sings in joy –

'How intense is my delight, how massive I feel glad.
Me and every particle of mine is Indian land.
I am Gaya, Kashi, Ajodhya, Puri and Brindabon,
I am Kamakhya, Kashmir and Somnathpattan.
Surely I am an insignificant image
But that great Himalayas gives my lineage.'

– :0.

"You get what you seek. He who seeks God gets Him ;
he who seeks for wealth or power, gets that."

—Bhagwan Ramkrishna Dev.

T. S. Eliot···a voyager towards faith

Sri Parthasarathi Mukherjee

T. S. Eliot is the pioneer of modernism in English poetry. He believed that every poet starts from his own deep rooted emotions which are given poetic shape by "auditory imagination." Then the poet must become more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to dislocate if necessary, language into his meaning. Finally, according Eliot, the essential advantage for a poet is not to have a beautiful world with which to deal ; it is to be able to see beneath both beauty and ugliness ; to see the boredom and the horror and the glory. This is Eliot's manifests of poetry, at least of his own practice.

Eliot's journey motif, as a thematic and structural device in his poetry, refers primarily to the journey from boredom through horror to glory. from the chaos of unbellef to the order of faith, from negation to redemption, a voyage from hell to heaven, from tension to serenity. The journey image, the motif of a passage is central to Eliot's poetry. Through the thematic image the Poet dramatises his quest for redemption. His poetry recurrently dramatises the image of someone going somewhere for something. Fertility will not return to the waste land until the Holy Grail (Ideal Object) is found. Allegorically it means to Eliot the disease of the modern age can be cured only by the return of Christion faith. Eliot's poetic progress may be described as an advance from the exploration of the natural condition of man towards vision of the supernatural behind man's natural life, where all conflicts are resolved and the contraries of life reconciled.

Eliot, indeed, moves from the contemplation of "the turning wheel to the apprehension of the still point round which it revolves, the point of intersection of the temporal and the timeless. The early phase of his poetry is concerned with the depiction of the nature and extent of the spiritual death of godless humanity, but the later phase concentrates upon the process of spiritual rebirth which leads to the mystic state in which one is liberated from all sorts of material bounds. So Eliot's journey is organic and continuous.

In Prufrock the protagonist sets out on a visit with a companion through the modern hell (city) to a salon (a vacuous world). His nocturnal journey through nightmares of city to the sea-shore of fantasy starts from hell. The women who come and go convey the sense of mechanical existence under elegant manners. The boredom of Prufrock's experience with women to be found in the three stanzas beginning with, "For I have known them all already···" The images of the lines "I have measured out my life with coffee spoons" etc. clearly suggested the meaningless and disgraceful condition of his life. The very structure of the poem is an exact graph of the configeration of the

internal monologue. It is the most typical example of Eliot's early manner ironic, detatched, half cynical and half comic. In Portrait of a Lady the line "And so you are going abroad and when do you return" relates to Eliot s experience of voyage from New England to England and back to New England. In Preludes he depicts starkly the meaningless society of the slums at nightfall and in the morning with a series of photographic portraits.

Crossing the Stage of boredom Eliot's journey faces horror first in 'Gerontion' (1920) which presents the pictures of a civilization crumbling, disintegrating, spiritually sterile. In the opening lines Gerontion introduces himself as an old man in a dry month waiting for rain. 'Dry month' is a condition of spiritual barrenness and 'rain' is the grace of god which will purge his mind and restore him to the state of spiritual health, purity and vigour. In gerontion the speaker reminds the listner that human history since the Fall, particularly modern history, has confused man wandering through 'many cunning passages, contrived corridors, the labyrinthine ways.' 'Rain' is Eliot's comprehensive symbol for spiritual, emotional and sexual vitality and regeneration. Repitition of 'dry' in the line 'Thoughts of a dry brain in a dry season' links the poem with The Waste Land (1922) which is concerned with the spiritual waste land of modern society, as a result of man s alienation from God. The theme of the Waste Land cannot be isolated from its structure. The pattern of parallelism between antiquity and contemporaneity, each providing its comments upon the other, is the general feature of the poem's structure. Here the structure is a series of concentric circles moving round the basic theme of death rebirth, but the successive turns mark a more or less progressive probe into the depth of the meaning. 'The Hollow Men' (1925) presents the full horror of the contemporary life. There is no redeeming feature, absolutely no hope, no meaning for the hollow men 'The stuffed men leaning together in death's twilight kingdom. Without the eyes to see the way of redemption, they go round the prickly pear, suggestive of winter and death. Eliot creates here minimal poetry dependent on halucinatory incantation and repitition of even nursery rhythm is exploited hypnotic poetic effect.

Eliot's early poems upto The Waste Land constitute a diagnosis of the malaise of the contemporary world : his later poems from Ash Wednesday (1930) onwards provide the panacea for the ailment. If the Waste Land is Eliot's Inferno Ash Wednesday is his Purgatorio, Four Quarters (1933-48) his Paradiso. A quest for rebirth through journey "all night"- a journey at once physical and spiritual, is the theme of 'The journey of the Magi (1927). 'Journey' itself is a quest symbol, signifying the passage of mind, from one state to another from the death of the old to the birth of the new. The structure of the poem echoes its thematic aspect. The journey image is more psychologically and by no means less lyrically presented in Merina 1930) by the image of a ship making its landfall on an unknown shore to symbolise hope and strength revived and vision refreshed and extended. The voyager can now fare forward to an assured post. Marina and Ash Wednesday show the emergence of Eliot from the Waste Land with a better hope than humanism. The Four Quarters (1933-48) reveals Eliot's solving for

himself the problem. Eliot's journey is over ; his home-coming is Little Gidding (1942). From the theme of communion the Quartet mounts finally to contemplate the ultimate, eternal union with God of all that is redeemable. Each Quartet is itself a symphony of five movements. In this progress from the secular towards the spiritual Eliot's poetic structure undergoes a steady process of change and transformation from the stage of the experiment with living speech as a medium of poetic expression to that of musical elaboration.

—oo—

My God

Lakshman Dev Sharma

Oh, my God where are you
Infinite nature your I see to new
Go by the almighty oh my God,
Hallow here you in and abrod

Whense you strange whense you broad
I say you creator famus my God I
Living you ? enternal you love
I know you wonder problem above.

—0—

"The tempo of JAPAM is to be accelerated as need be, just as one has to walk faster to reach the destination in good time. Beware, everyone must depart as ordained."

• • • • •

"The sub-conscious impressions spring up to the surface all of a sudden. Conversely, sacred thoughts are to be slipped down into the sub-conscious by conscious efforts and you will find them absorbed ; not so by other means. Take for an instance, 'kathamrita' is being read out. I am doing something or conversing with someone, of course, situation so demanding. I might not answer in the affirmative, if asked, but the sub-conscious will quietly record the substance of the Portion read. Take again the effect of placing the lord's portrait in some nook or corner making only a partial view possible. The mind might not always tend to take cognisance of a portrait in full view but the semi-concealed image will naturally slip into the sub-conscious and cut an impression."

—*Sree Sree Thakur*

भजन

श्रीश्रीठाकुर सत्यानन्द

हरि रस पीना है तो
धर ले पंचवट की प्यास
आँखों को झरना है तो
धर ले सुरधुनी की फाँस ॥

नये वृज के घूर
नई वँसिया के सुर
धरना है तो धर ले
गदाधर की रास ॥

—:०:—

भजन

श्रीअर्च्चना पुरी

किसमत तुझे पूछूँ बारबार
होगी पूरी कब ये इन्तजार ॥

नदी किनारे जिसका वास
उसकी मीक्यूँ न मिटती प्यास
लाखों तरंग उठे झकझार ॥

तारे झिलमिल वो आसमान
पूछे मुझे क्यूँ इतनी थकान ।

किसमत तूँ मेरे सामने आ
तेरी लिख तूँ मुझे बता
कितने दिन उसे करूँ पुकार ॥

भजन

स्वामी मृगानन्द

हरि मोरि लाज रखियो प्यारे
भटकन मेरो चुके चुकाए
अब तुम ही एक सहारे ॥

अब तो तेरो रूप मैं ध्याऊँ
सकल छवि अब दूर हटाऊँ
तुम रहिओ हृदय किनारे ॥

प्यास बुझे वो रस मिला दो
अमृत बूँद एक मुझे पिला दो
अब न रखिओ आपसे न्यारे ॥

—:०:—

स्मृतितीर्थ

स्वामी निर्वेदानन्द

सतीनाथ बाबू एक मध्यवित्त गृहस्थ थे। शिक्षा विभाग में काम करते थे। सांसारिक प्रथानुसार कुलगुरु से दीक्षा ली थी उन्होंने। ब्राह्मण शरीर था। धर्मलाभ में विशेष स्पृहा और आस्था थी। वे वीरभूम के एक गाँव के प्राचीन तथा अर्थशाली ब्राह्मण वंशके धारक और वाहक थे।

लोक मुख से तथा किसी निकट सम्बन्धी के मुँह से ठाकुर के बारे में सुन कर वे सिउड़ी आश्रम आये और धीरे धीरे आनाजाना करते करते ठाकुर के प्रति अनिर्वचनीय आकर्षण अनुभव करने लगे। एकदिन इसीतरह आश्रम जाकर सुना कि ठाकुर उसी दिन कलकत्ता जा रहे हैं, फिर कब तक लौट कर आयेंगे मालूम नहीं। सामयिक विदायी थी—फिर भी व्यथा की सीमा नहीं थी। रहरह कर आँखों से आँसू की धारा बहने लगी, नजर धुँधली हो गई। सीने में थी एक अनजानी कसक। इस थोड़ेसे समय में ठाकुरने न जाने कब हृदयके किसी कोने में चुपके से घर कर लिया था!

ठाकुर से पूछते ही बोले—"हाँ, यही मेरा 'Last supper' है"

वे आँसू को काफी मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर Last supper शब्द के उच्चारण के साथ साथ बाइबल में वर्णित Last supper की बात याद आ गई और असुरुद्ध आँसू का बाँध टूट गया आवेग भरी अश्रुधारा बहने लगी, वे फूट फूट कर रोने लगे। ठाकुर उनकी ओर स्नेहमयी नजरसे देखकर बोले—"A good soul, a good soul!"

धीरे धीरे रवान होने का समय आ गया। ठाकुर को स्टेशन ले जाने के लिये नेबूतला के मोड़ पर घोड़ागाड़ी आकर खड़ी थी। उपस्थित भक्तोंने एक एक कर आश्रम के आंगन में ठाकुर को प्रणाम किया। सतीनाथबाबू प्रणाम करके उठते ही ठाकुर उनकी एक बाँह सस्नेह हाथ से पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़े और गाड़ीपर चढ़ने के पहले तक उसी तरह पकड़े रहे। ठाकुरने विदा ली। भक्तों में कोई कोई सिउड़ी स्टेशन तक गये और कोई कोई अपने घर लौट गये। ठाकुरके उस अमोघ पुण्य स्पर्शसे रात भर एक आनन्द विह्वल अवस्था में सतीनाथ बाबू की सारी सत्ता डूब गई। हरक्षण महसूस होने लगा जैसे उनकी पुरानी सत्ता अचानक ही टूट कर चकनाचूर हो गई है, और उस देवतनुके दिव्य मधुर स्पर्शसे एक नई सत्ता का निर्माण होने लगा है उनके अन्दर। दूसरे दिन सबेरे उनको ऐसा लगा मानो कलके सतीनाथ और आजके सतीनाथ में जमीन आसमान का फरक है। शाक्तवंश के होने के कारण मांस मछली आदि के प्रति स्वाभाविक आसक्ति थी। लेकिन यह क्या?

उसी दिनसे मांस मछली प्याज लहसुन आदि सर्वथा त्यागमे की प्रबल स्पृहा कैसे जगी ? किसने जगाई यह स्पृहा ?

सिर्फ आमिष वर्जन ही नहीं, उस दिन घरके सारे बरतन बदले गये, धोये गये और अत्यन्त सात्विकता के साथ रसोई बनाई गई। और उसी दिनसे शुरु हो गया संसार में रहकर ब्रह्मचर्यका पालन। यह किसी के आदेशसे नहीं, निर्देश से नहीं स्वप्नादिष्ट होकर भी नहीं—सिर्फ कई एक मिनटके दिव्य स्पर्शने ही शरीरके सारे अणु-परमाणु में एक महान आलोड़न पैदा कर दी थी और फल स्वरूप जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ गया था। यह कोई हठयोगी की सिद्धाई नहीं थी। यह दिव्य योगी की दिव्य इच्छा जनित दिव्य संस्कार का प्रभाव था। परिणति स्वरूप उनका सारा परिवार ही आश्रम-मुक्त हो गया—खुद सन्यासी हुए, पत्नी सन्यासिनी हुईं और तीनों पुत्र सन्यासी हो गये। तीन पुत्रों में ज्येष्ठपुत्र स्वामी सुरेश्वरानन्द ठाकुर के प्रधान सन्यासी संतानों मे अन्यतम हैं और संघ में विशेष पदाधिकारी हैं। दूसरे दोनों भी आश्रम विद्यापीठमें विद्यादान कार्य में व्रती हैं। यह उस-दिनका हाफ् पैन्ट पहना बच्चा आज आश्रम का विशेष धारक बन गया है।

* * * * *

घुमक्कड़ और अव्यवस्थित न होने पर भी मानिकबाबू के जीवन में उतार चढ़ाव काफी आते रहे। विश्वविद्यालय की उपाधि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद एक वृत्तिसे दूसरी वृत्ति लेकर और राजनैतिक आन्दोलन के जाल को काट कर कलकत्ते में आ बसे। फिर वहांसे छुटकर ठोकर खाते हुए जा पड़े वीरभूम के आश्रम की सीमा में। वे आश्रम जाने लगे और उनके साथ घरके और लोग भी जाने लगे। मानिकबाबू की कन्या अर्च्चना मा भी जाने लगी। उसकी उम्र थी सिर्फ दस या ग्यारह साल, पर उसके जाने में एक विशेषता थी।

मानिकबाबू उनदिनों कलकत्ता में थे। उनके एक दोस्त हाइकोर्ट के वकील हेमबाबू काफी अच्छे ज्योतिषी थे। उन्होंने मानिकबाबू का हात देखकर कहा—भाई, हाइकोर्ट के झिंगेबाबू जैसा ही आपका भी भाग्य है। झिंगेबाबू ने राजपरिवार में अपनी लड़की का विवाह किया था। थोड़े ही दिनों में लड़की विधवा हो गई और झिंगेबाबू लड़की के ऐश्वर्य से धनी बन कर जुड़ीगाड़ी में चढ़कर सुख से दिन बिताने लगे। कुछ दिन बाद अर्च्चना मा की जन्मकुण्डली फिर एक नामी ज्योतिषी से विचार करवायी गई। ज्योतिषीने बताया—कन्या विशेष भाग्यवती है लेकिन बचपन में वैधव्य योग प्रबल है। इसके अलावा परमायु भी कम है, अल्पायु योग है।

मानिकबाबू के मन में एक कांटे जैसी चूभने लगी यह बात। लड़की विधवा होगी और उसके धनसे धनी होकर समाज में चलना पड़ेगा, ऐसी अवस्था धिक्कार जनक है। उसकी ११।१२ साल की उम्र में ही विवाह का एक प्रस्ताव आया और आया किसी राजपरिवार से ही। शंका और

भी बढ़ी। लेकिन इधर ठाकुर के संस्पर्श में आकर त्याग तपस्या की दृढ़ता और भगवद्भक्ति की प्रबलता ने उसे सांसारिक व्यापारोंसे क्रमशः दूर हटा लिया था। वस्तुतः अर्च्चना मा ठाकुर को गुरु इष्ट भगवान के रूप में ग्रहण कर चुकी थी।

एकदिन श्रीठाकुर मानिकबाबूको बुलाकर बोले— देखो अर्च्चना का विवाह देना मुश्किल है; क्योंकि उस विषय में बातचीत पक्की करने पर वह आत्महत्या करने को भी तैयार है। और वह उसका पथ भी नहीं है, उसका पथ यही है। तुम उसको मुझे दे दो इसके अलावा परमायु भी कम बोल रहे हो, मैं जरा देखूँ।

हे प्रभु, हे अन्तर्यामी, संकट के समय सन्तान की रक्षा तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मानिकबाबू ने ठाकुर से ज्योतिषी को कही सारी बातें बताकर प्रार्थना की—धर्मपथमें रहकर ठाकुरकी कृपा से अगर महिमा मण्डित हो उठे उसका जीवन, तभी संकट मोचन होगा और होगा—कुलं पवित्रं जननी कृतार्था। फिर अचानक एक दिन अर्च्चना मा आश्रम से घर नहीं लौटी, और वह कभी नहीं आयेगी—यह भी कहला भेजा। तब आश्रम में सिर्फ अर्पणा मा पुत्र-कन्या सहित आकर रहने लगी थीं। मानिकबाबू को आश्रम तथा परिवारवर्ग के मुँहसे भीषण कटुक्तियां सुननी पड़ीं और काफी लोग उनके प्रति विरक्ति प्रदर्शन करने लगे। इतनी तीव्र समालोचना के बावजूद भी अर्च्चना मा आश्रम में रह गई और ठाकुर ने उसे ग्रहण किया अपनी कन्याके रूपमें।

श्रीश्रीठाकुर के निर्देशानुसार अर्च्चना माने संगीत रचना तथा उनमें सुर संयोजन आदि शुरु कर दिया। धीरे धीरे बंगला हिन्दी इत्यादि भाषामें ठाकुर और मा के विषयमें सुन्दर सुन्दर भजन, कीर्तन और संगीत रचना कर खुद ही उनमें सुर संयोजन कर गाने लगी। पुस्तक तथा नाटक रचना भी शुरु हो गई।

गाना सुनकर विशिष्ट संगीतज्ञों ने घराना और शिक्षा के बारे में पूछा है; तथा गीत की भाषा तथा अन्य लेखोंको पढ़कर मुग्ध हुए कवि, साहित्यिक, लेखकों ने उन विषयोंमें उसकी पढ़ाई और साधना वगैरहके बारेमें पूछा है। ठाकुर ही हर समय इन प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे—कारण आश्रमकी मातायें साधु सन्यासी, पुरुष भक्त, यहांतक की पूर्वाश्रम के पुरुष रिश्तेदारों से भी बात नहीं करतीं उनको जो कुछ कहना होता ठाकुर से या ठाकुर के माध्यम से कहतीं। तो ठाकुर कहते— भक्ति और शरणागति लिये पड़े रहने से सबकुछ सम्भव हो सकता है। श्रीरामकृष्ण ठाकुर तो दिखा गये हैं—निरक्षर होते हुए भी भक्ति और शरणागति लेकर पड़े रहने के कारण "मा" को अविरल धारा में ज्ञान का रसद जुगाना पड़ा है।

मनुष्य के मनका संशय फिर भी नहीं जाता। कई लोग सोचते—ठाकुर का ही लिखा हुआ या बताया हुआ सब उसके नामसे चला दिया जाता है; नहीं तो पठित विद्या के क्षेत्र में जहां शून्य है,

वहाँ यह कैसे सम्भव हो सकता है ? जो भी हो ; बहुतों के संशय को उपेक्षा कर अर्च्चना मा और बादमें शरणा मा, आरनि मा, शोभा मा, आदि और कईयों ने भी काफी कुछ लिखा। हालांकि इनमेंसे कोई भी विशेष पढ़ी लिखी नहीं थीं. फिर भी इन्होंने काव्य, प्रबन्ध, जीवनी ग्रन्थ, दर्शनशास्त्र, भजन इत्यादि बहुत कुछ लिखा। नीचे ठाकुर के आगे शास्त्रालोचना होती—समाधान के लिये तर्क लग जाना ; ठाकुर प्रश्न लिखकर ऊपर भेजते सहज सरल और कितने ही क्षेत्रमें सबसे सुन्दर उत्तर आता वहाँ से।

भारत के अन्यतम श्रेष्ठ गायक पण्डित ओंकार नाथ ठाकुर भी एक दिन आश्रम आये। अर्च्चना मा खुद का लिखा और सुर दिया हुआ एक हिन्दी भजन मन्दिर में देवता के सामने बैठी गा रही थीं। सुनकर अश्रु-विगलित कण्ठ से बोले—'हाँ बाबा, आज कुछ मिल गया, पिताजी की बात आज कुछ फल गई। मेरे पिताजी सन्यासी थे और उन्होंने कहा था—तुम्हें मिलेगा। ऐसे ही मिलता है कुछ कुछ।'

ठाकुर आते हैं रक्षा करने संहार करने, नहीं। They Come not to destroy but to fulfil. हरक्षेत्रमें उनका यह जो मोड़ घुमाकर सबके अन्दर सामन्जस्य विधान करने का कार्य है. यह क्या हर कोई कर सकता है ?—यह तो जिन्हें सजता है उन्हें ही सजता है।

*

अंगरेजी १९४२ साल की बात है। भारत तब संगीन राजनैतिक विप्लव से गुजर रहा है। भारत को प्रायः कब्जे से बाहर जाते देखकर अंग्रेज सरकार आशंका ग्रस्त हो रहे थे। आसमुद्र-हिमाचल भारतवर्ष पराधीनता की बेड़ी तोड़ने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध था।

इन्हीं दिनों के बीच सिउड़ी आश्रम की भली भाँति प्रतिष्ठा हुई थी। वहाँ भी इने गिने कुछ आश्रमवासी और आश्रमवासिनियों के जीवन को लेकर तोड़ने गढ़ने की एक वैप्लविक प्रक्रिया चल रही थी। भोग विलास लालसा आदि के विरुद्ध जिहाद घोषणा कर भारतीय साधक के शाश्वत त्याग वैराग्य की पुनः प्रतिष्ठा का यह एक अभिनव आयोजन था। नौ दस वर्ष के बच्चे बालिकाओं से लेकर पचास वर्ष के वृद्ध साधक साधिका, जो भी इस बीच ठाकुर से ब्रह्मचर्य तथा सन्यास की दीक्षा या उस विषय में पूर्वपाठ ले रहे थे, उनकी त्याग-तपस्या की कठोरता, आहार-विहार में कृच्छ्रता, साधनाकी प्रखरता आदि देखकर बहुत लोग भयभीत हो गये। बहुतों ने सोचा—ठाकुर की सम्मोहिनी शक्ति के बलसे ही ऐसा सम्भव हुआ है। वे लोग अपने घरके बच्चों को आश्रम के इलाके में जाने के विषयमें सतर्क कर दिये। कुछ लोग तो खुले आम बोलते—वहाँ जाना है तो जाओ, पर ठाकुर के हाथ का दिया चिनाबादाम प्रसाद कभी मत खाना ; खाये कि संसार से हाथ धोना पड़ेगा।

ठाकुर सारे दिनमें सिर्फ थोड़ा दुध, थोड़ा चीनाबादाम और दो तीन केला खाया करते। आश्रमके और भी कई लोग आहार के रुपमें सिर्फ यही लेते और जो लोग अन्न वगैरह लेते वे भी नमक चीनी-तेल-मसाला वर्जित उपकरण ही लेते, ताकि जीभ की लोलूपता किसी प्रकार से न आयो। रात्रि जागरण तो नित्य नैमित्तिक घटना हो गई थी। भजन कीर्तन मन्दिर परिक्रमा, और कभी अन्धेरे में दलबल सहित खुले मैदान में जाकर कीर्तन, कभी होमानुष्ठान आदिमें रातें बीत जातीं। सिउड़ी शहर से करीब पांच मील की दूरी पर दो नदियों के बीच एक जंगलाकीर्ण जनमानवहीन बालूचर है—जिसका नाम दिया गया है 'रासवन'। हर रासोत्सव पर ठाकुरकी उपस्थिति में यहां एक रासमेला आयोजित हुआ करता। प्रति वर्ष रास पुर्णिमा में वहां राजकर्मचारी, सहरवासी गृहस्थ, आदिवासी और अन्त्यजों का महा सम्मेलन हुआ करता। उस समय लगातार कईएक दिन वहां जाकर कठोरतर तपस्या और कृच्छ्र साधना की व्यवस्था होती। उन दिनों की उस कठोरता और कृच्छ्र साधनामें भक्तदल जो स्वच्छ्र तथा मन मोहक आनन्द का उपभोग करते उसे स्मरण करने से आज भी शरीर मन पुलकित हो उठता है। मन कहता है-- क्या वे दिन फिर नहीं लौटेंगे ?

छोटे छोटे बच्चे भी ठाकुर का दिव्य संग नहीं छोड़ते थे, इसलिये वे भी बीच बीचमें जाया करते थे। वहां सिर्फ मिट्टी का एक कोठाघर था। रात को सोने की कोई वला तो थी नहीं। इसलिये उसी एक घर में ही काम चल जाता था। एकबार कुछ छोटे छोटे बच्चे भी वहां साथ गये हुए थे। शाम हुई और धीरे धीरे रात गहरी हो गई। ठाकुर भक्तों के साथ 'काना' नदी के किनारे जाएँगे। ठाकुरने इस नदी का नाम दिया था "विस्मरणी", क्योंकि यह सब कुछ भुला देती है। कितने ही भक्त जो दिनको ऑफिस और कचहरी आदि के काम में व्यस्त थे, कर्म समाप्ति के साथ ही पैदल चल कर आधीरात गये आकर पहुंचे। होम, नाम भजन, कीर्तनादि आनन्दानुष्ठान में सारी रात बिता कर फिर सूर्योदय के पहले ही लौट गये शहर की ओर। लोगोंने उन्हें पागल, उन्माद और मोहमस्त कहा। रात के अन्धेरे में ठाकुर मुँह मुँह में गीत रचना करते। एक एक पंक्ति गायी जाती और एक एक भक्त उस पंक्ति को अलगसे याद रखते। सबेरे उन बिखरी कड़ियों को जोड़ कर गीत लिख लिया जाता—यह था रोजका खेल।

बच्चे ठाकुर की वाणी और गाना आदि सुनते सुनते जंगल के बीच मिट्टी के घर में सो गये थे। दो एक बोरी और चटाई बिछी थी। उनको क्या व्यवस्था होगी यही चिंता होने लगी। कारण, कोई भी नहीं चाहता था ठाकुर के साथ बैठ कर होमानुष्ठान भजन कीर्तनआदि से वंचित रहकर वहां बैठे पहरा दे। इधर बच्चों को उस हालतमें उठाकर साथ ले जाना भी निष्ठुरता होती। कारण वे सारे दिन खेल कूद दौड़धूप के बाद थोड़ी देरके लिये सोये थे।

लेकिन प्रहरी अवश्य चाहिये कारण सियारों का डर है और अचानक आ पड़े बाघ भालुकों का भी डर है। हठात् ठाकुर बोल उठे "रहने दो, दरवाजा बन्ध कर दो—चलो हम चलें; इन्हें रहने

दो यहाँ इसी तरह ; "मा" इनको प्रहरी रहेंगी, उन्हीं के जिम्मे इन्हें रखकर जाऊँगा।" ठाकुर के निर्देशानुसार हम सब चले गये। विस्मरणी के किनारे रातभर होम भजन कीर्तन आदि चलता रहा। धीरे पूरब गगन अरूणाई की लाली से भर उठा। ठाकुर होम समाप्त कर लौटे। पहले ही उस मिट्टी के घर में गये। बच्चोंको नींद से जगाया। किसी भक्त ने बोरी चटाई उठाई। उठाते ही सब भय-विस्मय से चौंक उठे! देखा, कई टुकड़ों में कटा हुआ एक विषधर साँप पड़ा था! उसके पेटमें था अध-चबा प्रसादान्न। लोगों के मनमें तरह तरह का संशय उठने लगा। पर बच्चों के नीचे बिछी बोरी और उसके नीचे कई टुकड़ोंमें कटा हुआ मृत सर्प का रहना कैसे सम्भव हो सकता था इसका युक्तिपुर्ण समाधान असम्भव था। ठाकुर—फरमाये "देखो मा का काम ; मा प्रहरी होने पर, जिम्मेदार होनेपर, और क्या डर है ?" लेकिन भक्तलोग अवाक् होकर यह बात सुनते हुए उनकी बात ही साचने लगे जो "मा" को प्रहरी के कार्यपर नियुक्त कर सकते हैं।

[बंगला से अनुवाद: स्वामी मृगानन्द]

—❀—

भक्तवत्सल राम

शुभा पुरी

भगवान भक्तवत्सल हैं। इसबारे में कितनी ही लीला गाथाएँ सुनने को मिलती हैं। मुझे याद आ रही मेरे प्यारे प्रभुजी की भक्तवत्सलता की बात। उस दिन था सुनहरा सवेरा। मधुमय परिवेश था। कलनादिनी गंगा लहराती हुई बह रही थी। हवन हो चुका था। हवन और फूलों की सुरभित निधि उँड़ेल कर पवन चल रहा था। भक्त मंडली प्रभुजी की प्रतीक्षा में थी। इतने ही में खुल गये मंदिर के द्वार, ठाकुर जी अपने आसन पर आ विराजे।

प्रभुजी की बिखरती हुई मधुर दृष्टि से मानो आशीष सुमनों की बौछार हो रही थी। फिर तो भीड़ लग गई प्रणाम और भेंट चढ़ाने की।

प्रभुजी की मधुरातिमधुर वाणी से भक्तजनों के अन्तर मधुमय हो रहे थे। कुछ देर तक सब भूल हो गये कि, रेतीली धरती पर हैं या मधुमय नित्यधाम श्रीवृन्दावन में हैं। भूल गये देश, भूल गये घर, भूल गये देह-मन की सुध। ऐसे ही मधुमय थे हमारे ठाकुर जी, ऐसा ही मधुमय था वह वातावरण। यह रस जो एकबार चाखे हैं वो कभी नहीं भूल सकेंगे उन अमृत भरे मधुमय दिनों को।

इसके बाद ठाकुरजी अपने प्यारे गोपाल के पास बैठ गये। अब तो शुरु हुई पूजा। भक्तन के लाये हुए भेंट मैं ठाकुरजी को दिखाने लगी। गोपालजी के लिये बढ़िया बढ़िया भोग था और इतना था कि मंदिर का आधा कमरा भर गया। जो जो चीज जो जो भक्त लाये थे, उनका नाम ले ले कर ठाकुरजी को दिखा रही थी। मेरा उद्देश्य था—ठाकुरजी की कल्याण दृष्टि से उन सबों का कल्याण हो। प्रभुजी उदास-सी नजरों से देख रहे थे। एक भक्त का नाम लेकर बोले—"अरे देख, वो भी चावल और चिड़वा लाया है।" मैं चावल और चिड़वा की टोकरी खोजने लगी। लेकिन मेरी नजर में नहीं आई वह टोकरी। फिर मैं बोली—ठाकुरजी मुझे तो दिखाई नहीं देता कहाँ है चावल चिड़वा। प्रभुजी ने कहा— "हाँ देख, वो चावल चिड़वा लाया है।"

मैं फिर से ढूँढ़ने लगी तो देखी—एक भक्त की दी हुई बड़ी टोकरी के नीचे एक ऑफिस के लिफाफे में मुट्ठीभर चावल और मुट्ठीभर चिड़वा पड़ा हुआ था। मैं लिफाफा हाथ में लेकर बोली —ठाकुरजी, ये ही तो चावल चिड़वा है न? ठाकुरजी बड़ी खुश नजरों से देख कर बोल उठे-- हाँ हाँ ये ही है!

मेरी आँखों में आँसु भर आया। ऐसे भक्तवत्सल राम को छोड़कर कहाँ जाऊँ! मालदार भक्त की भेंट से भी दीन भक्त की भेंट इतनी प्यारी है। और यह प्रेमलीला मैंने अपनी आँखोंसे देखी थी। प्रभुजी अपने एक भजन में लिखे हैं—"विदुरेर प्रेमसुधा / मिटाते पारितो क्षुधा / आमि हृदय भरिया ताओ दिते नारि हे॥"—विदुर की प्रेम सुधा तुम्हारी क्षुधा मिटा सकती थी, पर मैं तो भरपूर हृदय से वो भी नहीं दे सकता।

—:●:—

With Best Compliments Of :

HASIMARA INDUSTRIES LTD.

5 & 7, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-1

DIVISION :

Beech Tea Garden	Doors
Bhornobari Tea Garden	Doors
Satali Tea Garden	Doors
Tumsong Tea Garden	Darjeeling

Producers in India's Finest Tea & Largest Tea Producers Areas in India

Gram : "DEVENPORT" Phone : 23-7383 (5 Lines)

"Be Like a Flower"

—*Sree Sree Thakur Satyananda*

M/s. ASH PHARMACY

P.O. DUBRAJPUR, Dist. BIRBHUM

With
Best
Compliments
From

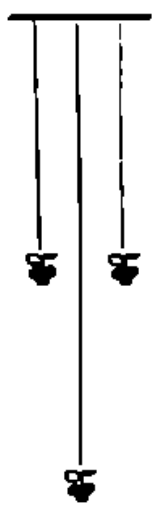

M/s. Crescent Dyes & Chemicals Ltd.

34, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA-700071

With Best
Compliments from

Phone : 23-7686 (3 Lines)

DERBY TEXTILES LIMITED

MARUDHAR INDUSTRIAL AREA BASNI,

2ND PHASE, JODHPUR—342005

Head Office : **16, HARE STREET, CALCUTTA-1**

Manufacturers of Quality Cotton and Synthetic yearns

Great things can be done by great sacrifices only.

—Swami Vivekananda

Gram : SUTTCO

Phone Office : 22-6254 22-6161
23-9033 23-8768
Resi. 44-3599 43-1397

Sudershan Timber Trading Co.

Manufacturers, Merchants & Suppliers

4, FAIRLIE PLACE,
CALCUTTA-1

Timber Depot ITARSI (M.P.)

Factories :
YAMUNANAGAR
PATHANKOT

Branches :
TINSUKIA
SILCHAR

Wherever you go, there's Gillanders.

At home, in Office & in Industry

'Gilarco' Shoe & upholstery tacks
'Kalamazoo' Loose-Leaf business systems
'Gillstat' Computer Stationery
'Waldies' Griffin brand basic chemicals
'Adeguats' Continuous Conveyor belt Weighers Paints & Varnishes Tea.

GILLANDERS ARBUTHNOT & CO. LTD.

Post Box. 174

NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700001

Post Box No. 11091
BOMBAY-400020

Post Box No. 38
NEW DELHI-110001

Post Box No. 261
MADRAS-600001

6-9-171 / C. D. E. & F.
CHAPEL ROAD,
HYDERABAD-500001

9, BHAVANI CHAMBERS
ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380009

WITH BEST Compliments FROM

Jharia-60611
Calcutta—23-4948
Resi : 34-4563
31-1012

KEJRIWAL BROTHERS

1, PRINCEP STREET
CALCUTTA-700 072

Coal Merchant and Colliery Agent

Be it Hard Liquoring C.T. C. Cor
Aromatic and Delectable
Orthodox Tea you Are Looking For
We Have it All.

The Jutlibari Tea Co. Ltd.

Subsidiary of :
GILLANDERS ARBUTHNOT & CO. LTD.
A-1, "GILLANDER HOUSE"
NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700001
Associated with Tea Growing For Over a Century.

With

Compliments

From

EAST INDIA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED

CALCUTTA-700071

"ঠাকুরের কাজ যা করছ উত্তম তপস্যা। ঠাকুরের মনে যদি একবার হয় যে, ছেলেটা আমার জন্য খেটে খেটে গেল তাহলে তোমার চৌদ্দ জনম বৃথা হবে।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

With
Best
Compliments
From :

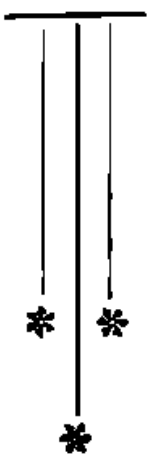

HOOGHLY BINDING WORKS
76/A, Acharya Prafulla Chandra Road
CALCUTTA-700009

With Best Compliments From

M/s. Chhedilal Sreenarayan
&
M/s. Lachhmi Narayan Dal & Flour Mills

Manufacturers Of :
All Kinds of Pulses
P.O. DUBRAJPUR, Dt. BIRBHUM

Gram : Phone : Dubrajpur 2

Ours is to work. The results will take
care of themselves."

—Swami Vivekananda

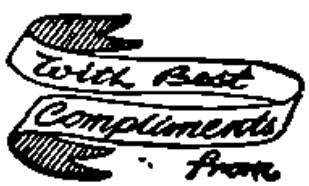

BINAPANI CINEMA
P.O. DUBRAJPUR
Dist. BIRBHUM

With The Best Compliments Of

Gram : "KAMALAPIPE"　　Phone : 35-4434

For OXYGEN LANCING PIPES

Please Contact

Kamala Sheet Metal Industries Private Limited

98 & 99, BELIAGHATA MAIN ROAD,

CALCUTTA-7000 10

(Members To Indian Standard Institution)

"এ যুগের ঠাকুর বড় কৃপাময়　একটু করলেই ঠাকুর কৃপা করবেন।
এ যুগ কৃপার যুগ।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

আপনি কি দাঁতের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন,

নীহারিকা

দাঁতের মাজন ব্যবহার করুন। নীহারিকা মন্ত্রের মত কাজ করে।
সুগন্ধ নিঃশ্বাস ঝক্‌ঝকে দাঁত নীহারিকা-এর গুণে আজ চারিদিকে মাত।

নীহারিকা প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া)

১০/১/১বি, গোপাল বোস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৫-৪৩২১

পরিবার কল্যাণ কর্ম্মসূচীতে সরকারী অনুদান

- যাঁরা ভেসেকটমি করিয়া নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ১৪৫ টাকা। (খাদ্য খরচ বাবদ ১০ টাকা ও যাতায়াত খরচ বাবদ ১৫ টাকা সহ)
- টিউবেকটমির ক্ষেত্রে মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ১০৫ টাকা (বিনা খরচে অপারেশন, পথ্য ও ঔষধাদি সহ)
- লুপ গ্রহণের জন্য মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ১ টাকা। উদ্যোক্তা বা PROMOTER দের জন্য :
  - ক) প্রতি ভেসেকটমি কেসে—নগদ ১০ টাকা।
  - খ) প্রতি টিউবেকটমি কেসে - নগদ ৬ টাকা
  - গ) প্রতি লুপ কেসে—নগদ ২ টাকা।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা :—২৩১/৮৩-৮৪

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের মাস মিডিয়া ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত।

মেসার্স শ্রীমা শপ মিল

রাধাকিশোর দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স

বাঁকুড়া-বর্ধমান রোড,
পোঃ—সোনামুখী, জেলা—বাঁকুড়া

- আমাদের এখানে শিলিগুড়ি সাল, সেগুন, মুরগা, শিশু ও গামার ইত্যাদি যাবতীয় হার্ডউড্ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
- যত্নসহকারে মেশিনে চেরাই করারও ব্যবস্থা আছে
- ক্রেতার সন্তোষ ও পরিতৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

For Two-Year Degree Course

Prof. K. G. Mazumder

- A Text Book of General Physics—
- A Text Book of Heat—
- A Text Book of Optics
- A Text Book of Magnetism and Electrostatics—
- A Text Book of Current Electricity & Modern Physics
- Practical Physics—

উচ্চ-মাধ্যমিক [একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী]

অধ্যাপক কে. জি. মজুমদার

উচ্চ-মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান (১ম, ২য়)

উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান—ঐ

উচ্চ-মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান সহায়িকা—ঐ

Higher Secondary Practical Physics—Prof. K. G. Mazumder

IDEAL PUBLISHERS

14, Ramanath Mazumdar Street
Calcutta-7000009

For Two-Year Degree Course

- Higher Algebra (C.U.)— Basu, Chatterjee
- Higher Algebra (B.U. & N.B.U.) - Do
- A Text Book of Analytic Geometry —M. C. Chaki

Dynamics of a Particle—Prof. S. R. Maiti & Prof. A. Maiti

উচ্চ-মাধ্যমিক [একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী]

- H. S. English Companion - Prof. M. Chakraborty
- উচ্চ মাধ্যমিক প্রবন্ধ বিচিন্তা—অধ্যাপক পি, আচার্য্য
- উচ্চ-মাধ্যমিক গণিত (১ম, ২য়)—অধ্যাপক মাইতি ও ভট্টাচার্য্য
- উচ্চ-মাধ্যমিক ত্রিকোণমিতি সহায়িকা—অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী ও সরকার
- উচ্চ-মাধ্যমিক রসায়ন (১ম, ২য়)—প্রিয়নাথ কুণ্ডু
- উচ্চ-মাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন— ঐ
- উচ্চতর মাধ্যমিক রসায়ন (ঐচ্ছিক) ঐ
- উচ্চ-মাধ্যমিক জীব-বিজ্ঞান—পাদুলী, গুপ্ত ও সাহু
- উচ্চ মাধ্যমিক জীব-বিজ্ঞান সহায়িকা—অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ পাল
- উচ্চ মাধ্যমিক শরীর শিক্ষা—ডাঃ অচিন্ত্য-কুমার মুখোপাধ্যায়

Calcutta Publishers

14, RAMANATH MAZUMDER STREET
CALCUTTA-700009
Phone : 34-8644

With Best Compliments From

Guardian Plasticote Ltd.

12, HO CHI MINH SARANI
CALCUTTA-700071

Phone : { 44-9914
44-7676
44-4795

Telex : 021-7459 GARD IN
Gram : 'EXTRULAM'

The Largest Manufacturers of Waterproof Flexible Laminates for Packing.

Factory at RAMPUR, 24 Parganas, (W.B.)
Phone : 77-1455
and 77-3129

Second Factory at VAPI (Gujarat) For Flexible Laminates and Cast Films.

From :

A WELL WISHER

With Best Compliments From

Avadh Plywood Industries

4, FAIRLIE PLACE
CALCUTTA-700001

"বিশ্বাস কি সোজা কথা, বাবা ? বিশ্বাস শেষের কথা। বিশ্বাস হলেই তো হয়ে গেল।"
শ্রীশ্রীসারদা মা

With Best Compliments Of :

Medical And Surgical Corner
66, R. B. Ghose Road,
Burdwan.
Whole Sale Distributor's of Surgical Goods, Medicine and Cosmetic Goods etc.

'ফুল সুন্দর হও'
শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

With Best Wishes

Dr. A. K. PAL
Shyam View Nursing Home,
Burdwan.

With Best Compliments From

M/s. Damani & Co.

174-B, JAMUNA LAL BAJAJ STREET
CALCUTTA-700007

Brooke Bond
TAJ MAHAL TEA
Blended just the way
you'll love it

TASTE PLUS
STRENGTH

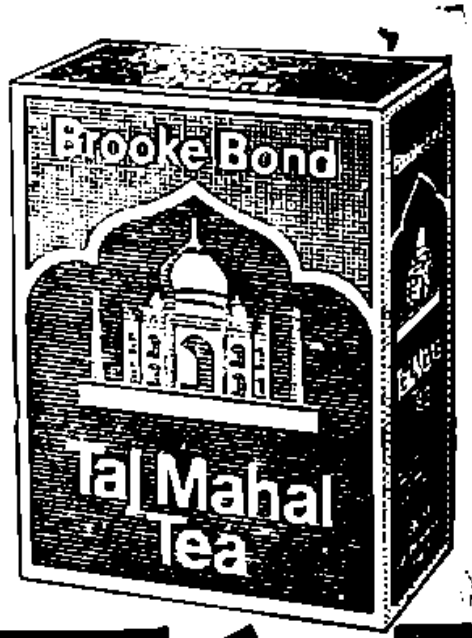

Ah! TAJ

With Best Compliments From

Milton Industrial Corporation

Export-Tea Packers, Tea Blenders Box & Pallet Makers & Tea Garden Supplier

Head office
MILTON HOUSE
BARISHA
CALCUTTA-700008
Phone : 77-5062

Branch
MANGAL PANDE ROAD
KHALPARA
SILIGURI
Phone : 20799

With Best Compliments from :

SINHA & CO.

60, SITARAM GHOSH STREET,
CALCUTTA-700009.

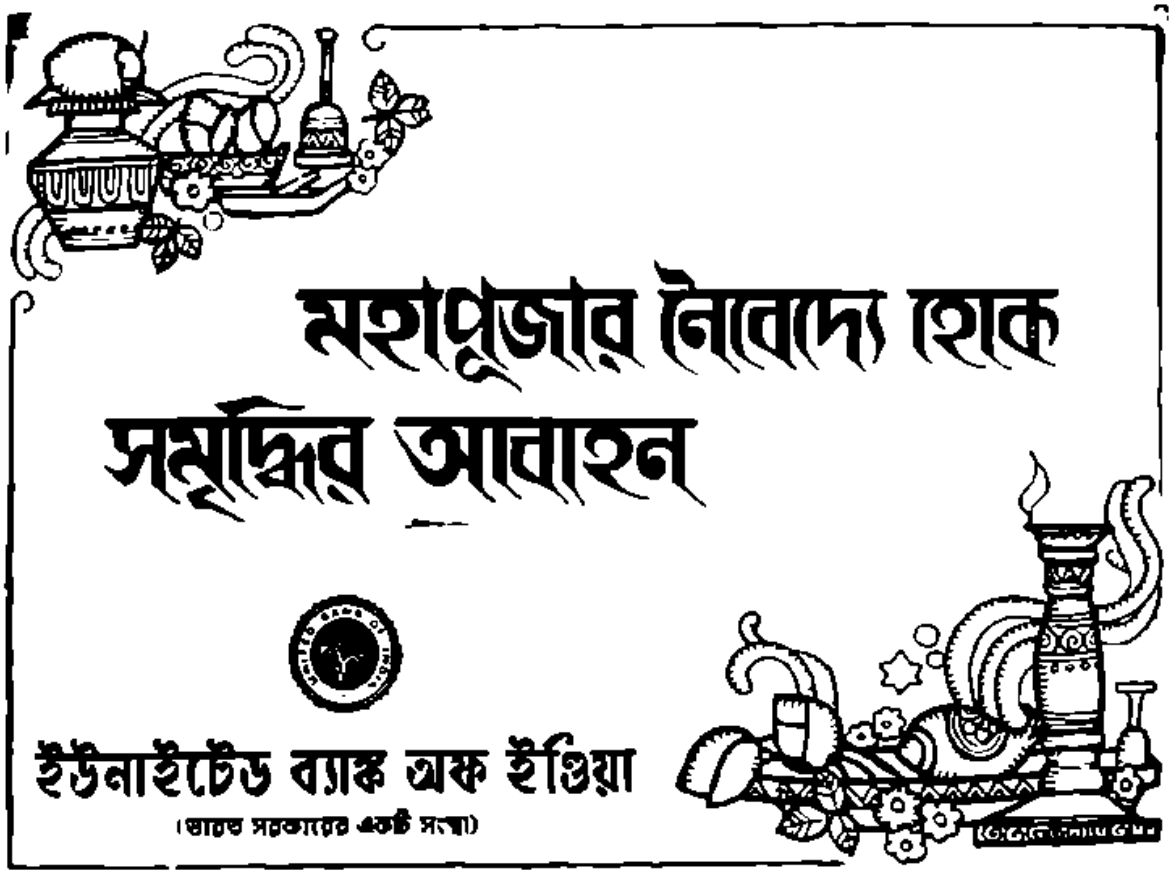

"Truth is one. Know it and realise it."

Swami Abhedananda

WITH BEST
COMPLIMENTS
FROM :

Garbeta Ice & Cold Storage

56, Netaji Subhas Road,
CATCUTTA-1

With Best Compliments From

Kant Laminators Private Limited

Regd. Office : 85/1, UPPER CHITPUR ROAD
CALCUTTA-700006

G.P.O. Box No. 2906 Phone : 55-6319

Factory 2, WATKINS LANE
HOWRAH-711001
Phone : 66-4973

Market Office : 15A, CLIVE ROW
CALCUTTA-700001
Phone : 22-0222
22-0244

Manufacturers of Laminated / Plain Jute bags, Decorative Jute products Jute twine, Jute-School mattings and webbings.

With Best Compliments From

Alliance Jute Mills Co. Limited.

2, India Exchange Place,

CALCUTTA-700001

Mill at :

JAGATDAL, 24 PARGANAS. Phone : 22-8656

Renowned House for Supply of High Quality Raw Jute.

With Best Compliments From

SANTOSH DEB

DURGAPUR

WITH BEST
COMPLIMENTS FROM :

Phone : 236134 Gram : 'SILVATUM'

FLUXUN ENTERPRISE

P. O. ASWININAGAR
Via DESHBANDHUNAGAR
CALCUTTA-700059

Manufacturers of : Soldering & Welding Fluxes, Non-Ferrous Alloys

WITH BEST Compliments FROM

BHUTORIA ENGINEERING WORKS LTD.

No. 8, LINDSAY STREET,
CALCUTTA-700016.

With Best Compliments from

ALLIANCE MILLS (Lessees) PVT. LTD.

18, Netaji Subhas Road,

Calcutta-1.

Phone : 22-3401 (4 Lines)

Quality Manufacturers and Leading Exporters of Hessian Cloth and Bags, Sacking Cloth and Bags and Twine.

Gram : ALJUTLES, CALCUTTA Telex : 021—2273, AMLC IN

Mills : ALLIANCE JUTE MILLS (South)

JAGATDAL, 24 PARGANAS

Phone : BHT 2531, 2532, 2150

Space Donated by

SAREE SANGAM

CHANDANNAGORE,

HOOGHLY.

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা অয়েল মিলের সৌজন্যে

৭৭-সি, রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯ ফোন নং : ৩৫-২৬৭৭

With Compliments From

Phone : Office : 39-2979
Res. : 39-2676

Piyare Lal Hari Singh

Engineers Builders & Govt. Contractors.

SADAR BAZAR

DELHI CANTT.

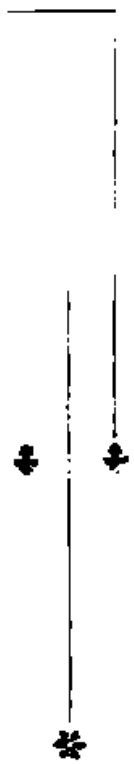

FROM

A Well Wisher

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের নবপ্রকাশিত কয়েকটী পুস্তক

সাধুর চলার পথে—সাধকের জীবনের পথ নির্দেশ—৬·০০

উপনিষদ চয়ন—উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকের অনুপম ব্যাখ্যা—৪·০০

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব সম্পর্কে নবীন দৃষ্টিতে আলোচনা—৩·০০

আশীর্বাণী—স্বামী সত্যানন্দদেবের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আশীর্বচনের সংকলন—৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
১, রামকৃষ্ণ সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩৬, ফোন : ৫১ ৭১৩৩

With Best Compliments from

★

SARAF AGENCIES (Private) LTD.

4, & 4'1, Red Cross Place
Calcutta-700001

With Best Compliments of

★

Please Contact—

HINDUSTAN ELECTRONICS

5/24, BECHULAL ROAD, CALCUTTA-700 014

Phone 43-4983

English Publication of Swami Satyananda Dev.

World Philosophy : in one volume—Rs. 60 -

2) **World Pschology**—Covers all the fields of Psychology the world has ever cultivated Exhaustively informative scientific in attitudr—Rs. 30 -

3) **World Ethics** : The work contains evidences of a very wide reading and mirrors the moral fervour of the author's mind.—Rs. 16 -

4) **Divine Flashes** It contains Practical aspects of religio—nRs. 5 -

5) **Song of the Soul** It is a composition of songs on Sree Sree Thakur, Sree Sree MA, Swami Vivekananda, Swami Abhedananda & misc.—Rs. 5 -

6) **Abhedananda - The Messiah of Vedanta** It is a biography of Swami Abhedananda the Philosopher and Seer.—7 -

7) **The Philosophy of Swami Vivekananda and Swami Abhedananda** It is a concise account of the Philosophy of the great seers.— Rs. 4 -

8) **Divine Rhyme** It is a rare light on spiritual sadhana.— Rs. 2 -

9) **Abhedananda Speaker** : It is the saying of the great Swami (Collection) — Rs.-50

Sree Sree Ramkrishna Ashram

(Publication Department)

2, PRANKRISHNA SAHA LANE, BARANAGAR, CALCUTTA-700036.

Phone : 52-7133

With Best Compliments from

*

TARUN ART PRESS

(S. S. I. Regd.)

Quality Printers & Stationers

City Office

194 OLD CHINA BAZAR STREET

CALCUTTA-700001

With best wishes from

*

CALCARB (INDIA) PRIVATE LTD.

City Office :

77 2 1, LENIN SARANI.

CALCUTTA– 700013

Phone : 24-4463

MANUFACTURERS

CALCIUM CARBONATE BOTH PRECIPITATED & ACVIVATED.

With Best Compliments Of :

রামকৃষ্ণ প্রণাম

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীদের নিকট সেনোলা রেকর্ডে ভক্তিরসাত্মক গান

যা সমস্ত ভক্তের কাছে অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

একটি 45 R.P.M.Standard Play রেকর্ডে প্রকাশিত

Side –1 রেকর্ড নং—AQS 104 (STEREO)

জয় রামকৃষ্ণ পরমহংস কথা : মৃন্ময় চক্রবর্তী, সুর ও শিল্পী : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

Side – 2

তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ কথা : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, সুর ও শিল্পী : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

এছাড়া – 33 1 3 R.P.M. রেকর্ডে গুরুদাস ও মলিনা দেবী অভিনীত বাংলা নাটক

রাণী রাসমণি

সরাসরি যোগাযোগ করুন :—

N. B. SEN & BROTHERS

11, Esplanade East, Calcutta-700069, Ph. : 23-5978,6548

With Best Compliments Of :

Fermentation Industries (Private) Ltd.

KALYANI CHANDMARIR MORE

P.O. GAYESHPUR

Dist. – NADIA.

M/s. KISHORI TEXTILES

(মেসার্স কিশোরী টেকস্‌টাইলস্)

বেডশীট, বেডকভার, প্যাণ্টের কাপড়, জানলার
পরদা, ইত্যাদি প্রস্তুতকারক
এবং
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

Office :
6, Nitya Gopal Chatterjee Lane,
Calcutta - 700002
Phone : 55-7611

Works :
5, Lock Gate Road,
Calcutta - 700002

"জগদ্ধাত্রী, যিনি জগৎকে ধরে আছেন, তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায় "

—শ্রীরামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ ষ্টোর্স

পোঃ দুবরাজপুর, জেলা ঃ বীরভূম

যাবতীয় ষ্টেশনারী দ্রব্য সুলভে পাওয়া যায়

জয় কালী ষ্টোর্স

প্রোঃ শৈলেন্দ্র শুঁই

পোঃ দুবরাজপুর, জেলা ঃ বীরভূম

প্রসিদ্ধ মনিহারী বিক্রেতা

With best compliments of

Shree Carrying Corporation

7, TARACHAND DUTTA STREET,

CALCUTTA - 700073

Phone No. : 34-6214
Resi. : 24-9627

With Best compliments from :

HEMA ENGINEERING WORKS

16/A, HALDER PARA LANE

HOWRAH

Manufacturers of :

WEIGHING SCALES

Phone : Office : 55-8379
Resi. 55-6614

AUTO ELECRIC INDUSTRIES

GOVERNMENT, RAILWAYS & P. W. D. CONTRACTORS
MICA MERCHANTS

The House for Electrical Insulation & Adhesives

CALCUTTA - 700006

Manufacturers of :

Auto-fix Compound, Cable Compound, H.T., L.T. plastic Compound, Ruby Mica all sizes Micanite Sheet, Glass Mica Sheet, Mica Paper Tape, Glass Mica Tape, Mica Folium, Washer & Tube, Bitumen Impregnated H.T. Tape, Oil H.T. Tape, Cotton Tape, P.V.C. Tap, Black Adhesive Tape etc.

With best compliments of :

Fact. : 36-1039
Resi : 35-9435

RADHA BRONZE MFG CONCERN

109/2, Ultadanga Main Road,
Calcutta–700067

Manufacturers of

Non-Ferrous wires, Rods, Strip, Flat, Tin Solder & Non-Ferrous, Spare Parts for Machineries.

S.S.I. Regn No.
21/04/1405E6/PMT/SSI
Dt.—26-4 78

S.I.S.I. Regn No.
E. R./M. E. T./585/75
Dt.– 3-5 75

N.S.I.C. Regn No.
N. S. I. C./Cal/G. P./W.B. (R 216)
Dt.—13-5-75

With best compliments from

"The Complete Garden Shop"

Sutton & Sons (India) Pvt. Ltd.

13-D RUSSELL STREET,

CALCUTTA-700071.

Seeds • Plants • Fertilisers • Pesticides • Garden Tools

• Books • Garden Advisory Service

Phones : 24-0422
24-0525
24-4030

With Best Compliments :

SAMPAT CERAMICS PVT. LTD.

11, POLLOCK STREET,

CALCUTTA.

With
Best
Compliments
From

ESTD. 1919

HUKUMCHAND JUTE MILLS LIMITED

Regd. Office :

15. INDIA EXCHANGE PLACE,

CALCUTTA-700001

Telegram : "HUKUMILLS" Calcutta
Telex : "HUKUM" 021 2771 HCJM IN

Telephone : 22-3411
(6 Lines)

JUTE MILLS DIVISION :

Manufacturers & Exporters of :

QUALITY HESSIAN, SACKING, CARPET BACKING CLOTH, TWINE, COTTON BAGGING, JUTE YARN, JUTE FELT ETC.

Mills At :

NAIHATI, P.O. HAZINAGAR
Dist. 24 PARGANAS
(West Bengal)

CHEMICALS DIVISION :

Manufacturers of :

CAUSTIC SODA LYE (Rayon Grade)
LIQUID CHLORINE,
HYDROCHLORIC ACID &
HYPOCHLORITE

Plant At :

AMLAI P.O. AMLAI PAPER MILLS.
Dist. SHAHDOL
(M. P.)

'শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে শোহন অঞ্জলি।'

★

শারদীয়ার

আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পিয়ারলেসের
মাধ্যমে ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত
ক'রে তুলুন

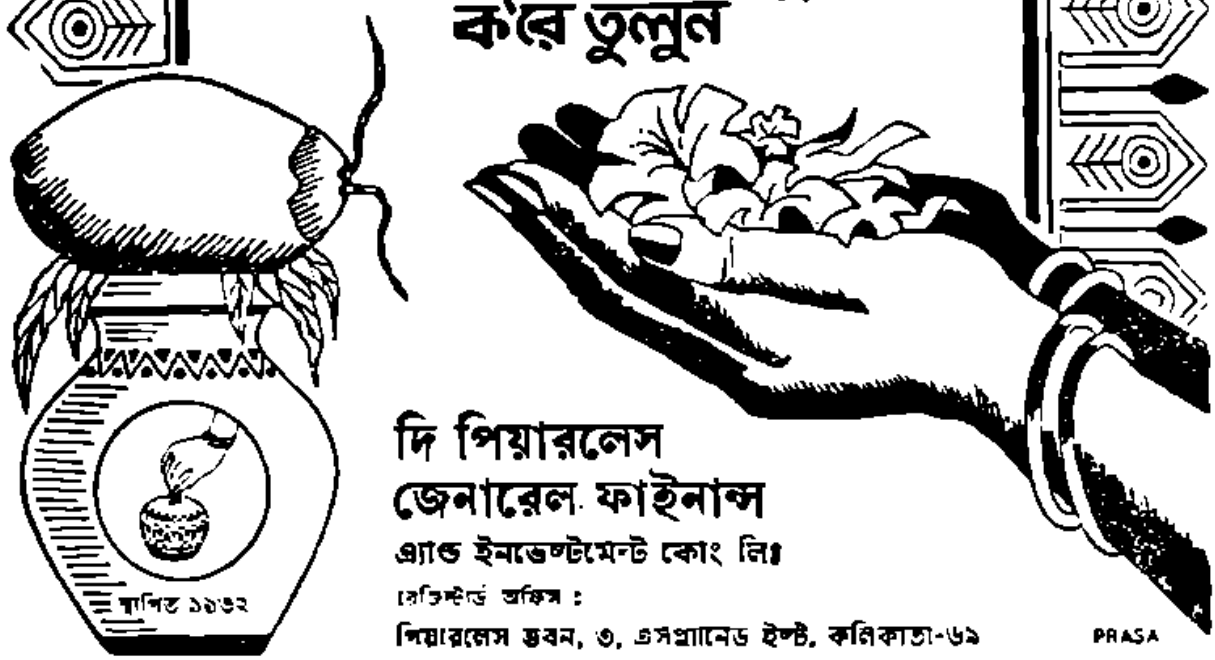

দি পিয়ারলেস
জেনারেল ফাইনান্স
এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস :
পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৬৯

স্থাপিত ১৯৩২

PRASA

With Best Compliments Of

Gram : COKEOVEN, CALCUTTA
Telephone : 24-4492, 24-5980

INDIA POTTERIES LTD.

Manufacturers of :

Electrical Insulators upto 33 kv range as per I. S. Specification

And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial Ceramics Etc. Etc.

Factory :
8, Nilgunj Road, Belgharia,
Calcutta-700056
Phone: 58-1198

Office :
91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের বাণী

★ সর্বদা মনে রাখবে একটী সর্বোত্তম তত্ত্ব
তোমাদিকে লক্ষ্য করছেন, গাইড করছেন—
এইটি মনে রেখে চলবে।

★ এইটি জেনো, একটী ভোগ আর একটীকে
আনে। তাই প্রথম থেকে এই ভোগকে
কৃমি কীটের বস্তু হেয় বস্তু ভেবে যখন
ত্যাগ করে চলবে তখন দেখবে এতে আর
আনন্দ পাবে না। তোমরা দেখ এই মাটির
ঊর্দ্ধে উঠবে তত দেখবে—কত আনন্দ
ঊর্দ্ধলোকের।

★ সব কাজের মাঝে মাঝে, একবার করে জগৎ
থেকে মনকে সুইচ্ অফ্ করে দেবে।
দেখবে মন ঠিক ইষ্টমুখী আছে কি না।

PAPER CRISIS AHEAD
MORE MACHINES MUST MOVE

And we make mechines. Many more such machines must move and move fast to avert an acute scarcity of Paper. Paper is indispensable. Scarcity of this vital material will place the country's economic and intellectual advancement in jeopardy.

Backed by over 30 years' experience, we have developed facilities and expertise to manufacture and install the full range of paper and pulp machinery. Capacity ranging from 2 tonnes to 250 tonnes per day. Our association with almost all the leading paper mills bear eloquent testimony to the superior performance of our pulp and paper mills machines.

PAPER SPELLS PROGRESS—AND THOSE WHO MAKE IT—
RELY ON US

ENGINEERING DIVISION

Eastern Paper Mills Limited

India's Leading Manufacturers of Pulp, Paper and Board Mill Machines

WORKS AND ADMINISTRATION OFFICE

2, DAKSHINDARI ROAD
CALCUTTA-700048

Cable : EASTRNPAPER
Telex 021 2460 EPM IN

Phones { 572736
572737
572439

Space Donated by

Phone 42-6480

Magan Shankar Foundation

10/C, CHARU AVENUE

CALCUTTA-700033

Regd No. WB NC-34

Phone 52-71

Telegram : "KUSUMIKA"

Phone : 23-7586 3 Lines

1 8 NOV 1983

Derby Tea & Industries Limited

16, HARE STREET, CALCUTTA-1

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

Producers and Exporters of Quality Teas

Derby Tea Estate
P. O. & T. O. DERBY
Dist. CACHAR (Assam)
Phone : Silchar-171

NAGRIJULI TEA ESTATE
P.O. NAGRIJULI, T.O. RANGIYA
Dist. KAMRUP (ASSAM)
Phone : Rangiya-82

Tongani Tea Estate
P. O. & T. O. MANGALDAI
Dist. DERRANG (ASSAM)
Phone : Kharupetia-74

LENGRAI TEA ESTATE
P. O. & T. O. CHABUA
Dist. LAKHIMPUR (Assam)
Phone Dikom-40

Derby Dyes & Chemicals
NANDESWARI, BARODA

প্রচ্ছদ পরিচিতি : মার' অবতরণ। পত্রিকা সচিব—স্বামী পরমানন্দ। সম্পাদক—স্বামী অরূপানন্দ ও স্বামী নীলানন্দ
শিল্পী—শ্রী অমর চৈতন্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও
শান্তিভগবান প্রেস মহামিলন মঠ, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৫২-০১৭৯)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী পরমানন্দ
বার্ষিক মূল্য প্রতি সংখ্যা :—পাঁচ টাকা মাত্র। বার্ষিক মূল্য :—ষাট টাকা মাত্র।